শুকতারা

৫৫

ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ•১৪০৯
১০.০০

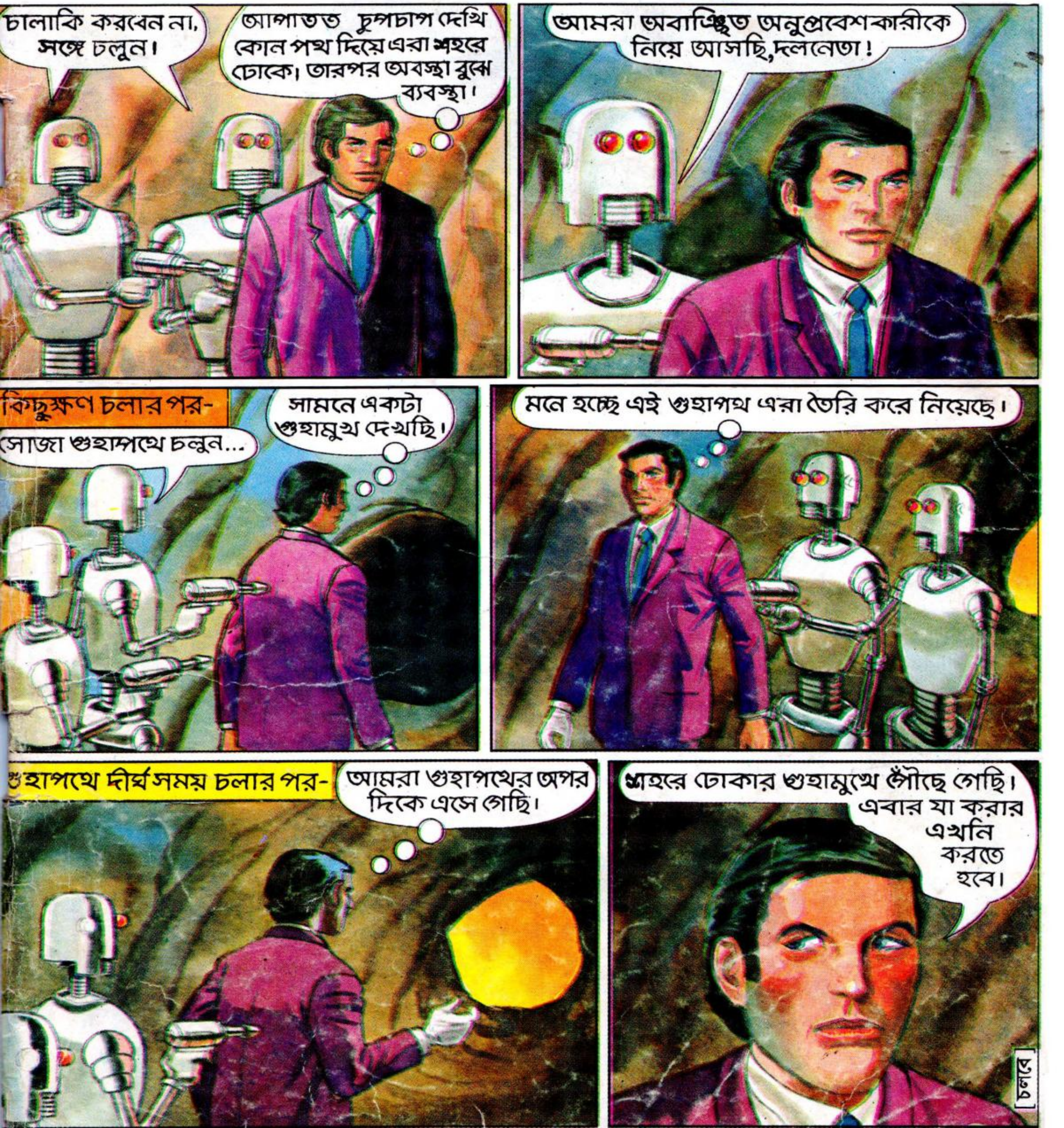
চালাকি করবেন না, সঙ্গে চলুন।
আপাতত চুপচাপ দেখি কোন পথ দিয়ে এরা শহরে ঢোকে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।
আমরা অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারীকে নিয়ে আসছি, দলনেতা!
কিছুক্ষণ চলার পর-
সোজা গুহাপথে চলুন...
সামনে একটা গুহামুখ দেখছি।
মনে হচ্ছে এই গুহাপথ এরা তৈরি করে নিয়েছে।
গুহাপথে দীর্ঘ সময় চলার পর-
আমরা গুহাপথের অপর দিকে এসে গেছি।
শহরে ঢোকার গুহামুখে পৌঁছে গেছি। এবার যা করার এখনি করতে হবে।
চলবে

দেবজ্যোতি
ধুলোখেলা
অতীতের সাগর সেঁচা মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - লাইব্রেরী
স্ক্যান করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম
এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা
স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

চুল কালো করুন নিরাপদে

AYURPRASH
SUPER
Vasmol
33
WITH AYURPRASH
100ml Net
SHAKE WELL BEFORE USE

সুপার ভাসমল ৩৩ কেশ কালা আয়ুরপ্রাশের গুণে সমৃদ্ধ, যা কেবল আপনার চুলকে প্রাকৃতিক উপায়ে কালোই করে না, গোড়া থেকে মজবুতও করে। যেখানে বেশীরভাগ সাধারণ হেয়ার ডাইতে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে এবং তা আপনার চুলের ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং আয়ুরপ্রাশ সমৃদ্ধ সুপার ভাসমল ৩৩ কেশ কালা ব্যবহার করুন এবং চুল পড়ে যাবার ঝুঁকি না নিয়ে আপনার চুলকে কালো করুন।

এখন ন্যাচারল ব্রাউনও পাওয়া যায়।

नया
आयुर्प्राशयुक्त
केश काला
सुंदर काले बालों के लिए
सुरक्षित तरीका
सुपर
वसमोल
33
आयुर्प्राशयुक्त
SUPER
Vasmol
33
WITH AYURPRASH
100ml Net
SHAKE WELL BEFORE USE
SHOWS RESULTS FROM THE FIRST APPLICATION. GREY HAIR TURNS BLACK IN JUST THREE DAYS
Max. Retail Price Rs. 35.00
inclusive of all taxes

সুপার
ভাসমল
৩৩
আয়ুরপ্রাশ যুক্ত

কেশ কালা

আয়ুরপ্রাশের গুণে সমৃদ্ধ

For free literature write to Hygienic Research Institute, P. O. Box No. 12018, Andheri (W), Mumbai - 400 053. E-mail: vasmol@bom3.vsnl.net.in Website: www.hriindia.com

Situations/HRI/16/2002 Ben

বাঁটুল দি গ্রেট

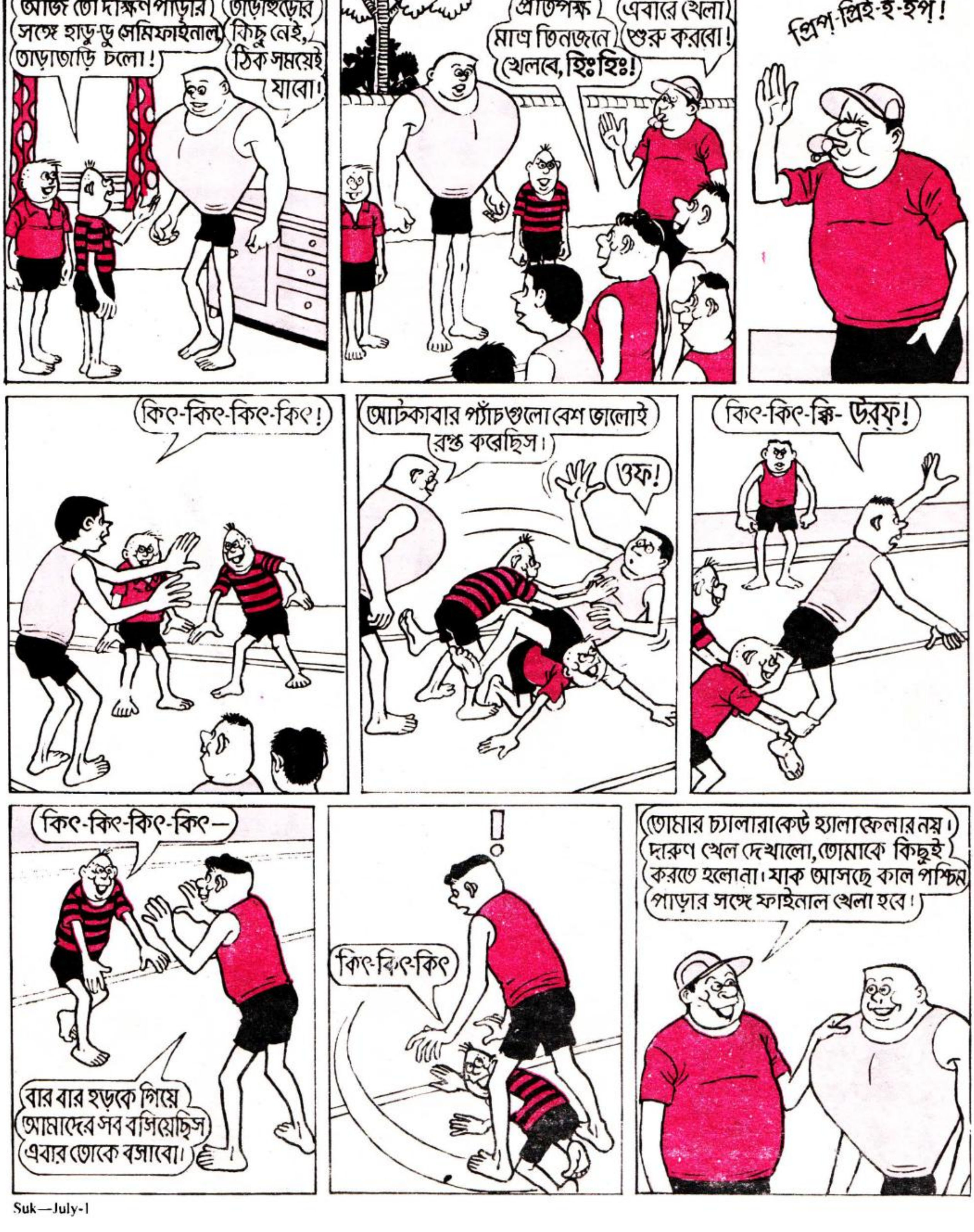
আজ তো দক্ষিণ পাড়ার সঙ্গে হাড়ু-ডু সেমিফাইনাল, তাড়াতাড়ি চলো!
তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ঠিক সময়েই যাবো।
প্রতিপক্ষ মাত্র তিনজনে খেলবে, হিঃ হিঃ!
এবারে খেলা শুরু করবো!
প্রিপ্-প্রিই-ই-ইপ্!
কিৎ-কিৎ-কিৎ-কিৎ!
আটকাবার প্যাঁচগুলো বেশ ভালোই রপ্ত করেছিস।
ওফ!
কিৎ-কিৎ-ক্কি- উর্‌ফ্!
কিৎ-কিৎ-কিৎ-কিৎ—
বার বার হড়কে গিয়ে আমাদের সব বসিয়েছিস, এবার তোকে বসাবো।
!
কিৎ-কিৎ-কিৎ
তোমার চ্যালারা কেউ হ্যালাফেলার নয়। দারুণ খেল দেখালো, তোমাকে কিছুই করতে হলো না। যাক আসছে কাল পশ্চিম পাড়ার সঙ্গে ফাইনাল খেলা হবে।

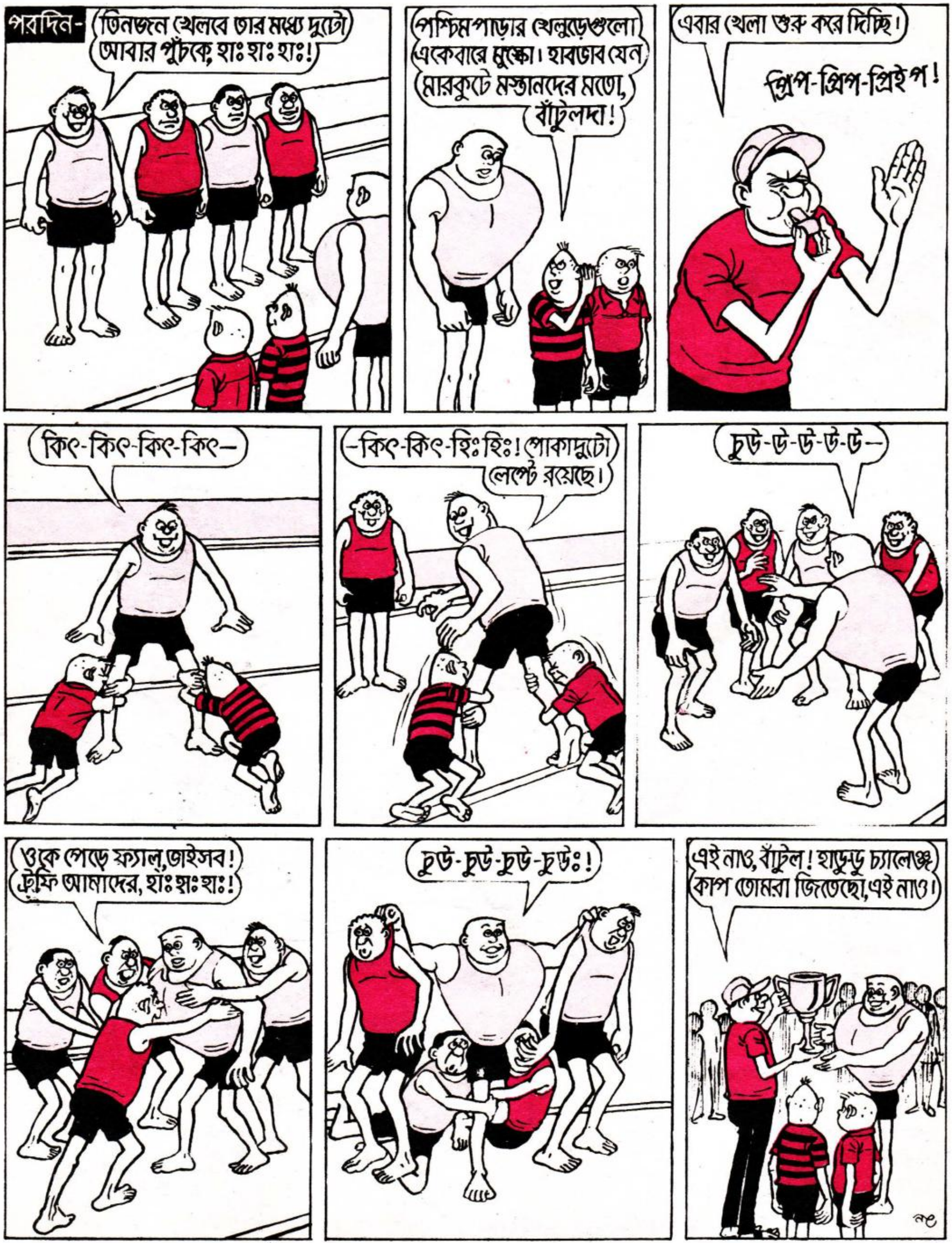
পরদিন-
তিনজনে খেলবে তার মধ্যে দুটো আবার পুঁচকে, হাঃ হাঃ হাঃ!
পশ্চিমপাড়ার খেলুড়েগুলো একেবারে মুস্কো। হাবভাব যেন মারকুটে মস্তানদের মতো, বাঁটুলদা!
এবার খেলা শুরু করে দিচ্ছি।
প্রিপ-প্রিপ-প্রিইপ!
কিৎ-কিৎ-কিৎ-কিৎ—
—কিৎ-কিৎ-হিঃ হিঃ! পোকাদুটো লেপ্টে রয়েছে।
চুউ-উ-উ-উ-উ—
ওকে পেড়ে ফ্যাল, ভাইসব! ট্রফি আমাদের, হাঃ হাঃ হাঃ!
চুউ-চুউ-চুউ-চুউঃ!
এই নাও, বাঁটুল! হাডুডু চ্যালেঞ্জ কাপ তোমরা জিতেছো, এই নাও।

শ্রাবণ ১৪০৯
জুলাই ২০০২

শুকতারা ৫৫

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

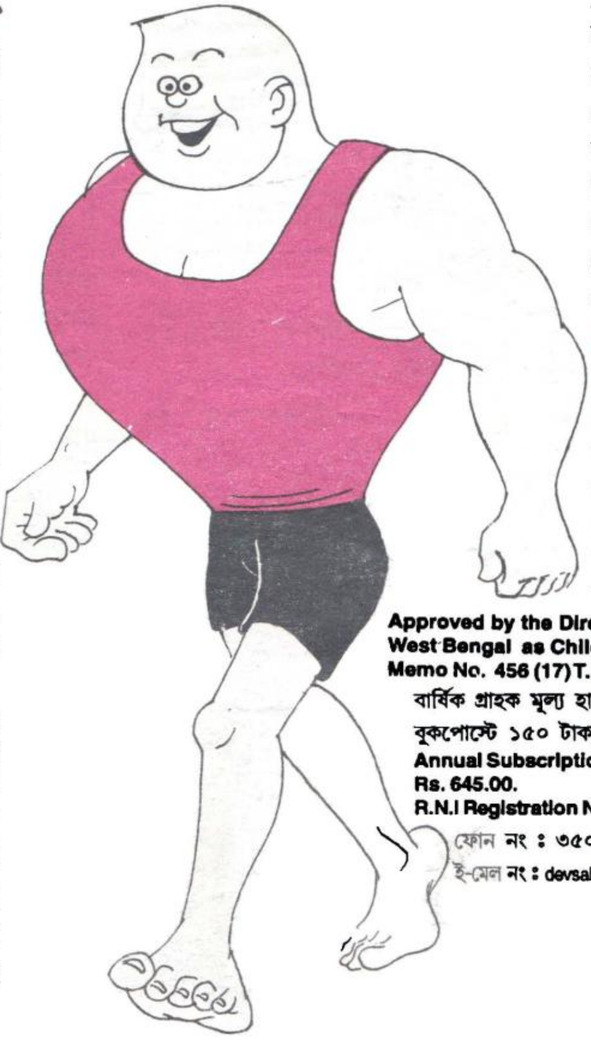

৩৫

হলিউড স্টুডিওতে শূটিং চলছে। অভিনেতা এক গোলগাল লোমওয়ালা বেড়াল। মনিবপুত্র তাকে মেরেছে তাই সে নালিশ জানাচ্ছে মনিবের কাছে। শুধু কি এই নিরীহ বেড়ালটি! হিংস্র পশুও ক্যামেরার সামনে এসে কেমন মানুষের মতো অভিনয় করে। কিন্তু কারা শেখায় তাদের এসব? বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চার রংয়ের ফিচার **বাঘ-সিংহের কোচিং ক্লাসে** আছে সেই সব নির্ভীক মাস্টারমশাইদের কাণ্ডকারখানা, যাঁরা তিলে তিলে গড়ে তোলেন তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের।

৮

অজয়েন্দু মরেনি, সে সুনয়নী দেবীর মেজদা। অথচ দীপনারায়ণ চিনতে চাননি তাকে। এদিকে দেখা যায় ক্যাপ্টেন সিংহর পরিচারিকা সুশীলার যাতায়াত আছে হরিবাবুর বাড়িতে। ক্যাপ্টেনকে যে অনুসরণ করত সে তো এখানেই এসে ঢুকেছিল। **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের** ধারাবাহিক **তিতলিপুরের জঙ্গলে** আরো জটিল করে তুলতে এবার সুশীলা ও হরিবাবু কিডন্যাপ করল ক্যাপ্টেনকে।

৬০

বোশেখ মাসে কনকনে শীত, বাহাত্তর বছরের স্কুল-পালানো বালক, তার আট-নয় বছরের দাদু, এই নিয়েই এবারের ফিরে দেখা-য় **অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের** লেখা **একটা আজগুবী গল্প।**

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456 (17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হাতে নিলে ১১০ টাকা, ডাকে : বুকপোস্টে ১৫০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ৩২৫ টাকা।

Annual Subscription : UK and USA—By Air Mail Rs. 645.00.

R.N.I Registration No. 2621/57

ফোন নং : ৩৫০-৪২৯৪, ৩৫০-৪২৯৫, ৩৫০-৭৮৮৭

ই-মেল নং : devsahitya@caltiger.com

মূল্য : দশ টাকা

বাকি সূচী

৬৬

রাজা অমিত্রসূদন বড় বেদনা অনুভব করলেন। এই মৃত্যু, এই ধ্বংস তাঁকে আকুল করে তুলল। বড় অপরাধী মনে হলো নিজেকে। কী উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। পারলেন কি রাজা অমিত্রসূদন যুদ্ধ বন্ধ করতে? কেন এই যুদ্ধ, কি তার পরিণতি তাই নিয়েই করবী বসাকের রূপকথা—**স্বর্গাদপি**।

১২

ঝড় জলের রাতে জমিদারবাবু মাঠ ভেঙে চলেছেন। সঙ্গের লোকটির হাতে বিরাট দুটো মাছ। আচমকা নাকী সুরে আবদার। কী আবদার, কে করল, কীই বা তার পরিণতি জানতে পড়ো দূর্বা বাগচীর ভৌতিক গল্প **পূর্বধলার আতঙ্ক**।

আরও গল্প

নাকছাবি—শিবানী নন্দী ৬
সংস্কার—সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০
নিমু-চোর—রীতা ভট্টাচার্য ১৮
হাডুডু খেলা—রথীন সরকার ৫২
কাঁসার থালা—অনুপ বড়ুয়া ৫০
মিতে—বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য ৭০

পুরস্কৃত গল্প

গবেষণা (প্রথম) —রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩১
স্মৃতিটুকু থাক (দ্বিতীয়) —সৌভিক সেন ৩৩

ফিচার

গল্প হলেও সত্যি—তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২২
কেরিয়ার গাইড— ডি. এ. চন্দ্রণ ৩০
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ১৭

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১
ফুটবল খেলার ইতিকথা —সন্তোষ কুমার বেরা ৪৫
উঠছে যারা—বীরু বসু ৪৭
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম —তুষার শীল ৪৮

কবিতা ও ছড়া

আকাশ—অপূর্ব দত্ত ৫
গোঁফবাবুর কীর্তি—চিত্ত পাল ৬৫
মন্ত্রী-উজির—তপন কুমার দাস ৬৫

বিভাগীয় লেখা

চিঠিপত্র ৪৯
মনের জানলা—জগদিন্দ্র মণ্ডল ৫৭
আমরা বলছি ২৬
দাদুমণির চিঠি ২৩
তোমাদের পাতা ২৪
মজার পাতা ৬৩

ছবিতে গল্প

বাঁটুল দি গ্রেট —নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা —নারায়ণ দেবনাথ ২৮
বিচ্ছুর যাদুশক্তি—জুরান নাথ ৫৮
কার্টুন ৫১
প্রচ্ছদ ঃ খুনে বিজ্ঞানীর দ্বীপে —নারায়ণ দেবনাথ

ঘোষণা

কল্যাণী মৈত্র স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৩৪
জানো কী! ৩২

৫৫
৫৫ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
শুকতারা
শ্রাবণ ১৪০৯
জুলাই ২০০২

আকাশ

অপূর্ব দত্ত

স্যার বলেছেন—রোজ দু'বেলা
ছাদের ওপর উঠে
ঘণ্টাখানেক আকাশটাকে
দেখবে খুঁটে খুঁটে।

কোন তারাটার কী নাম এবং
কোন গ্রহটা কাছে,
জ্যোতির্বলয় কাকে বলে
সেটাও জানার আছে।

স্যার বলেছেন—আকাশ মানেই
টুকটুকে লাল থালা,
শিরীষ গাছে ঝুলন্ত চাঁদ
সাদা বকের মালা।

ও দিদিভাই, তুমিই বলো—
আকাশ কোথায় থাকে,
সবার আকাশ হারিয়ে গেছে
হাইরাইজের ফাঁকে।

আমি এখন ঘরে বসেই
আকাশকে নিই চিনে,
নীলরঙা এক চৌকো আকাশ
কম্পিউটার স্ক্রিনে।

ছবি: দিলীপ দাস

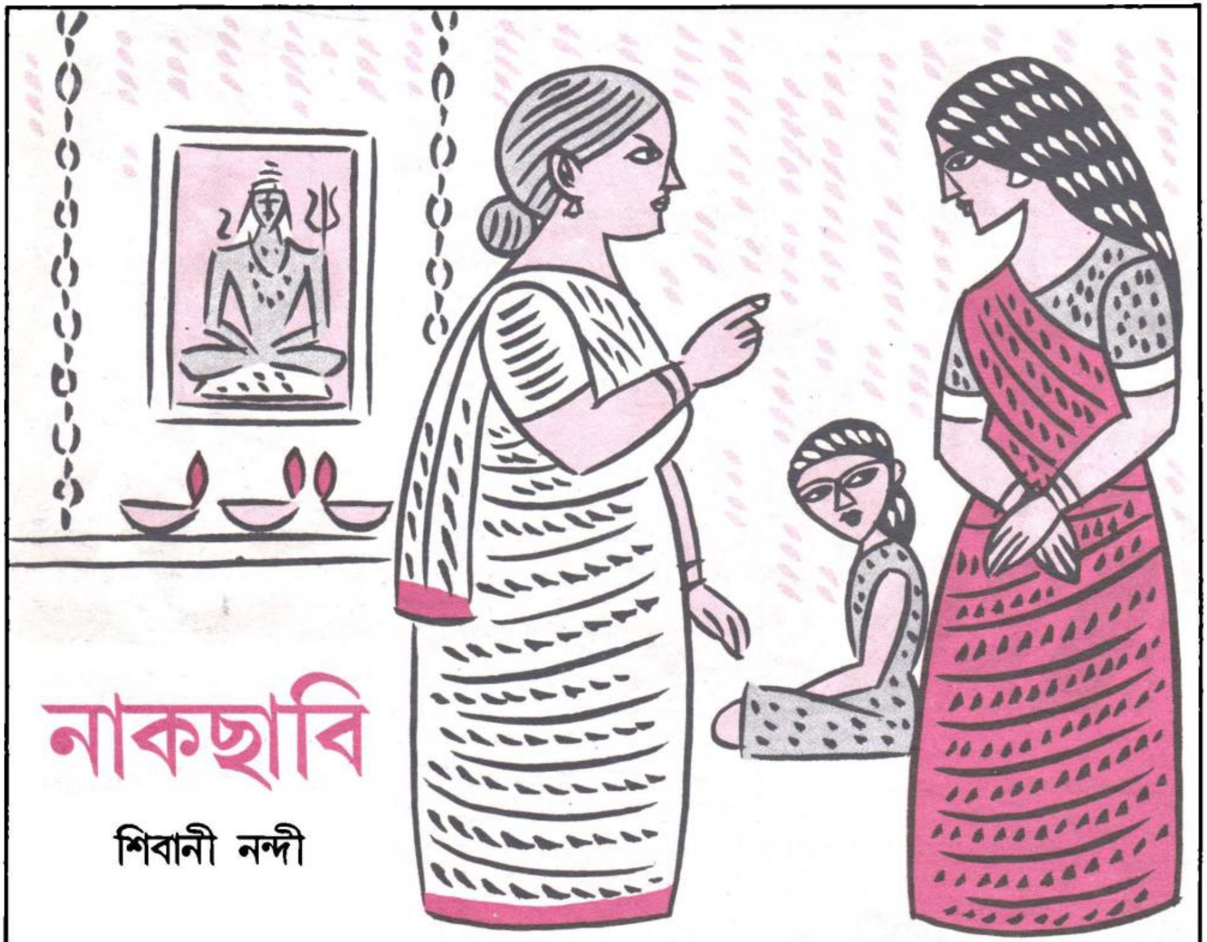

নাকছাবি

শিবানী নন্দী

দক্ষিণ ভারতের এক সম্পন্ন পরিবার। পরিবারে চারটি মাত্র প্রাণী—কর্তা রাজন, গিন্নী লীলাবতী আর তাঁদের ছেলে-বৌ সুন্দর ও আনন্দী। আর আছে কাজের মেয়ে সুখি। জমির ফসল ও বাগানের ফলমূল বিক্রি করে তাঁদের ভালই রোজগার হয়। তার উপর কয়েক পুরুষের বাসনের ব্যবসায় তো মা লক্ষ্মীর কৃপা বাঁধা। সবাই বলে, আনন্দী আসার পর থেকেই এঁদের অবস্থার এমন বাড়-বাড়ন্ত।

কথাটা সত্যি বলে মনে মনে মানলেও লীলাবতী কিন্তু আনন্দীকে খুবই শাসনে রাখেন। সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাসিমুখে সকলের সেবা করে, ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখে, পুজো-পাঠ, রান্না-বান্না সবই করে, তবুও লীলাবতী তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেন।

একদিন বিকালে আনন্দী প্রদীপ জ্বালানোর জন্য সলতে তৈরি করছিল। সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুরঘরের ছাদ থেকে ঝুলানো শিকলে আঁটা প্রদীপের সারি জ্বালানো হয়। সুখি তাকে এই কাজে সাহায্য করছিল। অদূরে বসে লীলাবতী ঠাকুরের সান্ধ্যভোগের জন্য নৈবেদ্য সাজাচ্ছিলেন। এমন সময় দুই-তিনজন প্রতিবেশী মহিলা সেখানে এলেন।

লীলাবতী তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। নানারকম কথা হতে হতে একজন মহিলা বললেন, ভাই লীলা, তোমার কাছে এসেছি একটা সুখবর নিয়ে। লীলাবতী সাগ্রহে বলেন, কি খবর ভাই? বল, বল। প্রতিবেশিনী বললেন, শোন, আমাদের গ্রামের মোড়ল-গিন্নী, ঐ যে পম্পাবাঈ গো, সামনের মাসে গ্রহণ উপলক্ষে কাশীধামের গঙ্গায় স্নান করতে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন। তাই আমরাও কয়েকজন মিলে তাঁর সঙ্গে এই সুযোগে গঙ্গাস্নানের পুণ্যটুকু করে আসব ভেবেছি। তা তুমি যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?

কথাগুলি শুনে লীলাবতী যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছেন এমনভাবে বলে ওঠেন, ওমা! একথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি? নিশ্চয় যাব। সেই সঙ্গে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে জীবনটাকে ধন্য করব। তা কবে রওনা হব আমরা?

লীলাবতী আর তাঁর প্রতিবেশিনীরা তাঁদের কাশীযাত্রা নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

আনন্দী এতক্ষণ ধৈর্য ধরে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, একটি কথাও বলেনি। কিন্তু প্রতিবেশিনীরা বিদায় হতেই সে শাশুড়ির কাছে গিয়ে বলল, মা, আমাকেও আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন না। কোনোদিন তো বাইরে যাওয়ার সুযোগ হয়নি আমার। তাই....

আনন্দীর কথা শেষ হবার আগেই কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন লীলাবতী। বললেন, না বৌমা, তা সম্ভব নয়। তুমি গেলে বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা কে করবে? তাছাড়া অনেক পুণ্যি করলে তবে এমন সৌভাগ্য হয়। অত পুণ্যি তো আর বাছা তুমি করনি। যাও যাও, নিজের কাজ করগে, যত্ত সব ছেলেমানুষি। এই বলে লীলাবতী সেখানে থেকে চলে গেলেন।

আনন্দীর চোখে জল এসে গেল, কিন্তু উপায়-ই বা কী? মনের দুঃখ মনেই চেপে

রেখে সে কাজে মন দিল। তারপর গ্রহণের কিছুদিন আগে লীলাবতী সঙ্গিনীদের সঙ্গে কাশীর উদ্দেশে রওনা হলেন।

এদিকে আনন্দী যথানিয়মে সংসারের কাজ করতে লাগল। সে প্রতিদিন কুয়ো থেকে জল তুলে এনে স্নানঘরে বড় গামলায় ভরে রাখত, পরে সেই জলে স্নান সারত। গ্রহণের দিনেও সেইভাবে স্নান করার সময় হঠাৎ তার শাশুড়ির কথা স্মরণে এল। আহা! সে-ও যদি তাঁর সঙ্গে যেত, তবে এতক্ষণ কত আনন্দ করে গঙ্গাস্নান করতে পারত। কিন্তু তা আর হলো না। মনের দুঃখে সে জোড়হাতে মা গঙ্গার উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা জানাল, মাগো, তুমি আমার এই স্নানের জলে আবির্ভূতা হও, এই জলে স্নান করেই আমি যেন গঙ্গাস্নানের সাধ মেটাতে পারি।

স্নানের পর হঠাৎ তার চোখে পড়ে গামলার তলায় কি একটা চকচক করছে। তুলে নিয়ে দেখে একটা সোনার বড় নাকছাবি। ভীষণ অবাক হয় আনন্দী। ভাবে, এটা তো তার নয়, এটা এইখানে এল কিভাবে? তবে কি কুয়ো থেকেই....না, তাহলে তো আগেই চোখে পড়ত! তবে....সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আনন্দী গয়নাটি সিন্দুকে তুলে রাখল, কাউকে কিছু বলল না।

কিছুদিন পর লীলাবতী কাশী থেকে ফিরে এলেন। সকলের সঙ্গে বসে কাশী বেড়ানোর গল্প করতে করতে হঠাৎ তিনি বললেন, সব কিছুই তো ভালয় ভালয় মিটল, তবে একটা ঘটনায় আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে আছে। ওখানে একটা নতুন নাকছাবি কিনে পরেছিলাম। গ্রহণের দিন স্নানের সময় জলের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেল!

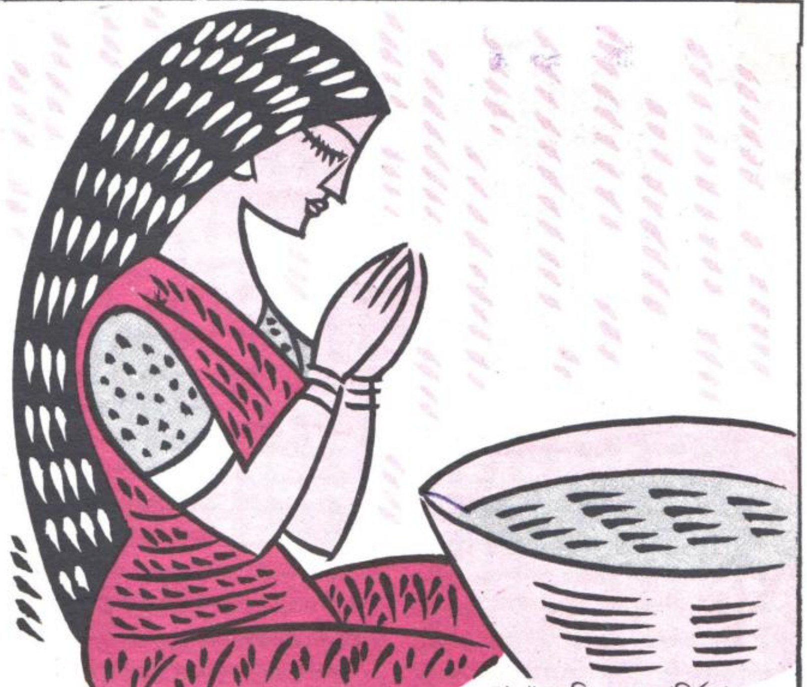

মাগো, তুমি জলে আবির্ভূতা হও

শাশুড়ির কথা শুনে তুলে রাখা নাকছাবিটির কথা মনে পড়ে গেল আনন্দীর। সে সিন্দুক খুলে সেটি এনে শাশুড়িকে দেখিয়ে বলে, দেখুন তো মা, এটা কার? নাকছাবিটি দেখে লীলাবতী সবিস্ময়ে বলেন, আরে! এই তো আমার সেই হারানো গয়না! এটা তুমি কোথায় পেলে বৌমা? আনন্দী চমকে ওঠে। নাকছাবিটি কি করে সে পায় তা খুলে বলল সবাইকে। আনন্দীর শ্বশুর রাজন তখন লীলাবতীকে বলেন, দেখ দেখ, বৌমা আমাদের কত পুণ্যবতী। তুমি তো ওকে কাশীর গঙ্গায় স্নান করতে নিয়ে গেলে না। তাই ওর প্রার্থনায় মা গঙ্গা স্নানের জলে আবির্ভূতা হয়ে ওকে পুণ্যস্নানের সৌভাগ্য দিয়ে গেছেন। আর প্রমাণস্বরূপ, কাশীর গঙ্গার জলে হারানো নাকছাবি, দক্ষিণ দেশের ঘরে স্নানের জলে রেখে গেছেন।

লীলাবতীর দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। তিনি আনন্দীকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও বৌমা। অহঙ্কারে আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম। আজ বুঝেছি, মনে যদি ভক্তি থাকে, তবে ঈশ্বর দর্শন আর পুণ্যলাভ ঘরে বসেই সম্ভব হয়।

লীলাবতীর কথায় সকলের মুখেই হাসি ফুটে ওঠে আর ছোট সুখি হাততালি দিয়ে নাচতে থাকে।

মা, এটা কার?

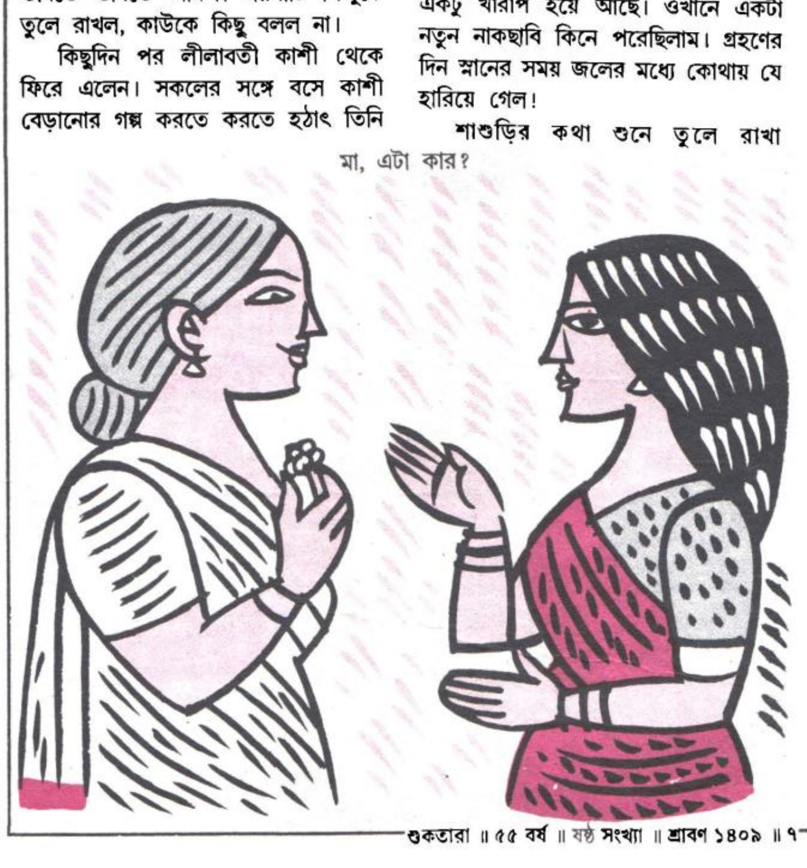

(দক্ষিণ ভারতের জনশ্রুতি অবলম্বনে)

ছবি : বিজন কর্মকার

রহস্য আরো জমে উঠছে। কর্নেলকে ফলো করে একটা লাল মারুতি। ওদিকে হালদারমশাই আবিষ্কার করেন জনৈক হরিবাবুকে। তার বাড়ির সামনেই আক্রান্ত হন তিনি। কাজিসায়েব ওরফে জাহাজিবাবু সম্বন্ধে অনেক খবর পান কর্নেল লালবাজার থেকে। একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপরই সুনয়নী দেবীর কাছ থেকে কর্নেল জানতে পারেন অজয়েন্দু তাঁর মেজদা।

তিতলিপুরের জঙ্গলে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

৮

কর্নেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। আন্দাজে ঢিল উনি ছোঁড়েন না। আমার অজ্ঞাতসারে নিশ্চয় ওঁর হাতে কোনও সূত্র এসে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তাহলে দেখছি রহস্যটা জমজমাট হয়ে উঠল।

কথাটা বলে সুনয়নী দেবীও অবাক হয়েছেন লক্ষ্য করলাম। তিনি মৃদুস্বরে বললেন—মেজদাকে আমি ছোটবেলায় দেখেছিলাম, সে-কথা তো আপনাকে বলেছি। বড়দার কাছে অবশ্য তার অনেক কথা শুনেছি। মেজদার কথা আপনি জানতে চাইছেন। মেজদা কি—

কর্নেল ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—জাহাজে চাকরির কথা ছাড়া আর কী কথা শুনেছেন, আগে বলুন। তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।

সুনয়নী দেবী মুখ নামিয়ে আস্তে বললেন—বড়দা বলতেন, মেজদা অ্যামেরিকা থেকে এক মেমসায়েবকে বিয়ে করে এনেছিল। মেমবউয়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি। সে মেজদাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

—আর কিছু?

—আর একটা কথা শুনেছিলাম। সাংঘাতিক কথা। কথাটা বলা উচিত হবে কিনা জানি না।

সুনয়নী দেবী একটু কুণ্ঠার সঙ্গে কথাটা বললেন। তাই কর্নেল বললেন—আপনি আপনার বড়দার খুনীকে শাস্তি দিতে চান না?

—হ্যাঁ। নিশ্চয় চাই। তবে...

—তাহলে সব কথা খুলে বলুন। আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি আপনার পাশে আছি।

একটু চুপ করে থাকার পর সুনয়নী বললেন—জাহাজ ডুবে মেজদা মারা গেছে বলে বড়দার কাছে খবর এসেছিল। বড়দা তখন কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এক রাত্রে মেজদা গোপনে বড়দার কাছে এসেছিল। তার কিছু জিনিসপত্তর রেখে গিয়েছিল। বড়দা পরে আমাকে বলেছিলেন, পুলিশ তাকে খুঁজছে। বড়দা রাগী লোক ছিলেন। বলেছিলেন, অজু আমাদের রায়বংশের কলঙ্ক। আর—

—হ্যাঁ। বলুন। আপনার ভয়ের কারণ নেই।

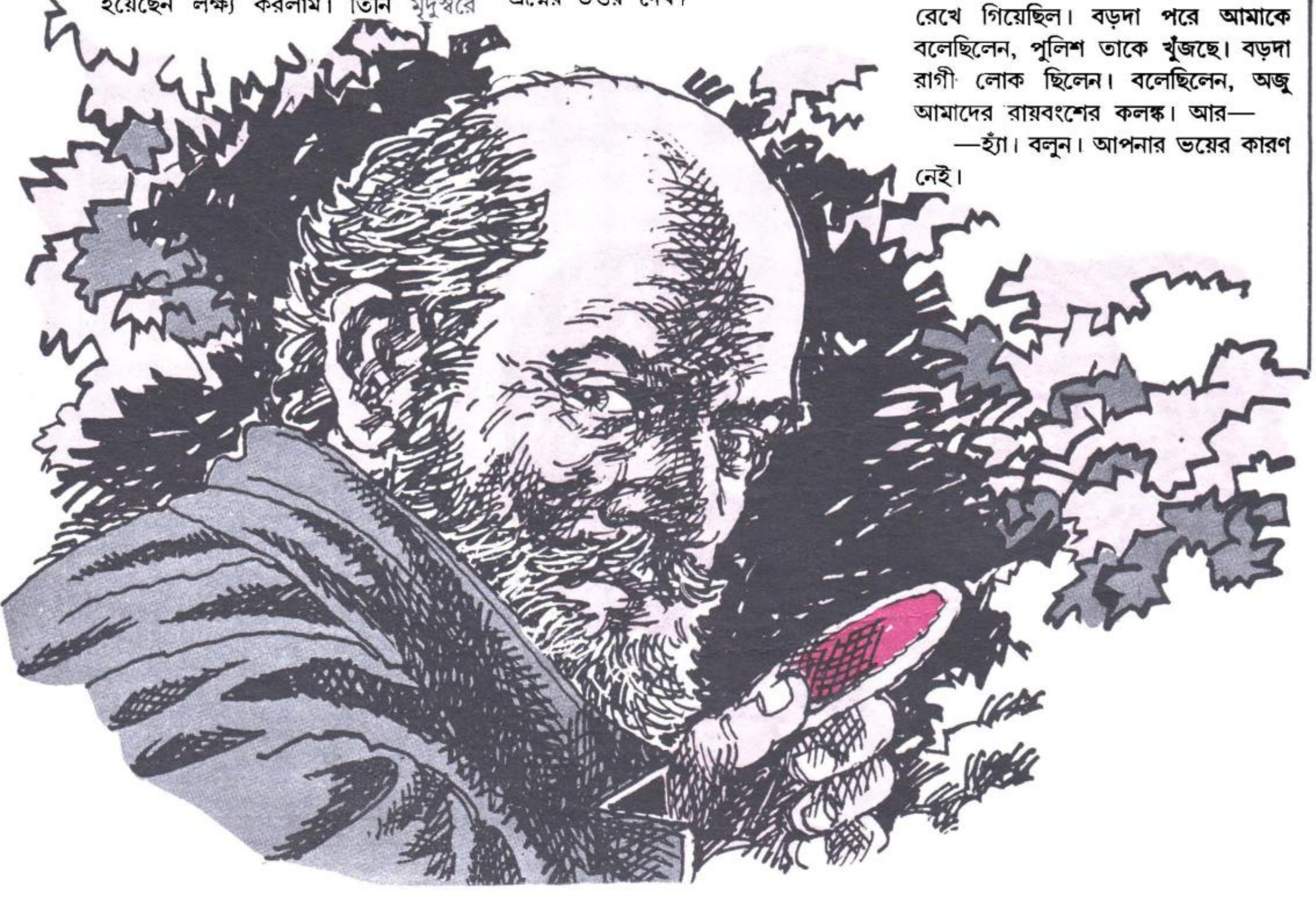

—আর জাহাজিবাবু, মানে চন্দ্রপুরের শম্ভু চৌধুরি যখনই গ্রামে আসত; তখনই বড়দার সঙ্গে প্রায়ই আড্ডা দিত। গতবছর এমনই শীতের এক রাত্রে বড়দার সঙ্গে জাহাজিবাবু চুপিচুপি মেজদা সম্পর্কে কী সব কথা বলছিল। আমি স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারিনি।

—আপনি আপনার বড়দার কাছে এ বিষয়ে কিছু জানতে চাননি?

—চেয়েছিলাম। কিন্তু বড়দা রেগে গিয়েছিলেন। আমাকে নাক গলাতে নিষেধ করেছিলেন।

—সেই কথাবার্তার মধ্যে এমন কি কিছু আপনি শুনেছিলেন, যা আপনার মনে পড়ে?

সুনয়নী দেবী আবার মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকলেন। একটু পরে বললেন—জাহাজিবাবু বড়দাকে বলছিল, অজুর লুকিয়ে রাখা জিনিসটা বড়দা যেন তাকে দেয়। তার বদলে জাহাজিবাবু বড়দাকে টাকা দেবে।

—হুঁ। আর কিছু?

সুনয়নী মাথা নাড়লেন।—আর তেমন কিছু মনে পড়ছে না। ওই যে বললাম, বড়দা খুব রাগী মানুষ ছিলেন। কিছু জানতে চাইলে খাপ্পা হয়ে বেরিয়ে যেতেন।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন—এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। আপনি দীপনারায়ণবাবুর লেখা যে পোস্টকার্ডটা আমাকে দেখিয়েছেন, ওতে আপনার মেজদা সম্পর্কে একটা লাইন আছে। 'অজু তোমার কাছে যেতে পারে। তাকে পাত্তা দেবে না।' এই 'অজু' কে, সেই নিয়ে ধাঁধায় পড়েছিলাম। আপনার কথা শুনে ধাঁধার জট খুলে গেল। আপনাকে ধন্যবাদ। এবার চলি।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। সুনয়নী চাপা স্বরে বললেন—মেজদাকে কেন পুলিশ খুঁজছে, দয়া করে আমাকে বলে যান কর্নেল সায়েব!

উঠোনে হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল বললেন—ঠিক সময়ে সব জানতে পারবেন। আর একটা কথা, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আমি চন্দ্রপুর থানায় বলে দেব। সাদা পোশাকে অন্তত দু'জন পুলিশ আপনার বাড়িতে আপনাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হিসেবে থাকবে।

—কেন একথা বলছেন?

—জাহাজিবাবু আর তার লোকেরা আপনার বড়দার ঘরে হামলা করতে পারে। কিন্তু না—আপনি একটুও ভয় পাবেন না।

এবার সুনয়নী শক্ত মুখে বললেন—কর্নেল সায়েব! আমি জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছি। অনেক ঝড়ঝাপটা সামলেছি। এখন আমি মরিয়া। তা ছাড়া তিতলিপুরের রায়বংশের রক্ত আমার শরীরে আছে। রায়বাঘিনী কথাটা জানেন তো?

কর্নেল হাসলেন।—জানি। তবু আপনি সাবধানে থাকবেন।...

কলকাতা ফেরার পথে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তাহলে একটা পুরনো পোস্টকার্ড থেকে আপনি অজয়েন্দুবাবুর সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন?

কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে বললেন—হুঁ।

—কর্নেল?

—বলো!

—সেই লাল মারুতিটা আমাদের ফলো করে আসেনি কিন্তু। এলে টের পেতাম।

কর্নেল আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বললেন—এসেছিল। কিন্তু খুব দূর থেকে ফলো করেছিল। এই বাইনোকুলারে যা দেখা যায়, তোমার চর্মচক্ষুতে তা দেখা যায় না।

—সর্বনাশ! এখনও কি গাড়িটা আমাদের ফলো করে আসছে?

—না। মন্দিরের কাছে হাইওয়েতে তোমার গাড়ি বাঁক নেওয়ার সময় গাড়িটা উল্টোদিকে উধাও হয়ে গেছে। সম্ভবত চন্দ্রপুরে জাহাজিবাবুর কাছে গেছে।

—গাড়িটা তাহলে চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবুর?

—এ বিষয়ে আমি এখনও সিওর নই, জয়ন্ত।

—তাহলে যে বলছেন চন্দ্রপুরে জাহাজিবাবুর কাছে গেছে?

—আমি 'সম্ভবত' বলেছি। সিওর নই।...

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে পৌনে একটা বেজে গিয়েছিল। ষষ্ঠীচরণ মুচকি হেসে বলেছিল—একটু আগে টিকটিকিবাবু ফোন করেছিলেন। আবার ফোন করবেন বাবামশাইকে।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বলেছিলেন—আমাদের খিদে পেয়েছে।

—সব রেডি বাবামশাই!

কর্নেল শীতকালে সপ্তাহে মাত্র একদিন স্নান করেন। আজ তাঁর স্নানের দিন নয়। আমি গরমজলে স্নান করে শরীরটা ঝরঝরে তাজা করে নিলাম। দেড়টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি ডিভানে চিত হয়ে ভাতঘুমের জন্য প্রস্তুত হলাম। কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন।

কিন্তু টেলিফোনের বিরক্তিকর শব্দে আমার ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল।

কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন—বলুন হালদারমশাই!....কিন্তু আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?....বাড়ি থেকে—তার মানে.....আশ্চর্য! বলেন কী! সুশীলা....হ্যাঁ আপনার অনুমান তাহলে সত্যি। তারপর?.....হুঁ....হুঁ....হুঁ....ঠিক আছে। আপনি আপনার ক্লায়েন্ট ক্যাপ্টেন সিংহকে এখনই কথাটা জানাবেন না।....হ্যাঁ। আপনি এখনই আমার কাছে চলে আসুন।....আহা! চর্মচক্ষে দিনের বেলায় হরির দর্শন পেয়েছেন। আপনি ভাগ্যবান।....রাখছি। চলে আসুন।

কর্নেল রিসিভার রেখে আমার দিকে ঘুরলেন। বললাম—আমার ভাতঘুম আজ আর বরাতে নেই। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর সাংঘাতিক কিছু খবর আপনাকে জানিয়ে দিলেন মনে হচ্ছে। ঘুমের জন্য তাই আমার দুঃখু নেই। কিন্তু 'সুশীলা'-র ব্যাপারটা কী? ক্যাপ্টেন সিংহের পরিচারিকা—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ঘুম না আসে, চোখ বুজে ভেড়ার পালের ভেড়াগুলো গুনতে থাকো। আমি ততক্ষণ চুরুটের সুখ উপভোগ করি। নো মোর টক।...

কতক্ষণ পরে ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী!

তারপর সবেগে গোয়েন্দাপ্রবর কে কে হালদার ঘরে ঢুকলেন। দেখলাম, তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি। পরনে প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটার। ছদ্মবেশ ছেড়ে স্নান করেছেন, তা-ও বোঝা যাচ্ছিল। সোফায় বসে আগে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন—কর্নেলস্যার কইছিলেন হরির দর্শন পাইছি। হঃ! তা পাইছি।

কর্নেল বললেন—এবং ক্যাপ্টেন সিংহের কাজের মেয়ে সুশীলারও?

—হঃ। ঠিক কইছেন!

—কার দর্শন কোথায় পেলেন?

—ফোনে কওন যায় না। এখন কইয়া ফেলি। আমি পাগলা সাজছিলাম। সেই

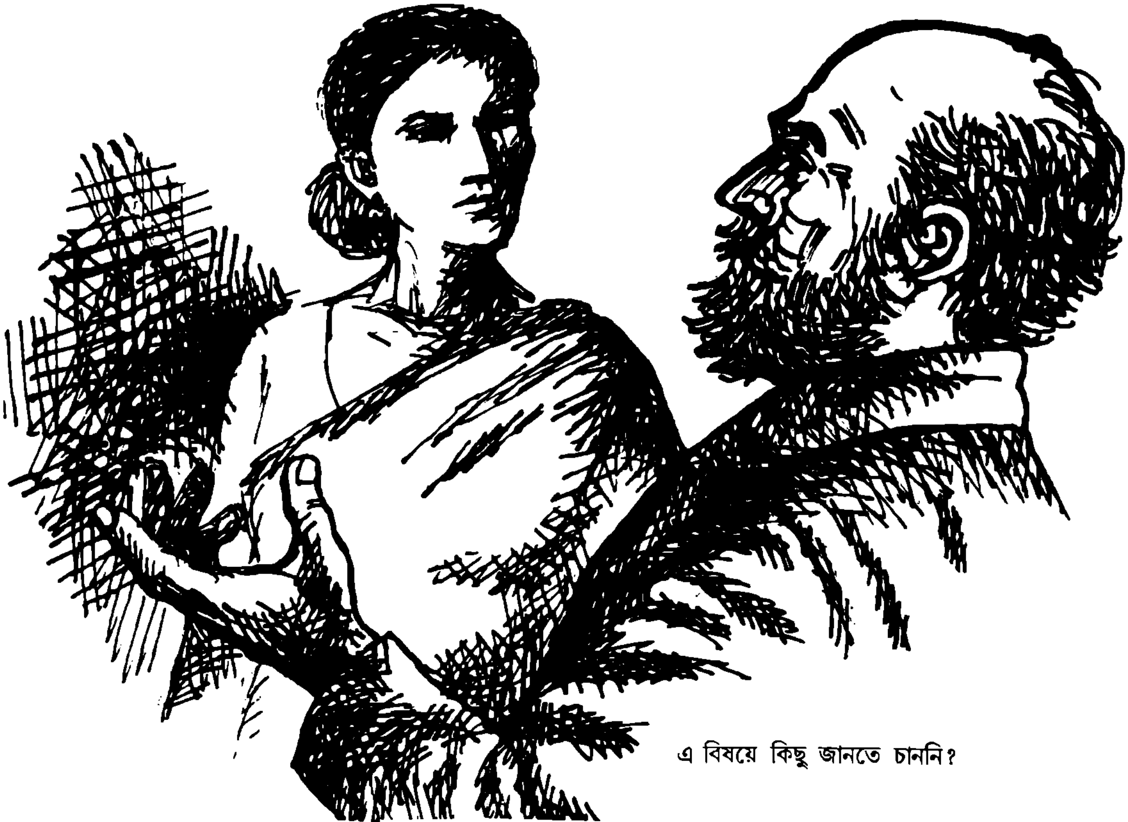

এ বিষয়ে কিছু জানতে চাননি?

গলির অন্যদিকে বটতলায় একখান মন্দির আছে। সেইখানে বইয়া ছিলাম। হঠাৎ দেখি, সুশীলা আইয়া হরিবাবুর বাড়িতে ঢুকল। তারপর সেই লোকটা—যে ক্যাপ্টেন সিংহরে ফলো করে, সে বারাইল। কিছুক্ষণ পরে সে একখান ট্যাক্সি আনল। এইবার বাড়ি থেইক্যা যিনি বারাইলেন, তিনিই যে হরিবাবু তা বুঝলাম। ক্যান কী, গলিতে এক ভদ্রলোকে তারে নমস্কার কইরা কইল—এই যে হরিবাবু! কেমন আছেন? হরিবাবু ট্যাক্সিতে চাপল। তার লগে সুশীলাও চাপল। ট্যাক্সিখান যাওয়ার পর সেই ভদ্রলোক হরিবাবুর লোকেরে জিগাইলেন, তোমার বাবু বাড়ি বেচবেন শুনলাম? লোকটা কী একটা কইল, বুঝলাম না। সে বাড়ি ঢুকল। আমিও উঠলাম। ট্যাক্সির নাম্বার দেখছিলাম। পরে নোটবইয়ে টুকছি। কে কইল দেখি নাই—‘পাগলা লেখাপড়া জানে!’ আর একজন হাসতাছিল ‘সেয়ানা পাগল!’ এইসব শুইন্যা আমি কাট করলাম।

কর্নেল গম্ভীর মুখে শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন—হরিবাবুর চেহারা কেমন?

—দেইখ্যা বুড়া মনে হইব। কিন্তু বুড়া না। তাগড়া শরীর। মাথায় সাদা চুল। গোঁফ আছে। গোঁফ কাঁচাপাকা। পরনে ধুতি, সার্জের খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি। কাঁধে শাল ছিল। হাতে ছড়ি ছিল। আর একখান ব্রিফকেস।

আমি বলে উঠলাম—তাহলে এই হরিবাবু কখনই চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবু নয়।

হালদারমশাই আমার দিকে ঘুরে কী বলতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল চোখ কটমটিয়ে আমাকে বললেন—উঠে পড়ো জয়ন্ত! শুয়ে কথা বলে রোগীরা। উঠে বসো।

তারপর তিনি হালদারমশাইকে বললেন—আপনি কি সুশীলার বাড়ির ঠিকানা জানেন?

হালদারমশাই সোয়েটারের গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করলেন। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—ক্যাপ্টেন সিংহর লগে ঠিকানা লইছিলাম। উনি সুশীলারে বিশ্বাস করেন। কইছিলেন, মাইয়াটারে ওনার দেশের বাড়ি থেইক্যা আনছিলেন।

—ক্যাপ্টেন সিংহের তাহলে গ্রামে বাড়ি ছিল?

—হঃ।

—আপনি এ কথাটা আমাকে তো বলেননি!

গোয়েন্দাপ্রবর অবাক হয়ে বললেন—আপনি জিগান নাই। জিগাইলে কইতাম।

—ক্যাপ্টেন সিংহের দেশের বাড়ি কোথায়, তা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—না। আপনি যখন কইতাছেন, তখন এবার জিগাইমু।

—দেরি করা ঠিক হবে না হালদারমশাই। আপনি বরং এখান থেকে ফোনে ক্যাপ্টেন্ন সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওঁর ফোনে আড়ি পেতেছে কেউ, সে-কথা উনি আপনাকে জানিয়েছেন। তাই না?

—হঃ।

—তাহলে ফোনে ওঁকে শুধু বলুন, আপনি ওঁর সঙ্গে জরুরি কাজে দেখা করতে যাচ্ছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর তখনই রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। তারপর বললেন—রিং হইতাছে। কেউ ধরতাছে না ক্যান? আমি যাইয়া দেখি বরং। মিসটিরিয়াস ব্যাপার। বলে উনি যথারীতি সবেগে বেরিয়ে

যাওয়ার পর কর্নেল জাপানি ওয়ালক্লককে সময় দেখে নিলেন। তারপর বললেন—শিপ কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ অসীম সোম এখনও সম্ভবত অজয়েন্দু রায়ের ব্যাপারে কোনও রেকর্ড খুঁজে পাননি। অথচ খুব শিগগির আমার ওটা দরকার।

বললাম—সুনয়নী দেবী বলছিলেন, ওঁর মেজদা পুলিশের ভয়ে গাঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এদিকে ক্যাপ্টেন সিংহ বলেছেন, জাহাজডুবির আগে উনি একটা গোপন জিনিস তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন সিংহ রিটায়ার করার পর সেই গোপন জিনিসটা নাকি বিছানার তলায় রেখেছিলেন। তা ছাড়া সেই জিনিসটা যে কী, তা কি ক্যাপ্টেন সিংহের জানবার কৌতূহল হয়নি? জয়ন্ত! ক্যাপ্টেন সিংহের কথাটা বড্ড গোলমেলে।

একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম—কর্নেল! জিনিসটা জাহাজিবাবু চুরি করেছিলেন—এটা আপনারই সিদ্ধান্ত। তাহলে জিনিসটা একটা নলে রাখা পার্চমেন্ট! আপনি সেটা তিতলিপুরের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছেন।

কর্নেল হাসলেন।—চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি। কিন্তু ক্যাপ্টেন সিংহ যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হালদারমশাইকে জানাননি, এটাই আশ্চর্য!

—আমার মতে, যে-ভাবে হোক, ক্যাপ্টেন সিংহের সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত।

—দেখা যাক।

বলে কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। আমার ভাতঘুম কেটে গেছে। আমি উঠে গিয়ে সোফায় বসলাম। শীতের দিনের আলো কমে এসেছে। একটু পরে ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে গেল। কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর কফিতে চুমুক দিলেন। মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। তাই আমিও গম্ভীর হয়ে কফি খেতে থাকলাম।

কফিপানের পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম, সেই বিকট গাম্ভীর্যটা আর নেই। মুখে একটু হাসি ফুটেছে। বললেন—ডার্লিং! ভাতঘুম নষ্ট করেছি এবং একটু বকে দিয়েছি বলে এই বৃদ্ধের প্রতি তোমার ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক।

হেসে ফেললাম।—মোটেও না। আপনি তুম্বো মুখ করে থাকলে অস্বস্তি হয়।

—আমি ক্যাপ্টেন সিংহের পরিচারিকা সুশীলার ব্যাপারটা ভাবছিলাম। মেয়েটি জাহাজিবাবু শম্ভু চৌধুরির চর বলে হালদারমশাইয়ের অনুমান। অনুমানটা সম্ভবত ঠিকই। কিন্তু সেই মেয়ে আজ হরিবাবুর বাড়ি এসে ট্যাক্সি চেপে হরিবাবুর সঙ্গে কোথাও বেরিয়েছে। তাহলে হরিবাবুর সঙ্গে জাহাজিবাবুর সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তাই না?

—অঙ্ক কষলে তা-ই দাঁড়াচ্ছে বটে! কিন্তু কে এই হরিবাবু?

—সঠিক প্রশ্ন।

—তার মানে, আমরা তিতলিপুরের জঙ্গলে পথ হারিয়ে হন্যে হচ্ছি!

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসিটি হাসলেন। তারপর বললেন—ঠিক বলেছ। তিতলিপুরের জঙ্গলে দুর্লভ প্রজাতির নীল সারসের চেয়ে আরও দুর্লভ কিছু আছে।

অবাক হয়ে বললাম—তার মানে?

এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন।—বলছি! বলুন নরেশবাবু!....ধন্যবাদ! চন্দ্রপুরের ওসি মিঃ রাজেন্দ্র হাটি বুদ্ধিমান!....হ্যাঁ। দীপনারায়ণবাবুর ঘরে নিশ্চয় কিছু সূত্র পাওয়া যেতেই পারে।....ঠিক আছে। রাখছি।

কর্নেল রিসিভার রেখে আবার আমার দিকে সহাস্যে তাকালেন। বললাম—সুনয়নীদেবীর বাড়িতে সাদা পুলিশের গার্ড রাখবার কথা বলেছিলেন। সেই ব্যাপারটা কি?

—ঠিক ধরেছ।

—কিন্তু কখন লালবাজারের ডিটেকটিভ সাব-ইন্সপেক্টার নরেশবাবুকে ফোন করেছিলেন?

—তুমি যখন বাথরুমে স্নান করছিলে!

—একটু আগে আপনি বললেন, তিতলিপুরের জঙ্গলে নাকি আরও দুর্লভ কিছু আছে। ব্যাপারটা কী?

কর্নেলের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে আবার বাধা পড়ল। ডোরবেল বাজল এবং কর্নেল হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী!

তারপর প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার আবার সবেগে প্রবেশ করে সোফায় সশব্দে বসলেন। বললেন—হেভি মিস্ট্রি কর্নেলস্যার।

কর্নেল বললেন—বলুন হালদারমশাই!

এবার হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে যা বললেন, তার সারমর্ম এই ঃ

গোয়েন্দাপ্রবর ক্যাপ্টেন সিংহের বাড়ি গিয়ে দেখেন, তাঁর দোতলার ঘরের দরজা এবং কোলাপসিব্‌ল্ গেটে তালা আঁটা। একতলার মুদির দোকানের মালিক মিছরিলালকে তিনি ক্যাপ্টেন সিংহের কথা জিজ্ঞেস করেন। মিছরিলাল তাঁকে বলেছে, ক্যাপ্টেন সায়েবের হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছিল। সুশীলা ট্যাক্সিতে একজন ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিল। সেই ট্যাক্সিতে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যাপ্টেন সায়েবকে কোনো নার্সিং হোম কিংবা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। মিছরিলালকে সুশীলা ডেকেছিল। মিছরিলাল একা একশো। সে ক্যাপ্টেন সায়েবকে সিঁড়ি দিয়ে বয়ে এনে ট্যাক্সিতে ঢুকিয়েছিল। সুশীলা পিছনের সিটে ক্যাপ্টেন সায়েবকে ধরে বসে ছিল। সামনের সিটে বসেছিলেন ডাক্তারবাবু।

সবটা শোনার পর আমি বললাম—কিন্তু হেভি মিস্ট্রি বলছেন কেন হালদারমশাই?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন—বুঝলেন না? হরিবাবু তো ডাক্তার না। তারে ডাকতে অত দূর থেইক্যা সুশীলা আইবে ক্যান? ক্যাপ্টেন সিংহরে কিডন্যাপ করছে হরিবাবু।

দেখলাম, কর্নেল রিসিভার তুলে ডায়াল করে কাকে চাপাস্বরে কিছু বলছেন। হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন—ট্যাক্সির নম্বর লইছি। পুলিশেরে কর্নেলস্যার নম্বরটা জানাবেন। তারে ধরলে মিস্ট্রি সল্‌ভ্ হওনের কথা।...

[চলবে]

ছবি ঃ বিজন কর্মকার

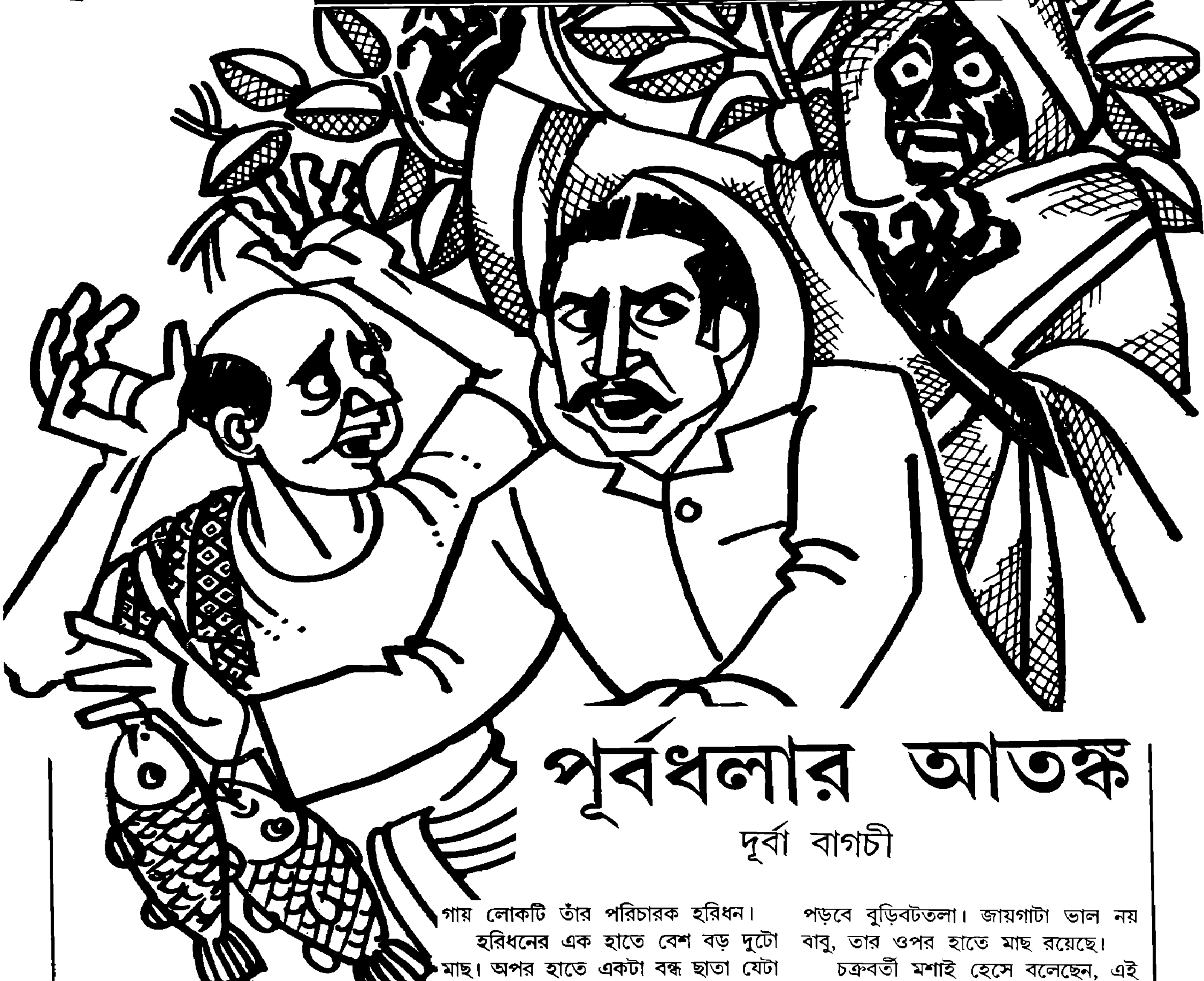

পূর্বধলার আতঙ্ক

দূর্বা বাগচী

সারাটা দিন অসহ্য গুমোটের পর বিকেল থেকে শুরু হয়েছে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ঝড়। ঝড়ের আঘাতে মড়মড় করে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে। সোঁ-সোঁ শব্দে হাওয়া বইছে। কাঁচা বাড়ির খড়ের চাল উড়ে গেছে বেশ কয়েকটা। এমন দুর্যোগের রাতে যখন কেউ বাইরে বের হবার কথা কল্পনাও করতে পারছে না সেই সময় দেখা গেল দুজন লোক মাঠের উঁচু আলপথ ধরে হেঁটে আসছে। দুজনের মধ্যে লম্বা রেনকোট পরা লোকটি পূর্বধলা গ্রামের জমিদার অশোক চক্রবর্তী আর তাঁর পেছনে মোটাসোটা টাকমাথা খাটো ধুতি ও ফতুয়া গায় লোকটি তাঁর পরিচারক হরিধন।

হরিধনের এক হাতে বেশ বড় দুটো মাছ। অপর হাতে একটা বন্ধ ছাতা যেটা সে ঝড়ের দাপটে সামলাতে না পেরে বন্ধ করে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে চলেছে। চেনা পথ তবুও খুব সাবধানে তাদের পা ফেলতে হচ্ছে। চক্রবর্তী মশাইয়ের হাতে টর্চ থাকলেও তাতে জল ঢুকে যাওয়ায় সেটাও আর এখন জ্বলছে না। অন্য সময় চক্রবর্তী মশাই গ্রামের বড় রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন কিন্তু সেই রাস্তাটা অনেকটা ঘুরে জমিদার বাড়িতে গেছে। সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটলে বাড়ি পৌঁছাতে অনেক দেরি হবে তাই তাড়াতাড়ি যাবার জন্য আলপথ ধরে চলেছেন জমিদার অশোক চক্রবর্তী। মাছ দুটো নিয়ে এত রাতে দুর্যোগের মধ্যে আলপথ দিয়ে কিছুতেই আসতে চাইছিল না হরিধন। বার বার বলেছে, বাবু, এটা ভাল হচ্ছে না, এই পথ দিয়ে গেলেই পড়বে বুড়িবটতলা। জায়গাটা ভাল নয় বাবু, তার ওপর হাতে মাছ রয়েছে।

চক্রবর্তী মশাই হেসে বলেছেন, এই দুর্যোগের রাতে মাছ নেবার জন্য কোনো চোর-ডাকাত বের হবে না। আর যদি কেউ বেরিয়েও থাকে তাকে ডেকে নেব আমার বাড়িতে। দুটো মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যাবে।

কথাটা শুনেই শিউরে উঠেছিল হরিধন, রাম রাম বাবু, এসব কথা আর বলবেন না। তেনারা শুনতে পারলে আর উপায় নেই, ঠিক পিছু ধরবে।

চক্রবর্তী মশাই বিরক্ত হলেন, তোর খালি ভূতের ভয়। কত দিন না বলেছি ভূত বলে কিছু নেই। সব মনের ভুল। নে নে জোরে পা চালা।

চক্রবর্তী মশাই কয়েকদিন আগে খাজনা আদায় করতে মহালে গিয়েছিলেন। আজ

সকালে তাঁর বাড়ি ফেরার কথা, কিন্তু সকাল বেলায় কয়েকটা জরুরি কাজে আটকে পড়ায় নৌকো ছাড়তে দেরি হয়েছে। তার ওপর সকাল থেকেই হাওয়া নেই, চারপাশ কেমন থমথম করছিল। নৌকোর পাল তোলা যায়নি। পূর্বধলা ঘাটে নৌকো পৌঁছবার আগেই ঝড় উঠেছিল। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ঘাটে আসতে অনেক রাত হয়ে গেছে। নৌকোর সবাই চক্রবর্তী মশাইকে নিষেধ করেছিল এত রাতে বাড়ি যেতে। এমনকি নৌকো থেকে নামার মুহূর্তে নায়েব মশাই বলেছিলেন, অন্ধকার পথ তার ওপর এই দুর্যোগ, অন্য কিছু না হোক সাপখোপের ভয় আছে। তাছাড়া অন্ধকারে পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। রাতে বাড়ি নাই বা গেলেন। রাত্রিটা নৌকোতে কাটিয়ে কাল ভোরে যাবেন।

অশোক চক্রবর্তী কারো কথা কানে তুললেন না। মহালে থাকতেই খবর পেয়েছেন কলকাতা থেকে তাঁর একমাত্র মেয়ে আর জামাই এসেছে। কালকেই জামাই বিশেষ দরকারে ঢাকা চলে যাবে, সেখান থেকে সোজা কলকাতা। কতদিন পরে মেয়ে-জামাই এসেছে অথচ তিনি বাড়িতে নেই, তাই আজকের রাতটা মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থেকে তাদের আদর-যত্ন করতে না পারলে তিনি শান্তি পাবেন না। কপালগুণে আজই আবার কেজি তিনেকের একটা রুই ও বেশ বড় একটা কালবোস মাছ পেয়েছেন। নৌকোয় ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে সুভাষ মণ্ডল মাছ দুটো হুজুরকে ভেট দিয়ে গেছে। এই মাছ আর কিছুক্ষণ থাকলেই পচে যাবে তাই শত বাধা উপেক্ষা করে তিনি বাড়ি চলেছেন। যেভাবেই হোক জামাইকে মাছ খাওয়াতে হবে। কালবোস খেতে জামাই খুব ভালবাসে। কলকাতায় কালবোস মাছ প্রায় পাওয়াই যায় না। চক্রবর্তী মশাইয়ের নৌকোতে মহাল থেকে আদায় করা ধান, পাট, টাকা-পয়সা রয়েছে তাই নায়েব মশাই ও অন্য লোকজনদের নৌকোতেই রাখতে হয়েছে।

এই আলপথটা অন্যান্য আলপথের থেকে সামান্য চওড়া। তার ওপর ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেই আলোতেই পথ চলেছেন দুজন। চলতে চলতে একসময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন চক্রবর্তী মশাই। জোরে জোরে শব্দ করে নাক টেনে বললেন, এত সুন্দর রান্নার গন্ধ আসছে কোথা থেকে?

চক্রবর্তী মশাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই হরিধন বলে ওঠে, চলুন বাবু, এখানে আর দাঁড়াবেন না। তেনাদের জায়গায় এসে গেছি।

হরিধনের কথায় কান না দিয়ে চক্রবর্তী মশাই আপন মনে বলতে থাকেন, এই মাঠের মধ্যে দুর্যোগে এত সুন্দর রান্নার গন্ধ আসছে, ভাবা যায় না।

হরিধন তাড়া লাগায়, এখন কোনো কথা বলবেন না বাবু, বাড়ি গিয়ে আপনাকে সব কথা বলব। এখানে দাঁড়ালে সর্বনাশ হবে।

কিন্তু...

কোনো কিন্তু নয় বাবু, চলুন।

চক্রবর্তী মশাইরা কয়েক পা এগুতেই হঠাৎ পাশ থেকে একটা নারীকণ্ঠ শোনা যায়, মাঁছ নিঁয়ে কোঁথায় যাঁচ্ছিস, আঁমায় মাঁছ দিঁয়ে যাঁ।

নাকি কণ্ঠস্বর কানে যেতেই হরিধন জোরে জোরে রাম নাম জপতে থাকে।

চক্রবর্তী মশাই কিছু না ভেবে নিজের মনে হাঁটতে থাকেন। আবার সেই নাকি নারীকণ্ঠ শোনা যায়, ভাঁল চাঁস তোঁ মাঁছ দিঁয়ে দেঁ, নাঁ হঁলে ঘাঁড় মঁটকে দেঁব।

দেব সাহিত্য কুটীরের নতুন বই

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের
বইব্যবসা ও পাঁচ পুরুষের বাঙালি পরিবার
(কোনও গল্প নেই, নিখুঁত তথ্যসমৃদ্ধ রচনা) ৫০.০০

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
আমাকে চেনো ২০০.০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শঙ্করকন্যার কাছে ৪২.০০

ছোটদের জন্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুপ্তধন রহস্য ২৫.০০
(রহস্য সিরিজের নবম বই)

সুভাষ ধরের
লস্করহাটের দুই শয়তান ৩০.০০
(সত্য ঘটনা অবলম্বনে পুলিশি কাহিনী)

গৌরী দের
রাত তখন বারোটা ৩০.০০
(শিহরন জাগানো ভৌতিক কাহিনী)

নব কলেবরে

(হেমেন্দ্র কুমার রায়ের ১২টি বই ৩ খণ্ডে)

কিং কঙ ৫০.০০
(কিং কঙ, অমানুষিক মানুষ, ভগবানের চাবুক, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট)

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন ৫০.০০
(গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন, বাঘরাজের অভিযান, চতুর্ভুজের স্বাক্ষর, নিশাচরী বিভীষিকা)

দেড়'শ খোকার কাণ্ড ৫০.০০
(দেড়'শ খোকার কাণ্ড, সুন্দরবনের মানুষ বাঘ, আধুনিক রবিনহুড ও নেপোলিয়ান)

(টার্জান সিরিজের ১৩টি বই ৪ খণ্ডে)

টার্জান দি এপ্‌ম্যান ৫০.০০
(টার্জান দি এপ্‌ম্যান, অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব্ টার্জান, টার্জান এন্ড হিজ মেট্)

টারজান দি ফিয়ারলেস ৫০.০০
(টারজান দি ফিয়ারলেস, টারজান এন্ড হিজ সন, টারজান দি মাইটি)

টার্জান এ্যান্ড দি ট্রেইটর ৫০.০০
(টার্জান এ্যান্ড দি ট্রেইটর, টার্জান ইন দি জাঙ্গল, টার্জান দি গ্রেট্)

টার্জান এ্যাণ্ড হিজ ফ্রেণ্ড ৫০.০০
(টার্জান এ্যাণ্ড হিজ ফ্রেণ্ড, টার্জান ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড, টার্জান ফাইটস ফর্ লাইফ্, টারজান দি হিরো)

শিবরাম চক্রবর্তীর—হিপ হিপ হুররে ৫০.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ■ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

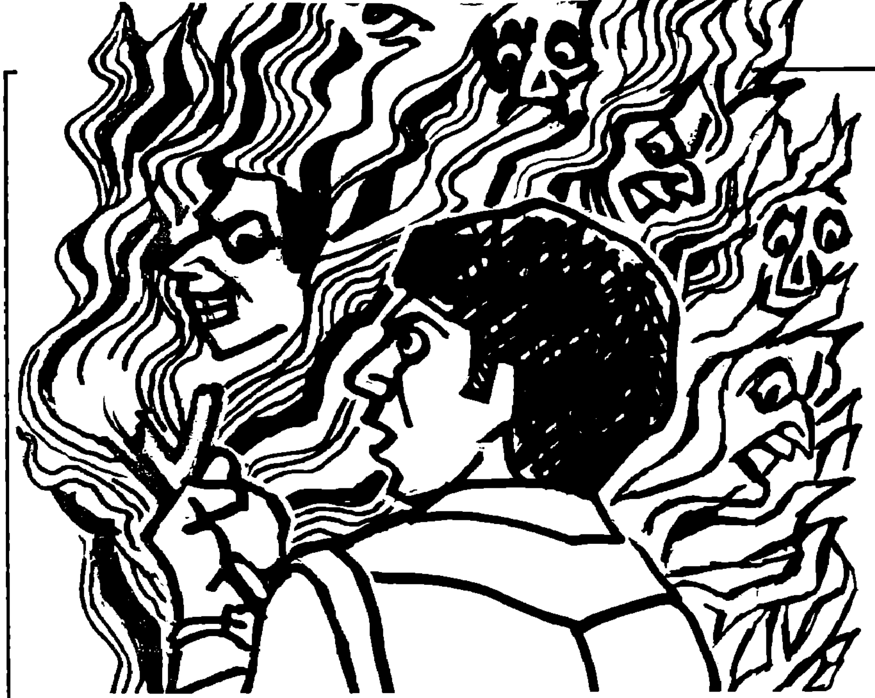

আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের ঝোপে।

কথাটা শুনেই হরিধন মাছ দুটো জোর করে চক্রবর্তী মশাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, বাবু আপনি বামুন মানুষ। পৈতে আছে তাই আপনার হাত থেকে কেউ মাছ নিতে পারবে না। আমার হাতে থাকলে নির্ঘাত আমার ঘাড় মটকে মাছ নিয়ে যাবে। কথা শেষ করেই সে রাম রাম করতে থাকে।

চক্রবর্তী মশাইও বেশ ঘাবড়ে যান। তাড়াতাড়ি অন্য হাতে জামার ভেতর থেকে পৈতেটা বার করে আঙুলে পেঁচিয়ে হাঁটতে থাকেন। পেছন পেছন হরিধনও তার বাবুকে স্পর্শ করে হাঁটতে থাকে।

চক্রবর্তী মশাইয়ের হাতে পৈতে দেখে পেত্নী খুব রেগে যায়, তঁবে রেঁ বিঁটলে বাঁমুন, আঁজ তোঁর এঁকদিঁন কিঁ আঁমার এঁকদিন। ভাঁল চাঁস তোঁ মাঁছ দিঁয়ে যাঁ।

চক্রবর্তী মশাইরা কথা না বলে আরও জোরে হাঁটতে থাকেন। এমন সময় মড়মড় শব্দ করে পথের পাশের পাকুড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। আর একটু হলেই ওদের মাথায় এসে পড়তো। হরিধন চিৎকার করে রাম নাম জপতে জপতে বলে, বাবু মাছটা দিয়ে দিন, না হলে রক্ষা নেই।

চক্রবর্তী মশাই চিৎকার করে বলেন, না, কিছুতেই মাছ দেব না। পেত্নীটাও নাকি গলায় চেঁচিয়ে বলে, দিঁবি নাঁ তোঁ; দেঁখাচ্ছি মঁজা। সঙ্গে সঙ্গে ধুপধাপ করে ইট পড়তে থাকে। চক্রবর্তী মশাই বলেন, দৌড়ো হরিধন, দৌড়ো। একেই ঘুটঘুটে অন্ধকার তার ওপর এত জোরে বৃষ্টি পড়ছে যে পাশের লোককেই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবুও ওরা কোনোদিকে না তাকিয়ে প্রাণপণ ছুটতে আরম্ভ করে। পেছন পেছন থপ-থপ-থপ করতে করতে হাজার পায়ে কে যেন ছুটে আসে। আর নাকি কণ্ঠে একটানা ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে পেত্নীটা, মাঁছ দিঁয়ে যাঁ বাঁমুন, নাঁ হঁলে তোঁর সঁর্বনাশ কঁরবো। তোঁদের সঁবাইকে মেঁরে রঁক্ত চুঁষে খাঁব।

চক্রবর্তী মশাই তবু মাছ দিচ্ছেন না দেখে কোথা থেকে ঐ বৃষ্টির মধ্যেই ঝর ঝর করে শুকনো পাতা ও কাঠকুটো ওদের ওপর এসে পড়ে। চক্রবর্তী মশাই ও হরিধন প্রাণপণে ছুটতে থাকেন। এভাবে ছুটতে ছুটতে একসময় জমিদার বাড়ির বিশাল ফটক চোখে পড়তেই দুজনে 'দরজা খোল, দরজা খোল' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে গিয়ে ফটকে দুম দুম করে ঘা মারতে থাকে। পেছন থেকে নাকি সুরে পেত্নীটা হ্যাঁ হ্যাঁ করে বিচ্ছিরি হাসি হেসে বলে ওঠে, এবাঁর কোঁথায় পালাঁবি বাঁমুন; এখঁন তোঁর বাঁড়ি ঢুঁকে মাঁছ খাঁব।

কথাটা শুনেই হরিধন চক্রবর্তী মশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে বলে, দিয়ে দিন বাবু ও মাছ, আর ভেতরে নিয়ে যাবেন না, তাহলে তিনি যে বাড়িতে ঢুকবেন। একবার এই জিনিস বাড়িতে ঢুকলে সবাইকে খেয়ে তবে বেরুবে।

অশোক চক্রবর্তী নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে বুকে বল পান। তিনি ময়মনসিংহ জেলার নামকরা চক্রবর্তী বাড়ির ছেলে, যাদের দাপটে এক সময় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। সেই বাড়ির ছেলে হয়ে সামান্য একটা পেত্নীর কাছে নতিস্বীকার করবেন তিনি? না কক্ষণো নয়। ইতিমধ্যে চক্রবর্তী মশাইয়ের গলা পেয়ে বাড়ির লোকজন সব জেগে উঠেছে। দারোয়ান লালু সিং এসে ফটক খুলে দিলে চক্রবর্তী মশাই মাছ হাতে নিয়ে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে ফটকের পাশের দেওয়াল থেকে এক মুঠো বালি খসিয়ে নিয়ে তাতে ফুঁ দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দিলে নাকি কণ্ঠ বলে ওঠে, ছেঁড়ে দিলাঁম বাঁমুন; তঁবে ঐঁ মাঁছ আঁমি খাঁমুই।

'সাহস থাকে তো খাস্' বলতে বলতে চক্রবর্তী মশাই ভেতরে চলে গেলেন। দারোয়ান ফটক বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফটকের বাইরে বেল গাছের ওপর থেকে কে যেন বিকট শব্দে রক্ত জল করা হাসি হেসে উঠল হা-হা-হা-হা-আঁ-আঁ।

(২)

পূর্বধলা ময়মনসিংহ জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের জমিদার চক্রবর্তীদের সবাই একডাকে চেনে। এই অঞ্চলের লোকেরা খুব অতিথিপরায়ণ। নিতান্ত দরিদ্র অর্ধাহারে থাকা কোনো পরিবারে গেলেও একটুকরো বাতাসা বা একমুঠো চালভাজা দিয়ে এক গ্লাস জল না খেয়ে কেউ যেতে পারে না, আর চক্রবর্তীরা তো জমিদার। তাঁদের বাড়িতে অতিথি মানেই বিরাট ব্যাপার। আর আজ তো কোনো কথাই নেই, জমিদারের একমাত্র মেয়ে আর জামাই এসেছে। তাই চক্রবর্তী বাড়িতে এলাহি ব্যাপার চলছে। এতদিন জমিদার অশোক চক্রবর্তী মহালে ছিলেন, তিনি বাড়ি ফিরতেই বাড়িতে আবার সাজ সাজ রব পড়ে গেল। জমিদার মশাই বাড়িতে ঢুকেই ঘোষণা করলেন, এক্ষুণি এই মাছ দুটো কেটে ঝোল, ঝাল, টক, মুড়িঘণ্ট, মাছভাজা সব রান্না করে দিতে হবে। তিনি নিজে বসে থেকে মেয়ে-জামাইকে খাওয়াবেন। মেয়ে-জামাই অনেক করে নিষেধ করলেও তিনি শুনলেন না। অত রাতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই নতুন করে শুরু হলো রান্না।

চক্রবর্তী বাড়ির আঁশঘর বা মাছ রান্নার ঘরটা মূল বাড়ি থেকে একটু তফাতে,

উত্তর দিকে বাউন্ডারি ওয়ালের ধারে। বড় বড় তিনটে উনানে আঁচ পড়েছে। পাঁচজন পরিচারিকা বসে গেছে কাজে। কেউ মশলা বাটছে, কেউ আলু-পেঁয়াজ কাটছে, কেউ তেঁতুল গুলছে, কেউ বা উনানে হাওয়া দিচ্ছে। বারবাড়ি থেকে চাকররা মাছ কেটে ধুয়ে দিয়ে গেলে রাঁধুনী রাখালের মা সবচেয়ে বড় উনানটাতে মাছ ভাজতে বসল। মাছ ভেজে ঝুড়িতে রাখছে। জমিদারগিন্নী মাঝে মাঝে এসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মাছ ভাজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় চক্রবর্তী মশাইয়ের মেয়ে ঐন্দ্রিলা মাকে ডাকতে রান্নাঘরে ঢুকেই চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ঐন্দ্রিলাকে পড়ে যেতে দেখে রান্নাঘরের সবাই কাজ ফেলে ছুটে আসে ওর কাছে। হঠাৎ রাখালের মার চোখ যায় বড় উনানের পেছনে খোলা জানালার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে, মাইচ্ছা পেতুনী, মাইচ্ছা পেতুনী।

এদিকে গোলমাল শুনে ভেতর বাড়ি থেকে সবাই বেরিয়ে আসে। বড় বড় হ্যাজাকের আলোতে রান্নাঘর ও তার সংলগ্ন প্রাঙ্গণ দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চক্রবর্তী মশাই, তাঁর ভাই, জামাই সকলে মিলে ঐন্দ্রিলাকে রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে নিয়ে আসে। তার মাথায় জল ঢেলে, চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে কোনোরকমে জ্ঞান ফেরানো হয়। কিন্তু ঐন্দ্রিলা এতই ভয় পেয়েছে যে সে ভাল করে কথা বলতে পারে না। তাকে বিশ্রাম করতে দিয়ে চক্রবর্তী মশাই জামাইয়ের সঙ্গে বাইরের বারান্দায় আসতেই দেখেন রান্নাঘরের বারান্দায় রাখালের মাকে ঘিরে জটলা। চক্রবর্তী মশাই কাছে এসে প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে রাখালের মা, তুমি এরকম করছো কেন?

ভয়ে রাখালের মার তখনও থরহরি কম্প, চোখ দুটো যেমন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, মাথার চুল উষ্কখুষ্ক, ঘোমটা খসে পড়েছে। কোনোরকমে সে আঙুল তুলে রান্নাঘর দেখিয়ে বলে, মাইচ্ছা পেতুনী, মাইচ্ছা পেতুনী। অশোক চক্রবর্তী বলেন, মাইচ্ছা পেতুনী; সে আবার কি?

রাখালের মা জবাব দেবার আগেই রান্নাঘরের পেছন থেকে একটা পৈশাচিক হা-হা-হা-হা হাসি ভেসে আসতেই সবাই শিউরে ওঠে। কারো মুখে রাটি নেই। হঠাৎ চক্রবর্তী মশাইয়ের জামাই অলকেশ হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে যেতেই অন্যান্য পুরুষরাও তাকে অনুসরণ করে। রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়েই জামাই ঠোঁটে আঙুল রেখে সবাইকে চুপ করতে বলে পা টিপে টিপে ভেতরে ঢোকে। রান্নাঘরের ভেতরে দুটো লণ্ঠন জ্বলছে, সেই আলোতে অলকেশ দেখে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। জানলার পেছনে বিশাল উঁচু তাল গাছের মাথা থেকে একটা লম্বা গলা নেমে এসেছে জানলা পর্যন্ত। সেই গলার শেষ প্রান্তে একটা পুড়ে যাওয়া বীভৎস মুখ থেকে লকলকে জিভ বেরিয়ে এসে জানলার গরাদ গলে ভেতরে ঢুকে মাছ ভাজার ঝুড়ি থেকে মাছ তুলে নিচ্ছে। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। সবাই বুঝতে পারে রাখালের মা একেই 'মাইচ্ছা পেতুনী' অর্থাৎ মাছখেকো পেত্নী বলেছে।

ব্যাপার দেখে তো সবার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। অলকেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় উনানের দিকে। উনানের ওপর বসানো গরম তেল টগবগ করে ফুটছে। কড়াতে যে মাছের টুকরোগুলো ছিল সেগুলো অবশ্য পুড়ে কালো হয়ে গেছে। অলকেশ চুপ করে উনানের সামনে দাঁড়ায়। জিভটা কয়েকটা মাছের টুকরো নিয়ে জানলার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, মুখের মধ্যে সেগুলো চালান করে দিয়েই আবার মাছ নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর মুখটা জানলার বাইরে বড় বড় দাঁতে কচমচ কচমচ করে মাছ চিবিয়েই চলেছে। চারিদিকে একটা দমবন্ধ করা আঁশটে গন্ধ। জিভটা যেই আবার জানলা দিয়ে ঢুকে মাছের ঝুড়ি থেকে কয়েকটা মাছের টুকরো তুলতে গেছে, অলকেশ অমনি এক হাতা গরম তেল তুলে জিভে ঢেলে দিয়েছে। সেকি পরিত্রাহি চিৎকার! খানিক পরেই দুপদাপ ধুপধাপ শব্দে কে যেন দূরে ছুটে চলে গেল।

চিৎকারটা দূরে মিলিয়ে যেতেই চক্রবর্তী মশাই দৌড়ে এসে অলকেশকে জড়িয়ে ধরেন। অলকেশ প্রচণ্ড সাহসী হলেও পেত্নীর চিৎকার শুনে সেও কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এরপর সবাই মিলে সমস্ত মাছগুলো বাড়ির বাইরে ফেলে দিয়ে রান্নাঘর বন্ধ করে দিল। চক্রবর্তী মশাইরা তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে চারপাশে ধুলোর রামগণ্ডী টেনে শুয়ে পড়লেন। সবারই মনে এক চিন্তা কখন কি হয়। সে রাতটা অবশ্য সবারই বিনিদ্র কাটে।

পরের দিন সকালে ঐন্দ্রিলা আর অলকেশ ঢাকা চলে যায়। সেই রাত থেকে শুরু হয় ভূতের উপদ্রব। বড় বড় পাথর, ইট, মাটির ঢেলা পড়তে থাকে দুম-দাম করে। ভয়ে কেউ ঘরের বাইরে বের হতে পারে না। দারোয়ান লালু সিং ফটক ভাল করে বন্ধ করে তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, ধাঁই করে একটা আধলা ইট এসে তার কপালে লাগতেই কপাল থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। কালী বুধির বাচ্চা বাছুরটা ছাড়া ছিল, সেটাকে বাঁধতে যেতেই ঠক করে একটা পাথরের টুকরো লেগে রাখালের কান কেটে গেল। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল অশরীরীর বিকট অট্টহাসি। এতেই ভূতেরা শান্ত হলো না, মাঝরাত থেকে যত সব পচা গলা মাংস, হাড়গোড়, নাড়িভুঁড়ি পড়তে লাগল জমিদার বাড়ির ভেতরে। দুর্গন্ধে বাড়িতে টেঁকাই দায় হলো। পরের দিন জমিদার বাড়ি থেকে চক্রবর্তী মশাইয়ের পোষা কুকুর বাঘা হারিয়ে গেল। তার পরের দিন হারাল একটা গরু। ফটক বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পশু দুটো যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। দু'দিন পরে দুপুর বেলায় গ্রামের শেষ প্রান্তে পোড়ো জমিতে পাওয়া গেল বাঘার ছিন্নভিন্ন দেহ। আরও ক'দিন পর বুড়িবটতলার কাছে ঝোপের মধ্যে গরুটার হাড়গোড় পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে সমস্ত পূর্বধলা গ্রামটাতেই ভূতের অত্যাচার শুরু হলো। দিনের বেলায় সব শান্ত কিন্তু রাত্রি হলেই গ্রামটা যেন ভূতেদের আড্ডায় পরিণত হয়। কত ওঝা গুণিন আনা হলো, ঝাড়-ফুঁক, মারণ-উচাটন চলল কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। ভূতের উপদ্রব বাড়ল বই কমল না। সব দেখে চক্রবর্তী মশাই অস্থির হয়ে উঠলেন। এসব অত্যাচারের মূলে তিনি। সেদিন যদি মাছ দুটো দিয়ে দিতেন তাহলে এই সব কাণ্ড হতো না।

কয়েক মাসের মধ্যে পূর্বধলা গ্রাম প্রায় শ্মশানে পরিণত হলো। কত গরু-ছাগল যে মরল তার ঠিক নেই। অনেক মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে গেল ভূতে। ভয়ে কেউ আর সন্ধের পর ঘর থেকে বার হয় না। এমনকি বিপদে পড়ে কেউ দরজার কড়া নাড়লেও এই অতিথিপরায়ণ মানুষগুলো দরজা খুলতে সাহস পায় না। কে জানে কখন ভূতে মানুষ সেজে কড়া নাড়বে। দরজা খুললেই ঘাড় মটকে রক্ত

চুষে খাবে।

এইভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ভূতের উপদ্রব কিন্তু কমে না বরং দিনে দিনে আরোও বেড়ে চলে। ভূতের ভয়ে তখন অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। চক্রবর্তী মশাইও ভাবছেন বাড়িতে তালা লাগিয়ে সবাই মিলে কলকাতা চলে যাবেন। তাঁদের বিশ পুরুষের বাস এই পূর্বধলা গ্রাম ছাড়বার কথা ভাবলেই ব্যথায় বুক ভরে ওঠে। কিন্তু কত আর সহ্য করা যায়। অবশেষে ঠিক করলেন সামনের অমাবস্যা কাটলেই তিনি সবাইকে নিয়ে কলকাতা চলে যাবেন।

(৩)

অমাবস্যার রাত। চারিদিক নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা। এক ফোঁটা হাওয়া নেই। গ্রামের মধ্যে মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা। মাঝে মাঝে কর্কশ স্বরে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। আর হঠাৎ হঠাৎ রক্ত হিম করা এক বিশ্রী হাসি হা-হা-হা-হা। সেদিন আবার মৌনি অমাবস্যা। এ এক ভয়ঙ্কর রাত। এদিন মহাকাল তার পিশাচদের নিয়ে জেগে উঠে তাণ্ডব নৃত্য চালায়। তাদের নজরে পড়লে আর রক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত চুষে খাবে।

এমন রাতেই দিদির বাড়ি চলেছে শ্যামল। শ্যামল চৌধুরী সেনাবাহিনীর অফিসার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে ব্রিটিশের হয়ে লড়াই করেছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তাই সে ছুটি নিয়ে ময়মনসিংহ শহরে তার বাড়িতে এসেছে। সেখান থেকে সপ্তাহ খানেকের জন্য চলেছে দিদির বাড়ি বেড়াতে পূর্বধলা গ্রামে। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার সে কিছুই জানে না। তাই সে একাই স্টেশন থেকে হেঁটে চলেছে জমিদার বাড়ির দিকে। তার দিদি চক্রবর্তী মশাইয়ের স্ত্রী। একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বালিয়ে নিজের মনে রাস্তায় হাঁটছিল শ্যামল। হঠাৎ খস্ খস্ শব্দে মনে হয় কেউ যেন নতুন কাপড় পরে তার পিছন পিছন আসছে। শ্যামল ফিরে তাকাতেই মনে হলো পিছনে নয় তার সামনে কেউ আছে। এইভাবে কয়েকবার সামনে পিছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে শ্যামল। এবার তার ঘাড়ের ওপর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে। মনে হয় কেউ যেন ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলছে। শ্যামল আবার পিছন ফেরে। না, কেউ কোথাও নেই। সে ফের হাঁটতে থাকে। এবার তার মাথায় ঠক করে এক টুকরো ইট এসে লাগতেই শ্যামল মিলিটারি মেজাজে হাঁক পাড়ে, এই কে রে, সাহস থাকে তো সামনে আয়।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে ওঠে হাসির রোল—হিঁ-হিঁ-হিঁ-হা-হা-হা-ইঁ-ইঁ-ইঁ-উঁ-উঁ-উঁ। শ্যামল কিন্তু এতটুকু ভয় পায় না। উল্টে আরোও জোরে চিৎকার করে বলে, দাঁড়া তো দেখাচ্ছি। সামনের মাঠে জড়ো করে রাখা ছিল খড়। দেশলাই জ্বালিয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিল শ্যামল। তাতে শুকনো ডালপালা ফেলে দিতেই দেখতে দেখতে চারপাশ আলোকিত হয়ে ওঠে। আগুন দেখেই ভূতেরা ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে যায়। রাগে তারা ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। শ্যামল একটা গাছের বড় মোটা শুকনো ডাল যোগাড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে পথ হাঁটতে থাকে।

মাঠ পার হতেই আবার চারপাশ অন্ধকার। তবে শ্যামলের হাতের মোটা ডাল মশালের মতো জ্বলছে। শ্যামল দ্রুত পা চালিয়ে একসময় বড়ো একটা পুকুরের পাড়ে পৌঁছায়। পুকুরের এপাড়ে কাঁচা সড়ক, অন্য পাড়ে বুড়িবটতলা। জায়গাটার কাছে আসতেই সি-ই-ইঁ, সি-ইঁ-ই শব্দ শুনে শ্যামল তাকিয়ে দেখে থান পরা ঘোমটা দেওয়া লম্বা মতো একজন বৌ পুকুরের অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘোমটা ঢাকা মুখের ভেতর থেকে ভয়াল দর্শন একটা জিভ একটু একটু করে বড় হয়ে পুকুর পেরিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এবার শ্যামল ভয় পায়। এত ভয় পায় যে তার হাত থেকে জ্বলন্ত ডালটা মাটিতে পড়ে যায়। জিভটা এগিয়ে আসছে...আসছে...আসছে। ভীষণ আঁশটে একটা গন্ধে চারদিক ভরে ওঠে। জিভটা পুকুর পার হয়ে একদম শ্যামলের সামনে এসে গেছে। শ্যামল শেষবারের মতো পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু তার পা দুটো কে যেন মাটিতে গেঁথে দিয়েছে। ভয়ে সে দুই চোখ বন্ধ করে ফেলে। হঠাৎ একটা চিৎকার কানে আসতেই শ্যামলের চোখ খুলে যায়, দেখে অতবড় জিভটা ক্রমশ ছোট হয়ে পুকুরের অপর পাড়ে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কাতর আর্তনাদ শোনা যায়, বাঁমুন...পৈঁতে...ওঁরে বাঁবা মঁরে গেঁলুম, মঁরে গেঁলুম।

ঝট করে শ্যামলের মাথায় রক্ত উঠে যায়। সে মাটি থেকে জ্বলন্ত ডালটা তুলে নিয়ে পুকুরের পাড় ধরে সাদা থান পরা পেত্নীটার দিকে ছুটতে থাকে। শ্যামলকে মশাল হাতে আসতে দেখে পেত্নীটাও ছুটতে থাকে। বুড়িবটতলা পেরিয়ে একটা বড় শ্যাওড়া গাছের কোটরে ঢুকে যায় পেত্নীটা। শ্যাওড়া গাছটার সামনে পচা গলা মাংস, হাড়, নাড়িভুঁড়ি এমনভাবে ছড়ানো যে যাওয়াই যায় না, তার ওপর প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। শ্যামল এসব অগ্রাহ্য করে শ্যাওড়া গাছের কাছে এসে দাঁড়াতেই পেত্নীটা বলে ওঠে, আঁমায় ছেঁড়ে দেঁ বাঁমুন, তোঁকে আঁমি অঁনেক টাঁকা দেঁব।

'তবে রে পেত্নী, দেখ তোকে কি করি', বলে শ্যামল তার পিঠের ব্যাগ থেকে পেট্রোলের শিশি বার করে শ্যাওড়া গাছে ছড়িয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার শোনা যায়, ওঁরে বাঁচারে—জ্বঁলে গেঁলাম, জ্বঁলে গেঁলাম। শ্যাওড়া গাছ থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের ঝোপে। চারপাশ লাল হয়ে ওঠে। ঐ ঝোপেই অন্য সব ভূতেদের আস্তানা, তারাও আগুনে পুড়ে গেল। চারপাশে তখন রক্ত হিম করা আর্তনাদ, আঁ-আঁ-আঁ-আঁ, গেঁলাম-মঁরলাম।

গ্রামের লোকেরা আর্তনাদ শুনে আর আগুন দেখে ঘরে বসে থাকতে পারল না। তারা হাতের কাছে যে যা পেল নিয়ে ঘর থেকে সদলবলে বেরিয়ে এসে আগুন লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। সবার হাতে বড় বড় মশাল। ছুটতে ছুটতে তারা একসময় শ্যাওড়া গাছের কাছে পৌঁছে শ্যামলকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হতবাক হয়ে গেল। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তারা শ্যামলকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

সকাল হলো। দেখা গেল ভূতেরা সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। তখন গ্রামবাসীদের সেকি আনন্দ। আনন্দের চোটে তারা এক বিশাল ভোজের আয়োজন করে বসল। রাজধলা বিল থেকে বড় বড় মাছ তোলা হলো। দু'দিন ধরে চলল খাওয়া-দাওয়া। সেই থেকে পূর্বধলা গ্রামে আর একটাও ভূত নেই। বিশ্বাস না হয় তো বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার এই গ্রামটায় ঘুরে আসতে পার।

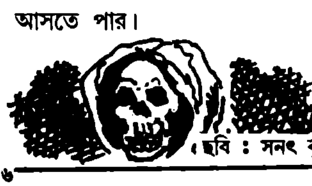

। ছবি : সনৎ কুমার দাস

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

সেলফোনে ক্যামেরা

'ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস'—পটলডাঙার টেনিদা এখন বেঁচে থাকলে ঐ কথা বলে লাফিয়ে উঠতেন। কারণ তোমার সেলফোন এবার থেকে ক্যামেরারও কাজ করবে। না কোনো ম্যাজিক নয়। কতগুলি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে এটা সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, কমিউনিক্যামকে (Communicam) এরিকসন জি. এস. এম. (এরিকসন GSM) সেলফোনের সঙ্গে যুক্ত করলেই সেটা হয়ে যাবে ডিজিটাল ক্যামেরা। তখন তুমি তাতে ছবি তুলে সেই ফটো ই-মেল করে পাঠাতে পারবে বা এরিকসনের ওয়েবসাইটে ধরে রাখতে পারবে। সেটা হবে তোমার ব্যক্তিগত অ্যালবাম। এই সেলফোন ক্যামেরা খুবই হাল্কা। ওজন মাত্র .৮৮ আউন্স। প্রতি মিনিটে পাঁচটি ছবি তুলে অ্যালবামে রাখা যায়। দাম? মাত্র একশ পঞ্চাশ ডলার।

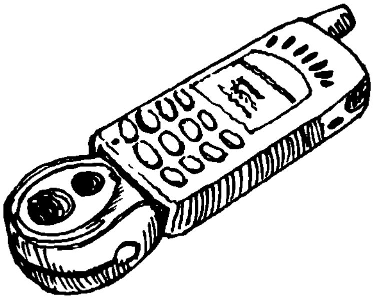

হাতের মুঠোয় লাইব্রেরি

অধ্যাপক টেড উইলিয়ামস এবং তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন কম্পিউটারের এক অতি আধুনিক স্মৃতি সংগঠন (Memory System) যার মধ্যে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার ব্রিটিশ লাইব্রেরির যাবতীয় গ্রন্থ, পুস্তিকা তথ্যাদি সংরক্ষণ করা গেছে। অথচ তার আকৃতি একটি ক্রেডিট কার্ডের মতো। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন The Keele High Density System (KHD)।

গ্রেট ব্রিটেনের কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টেড এ প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রচলিত বাইনারী কোড প্রযুক্তি বাতিল করে স্মৃতি সংরক্ষণে অন্য নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তিপ্রয়োগের ফলে তথ্য প্রযুক্তির সব বিভাগেই দারুণ উন্নতি ঘটবে ও অর্থ সাশ্রয় হবে।

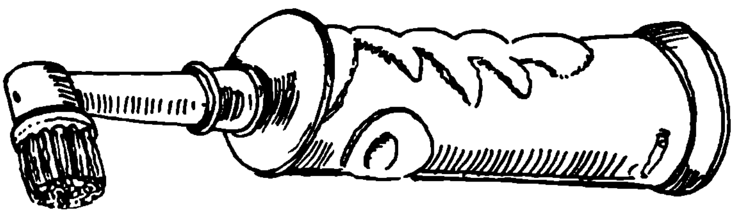

গান-ব্রাশ

না না, বন্দুকবাজি নয়। টুথব্রাশের কথা বলছি। 'ওল্ড ম্যাকডোনাল্ড' কোম্পানি সুদৃশ্য এক টুথব্রাশ মাত্র চল্লিশ ডলারে বিক্রি করছে। নাম Braun Orals B। এই টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলে উৎপন্ন হবে মধুর সংগীত মূর্ছনা। দাঁত মাজা বন্ধ হলে গানের সুরও থেমে যাবে। দাঁতের সঙ্গে ব্রাশের ঘর্ষণে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে ব্রাশের মধ্যে বিশেষভাবে রক্ষিত কিছু ইলেক্ট্রনিক চিপ সংগীত উৎপন্ন করবে। চিপগুলোকে আগে থেকে সেই নির্দেশ দেওয়া আছে। তবে চোদ্দ রকমের বেশি গান কিন্তু শুনতে পাওয়া যায় না। সেটাই বা মন্দ কি! সকালবেলায় সংগীতের মধুর সুর দিয়ে দিন তো আরম্ভ হবে।

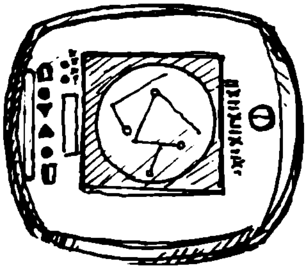

টুইঙ্কল, টুইঙ্কল লিটল্ স্টার

রাতের আকাশে কত তারা। তাদের কোনোটা গ্রহ, কোনোটা নক্ষত্র। নামও সব আলাদা আলাদা। কিন্তু কোনটা কে? চিনব কিভাবে? আর ভাবনা নেই, তুমি সহজেই ছোট একটা যন্ত্রকে তোমার তারা চেনার প্রদর্শক করতে পারো। ছোট্ট এই ব্যাটারি চালিত যন্ত্রে সুইচ টিপে মহাকাশের মানচিত্র অনুযায়ী তুমি তথ্য ভরে দাও। স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রের সূচক তোমার নির্দিষ্ট নক্ষত্র বা গ্রহের দিকে ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়াবে। যন্ত্রের পর্দায় ফুটে উঠবে সেই নক্ষত্র বা গ্রহ এবং তার চারপাশের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান। বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি পর্যন্ত সব দৃশ্যমান গ্রহগুলিকেই চিহ্নিত করতে পারে ছোট্ট এই যন্ত্র। দাম মাত্র চারশ' পঞ্চাশ ডলার।

দশ মিনিট সময় দিন

জলের পাইপে ফুটো, বেগে জল বেরোচ্ছে অথবা গ্যাসপাইপে লিক, দৈনন্দিন জীবনে এরকম সমস্যা প্রায়শই ঘটে। তখন মিস্ত্রি ডাকো, জলের পাইপ, গ্যাসের পাইপ বন্ধ করো, মানে সব কাজকর্মও বন্ধ। এসব সমস্যার সমাধানে Vortex Industrial Products আবিষ্কার করেছেন 'কুইক রিপেয়ার'। এই কুইক রিপেয়ার একটি তন্তুময় ব্যান্ডেজ, যে ব্যান্ডেজ গ্যাস, তেল, জল, বাষ্পবাহী যেকোনো ধরনের ফাটা পাইপ মাত্র দশমিনিটে সারিয়ে দেয়। টুকরো পাইপ জুড়তেও এই ব্যান্ডেজের জুড়ি নেই। Aramid তন্তু দিয়ে তৈরি ব্যান্ডেজ দ্রুত গলে গিয়ে ছিদ্রর মধ্যে জমে যায় এবং তার উপরে ব্যান্ডেজের উচ্চ তাপ ও চাপ নিরোধক পলিমারের আস্তরণ পড়ে পাইপের আয়ু বাড়িয়ে দেয়। ভারতবর্ষে এই বস্তুটির বিপণন করবেন র‍্যান্ড পলিপ্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড।

ছবি : জুরান নাথ

নিমু-চোর

রীতা ভট্টাচার্য

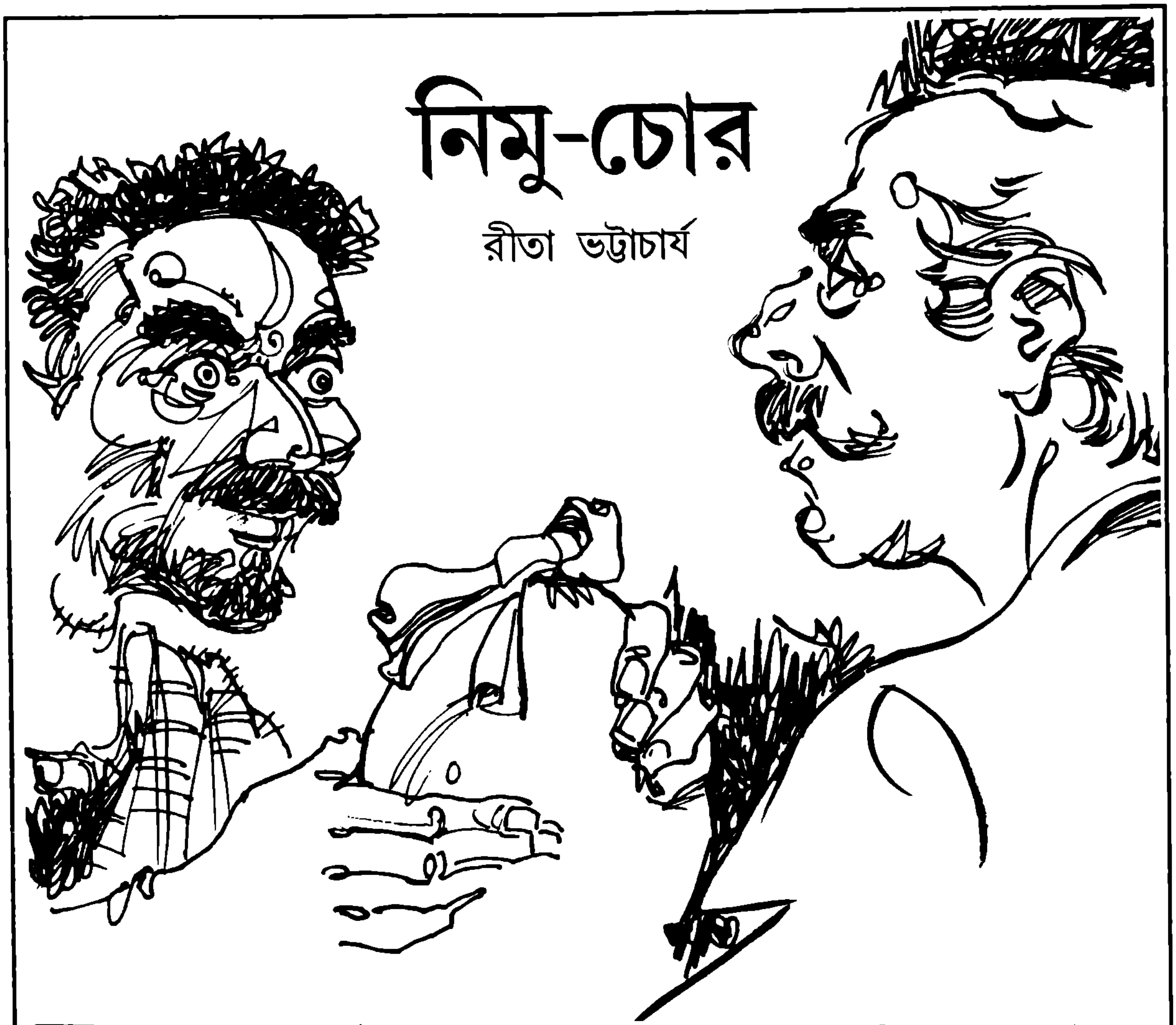

সময়টা নভেম্বরের প্রথম। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে এবার। সিদ্ধেশ্বর গোস্বামী কর্মজীবনে ছিলেন জেলর। বিভিন্ন জেলেতে ঘুরেছেন সেইসময়। এখন রিটায়ার করেছেন। অবসরের পরে মধ্যমগ্রামে পৈতৃক বাড়িটি সারিয়ে নিয়েছেন। সেখানেই থাকেন। নিজের বলতে কেউ নেই তাঁর। বাবা, মা অনেক আগেই গত হয়েছেন। একমাত্র সন্তান হওয়াতে ভাইবোন কি জিনিস তাও কোনোদিন জানতে পারেননি। বিয়ে করবার পর স্ত্রীই ছিলেন সঙ্গী। তা তিনিও বছর তিনেক হলো আর ইহলোকে নেই। কোনো সন্তান-সন্ততিও নেই নিজের। সুতরাং সিদ্ধেশ্বর গোস্বামী একদমই একা। অবসরের পরে দুটো জিনিসে আপাতত মনোনিবেশ করেছেন। প্রথমটি হলো বাগান করা আর দ্বিতীয়টি বই লেখা।

মধ্যমগ্রামের একতলা বাড়ির পাশে একবিঘা জমি নিয়ে একটা বাগান করেছেন তিনি। সেখানে নানারকম সবজি, ফুল-ফলের চাষ করেন। বাগানের একপাশে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারস, অন্যপাশে গোয়াল। গোয়ালে তিনটি দুধেল গাই আছে। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও সিদ্ধেশ্বরের শরীর বেশ শক্তপোক্ত। যৌবনে নিয়মিত যোগ-ব্যায়াম আর শরীর-চর্চা করবার সুফল এটা। বাগানের কাজ তিনি নিজের হাতেই করতে চেষ্টা করেন। তবে ইদানীং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য একজন লোক রেখেছেন। লোকটির নাম বৃন্দাবন। বৃন্দাবন এক নম্বরের ফাঁকিবাজ, আবার কিছুটা রুগ্নও। প্রায়ই নানা কারণ দেখিয়ে সে কাজে আসে না। সিদ্ধেশ্বর ওকে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে থাকতে বলেছিলেন। বৃন্দাবন রাজী হয়নি। ওর বাড়ি বারাসতে। বারাসত থেকেই ও মধ্যমগ্রামে যাতায়াত করত। এই ব্যবস্থাই চলছিল। তা গত পাঁচদিন ধরে বৃন্দাবন কাজেই আসছে না।

সিদ্ধেশ্বরের দ্বিতীয় হবিটির জন্য রাত্রিবেলাটাই রেখেছেন তিনি। সারাদিন বাগানের কাজে সময় দিয়ে রাতে কাগজ-কলম নিয়ে বসেন। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি বই লিখছেন—'জীবনকে যেরকম দেখেছি'। সিদ্ধেশ্বর যখন জেলর ছিলেন, তখন নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। ঐ ডায়েরিতে লেখা আছে কত খুনী আসামী, চোর, ডাকাতের কথা। সেইসব টুকরো টুকরো কাহিনীগুলোকে এক সুতোয় গেঁথে গেঁথে এখন সুন্দর করে সাজাচ্ছেন সিদ্ধেশ্বর। সত্যি বলতে কি, তাঁর জীবনের কথা লিখতে গেলে এদের কথা কিছুতেই বাদ দেওয়া যাবে না।

ইদানীং শীতের জন্য সিদ্ধেশ্বর যেন একটু বেশিই কাহিল হয়ে পড়েছেন।

অনেকক্ষণ রাত জেগে আর লিখতে পারছেন না। গতকাল রাতে আবার বেশ খানিকটা ঝড়বৃষ্টিও হয়ে গেছে। একে ঠাণ্ডা, তায় বৃষ্টি। আজ তাই শীতটা এমন জাঁকিয়ে পড়েছে যে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে সিদ্ধেশ্বরের। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর সিদ্ধেশ্বর সোজা কম্বলের তলায় গিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। আজ আর লেখায় মন নেই তাঁর। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ। কম্বলের ভেতরটাও বেশ উষ্ণ। সিদ্ধেশ্বরের চোখে সুখনিদ্রা নেমে আসে।

মাঝরাতে কিসের যেন খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। ঘুমটা তাঁর বরাবরই খুব পাতলা। সামান্য শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখেন, ঘরের মধ্যে ক্ষীণ আলো। লক্ষ্য করলেন ভালো করে, নাহ্, এটা তো তাঁরই টর্চের আলো। কেউ ঘরের মধ্যে তাঁরই টর্চ জ্বেলে কাজ করছে। গভীর রাতে ঘরের মধ্যে টর্চ জ্বেলে কাজ করবে কে? কথাটা মাথাতে আসতেই বিছানার ওপর তড়াক করে উঠে বসলেন সিদ্ধেশ্বর। অ্যাঁ, চোর? চোর ঢুকেছে ঘরে? রিটায়ার্ড জেলরের ঘরে চোর?

সিদ্ধেশ্বর হাঁক পাড়েন, এই কে রে? কে ওখানে? ব্যস অমনি ঝপ করে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। চোরটা টর্চটা নিবিয়ে দিয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর হাতড়ে হাতড়ে সুইচ বোর্ডের দিকে এগোতে থাকেন। টেবিল ল্যাম্পটা খাটের পাশেই ছিল, সিদ্ধেশ্বরের হাত লেগে মাটিতে পড়ে গেল। বালবটা বোধহয় ভেঙেই গেল। সিদ্ধেশ্বর ঘরের সুইচটা টিপলেন এবার। টিউব-লাইটের তীব্র আলোয় ঘরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সিদ্ধেশ্বর দেখলেন যে, ঘরের একধারে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি লোক। ভীষণ কালো। লম্বা, লিকলিকে চেহারা। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। গাল দুটো বসে গিয়ে ওখানে গর্ত হয়ে গেছে। লোকটা ভীষণ ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো সিদ্ধেশ্বরের। তিনি লোকটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ফ্রিজ থেকে পেস্ট্রির ট্রেটা বের করা হয়েছে। তার ওপর মাছের ঝোল, পায়েস যা ছিল, সব ঢালা হয়েছে। লোকটা গোগ্রাসে ওসব গিলছিল এতক্ষণ। ঠোঁটের ওপরে পুরু হয়ে পেস্ট্রির ক্রিম লেগে রয়েছে এখনও। সিদ্ধেশ্বর হেসে ফেললেন। নাহ্, চোরটা মনে হচ্ছে খুবই পেটুক। আলমারি খোলেনি। অথচ চাবিটা পাশেই দেওয়ালের পেরেকে ঝুলছিল। ওই আলমারিতে সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীর গয়নাগাঁটি, টাকা-পয়সা —সবই রাখা থাকে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, এই, এখানে কি করছিলি তুই?

লোকটি কাঁপা গলাতে বলল, এজ্ঞে, চুরি করছিলাম।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, চুরি যে করছিলি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কি নাম তোর?

লোকটি মাথা চুলকায়। বলে, এজ্ঞে, নিমাই। কিন্তু লোকে নিমু-চোর বলেই ডাকে আমারে।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুটি করেন, নি-মাই? চোরের নাম নিমাই? তোর মা-বাপ আর নাম পেল না খুঁজে? অবশ্য তাদেরই বা কি দোষ। তারা তো আর জানত না যে, তুই বড় হয়ে চোর হবি। নিমাই চুপ করে রইল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, তুই ফ্রিজ খুলে গোগ্রাসে এসব গিলছিলি? তুই কি রাতে লোকের বাড়িতে ঢুকে খাবার চুরি করিস নাকি?

নিমাই বলল, দু'দিন কিছু খাইনি তো। খুব খিদে লেগেছিল এজ্ঞে। ফিরিজটাকে আলমারি মনে করেছিলাম। তা খুলেই দেখি কত খাবার! তাই বসে বসে খাচ্ছিলাম, এজ্ঞে।

সিদ্ধেশ্বর ওকে ভেঙিয়ে বলেন, খাচ্ছিলাম এজ্ঞে! খেয়ে নিয়ে তারপর চুরি করতিস, না? তা বাবা, তুই কিন্তু চোর হিসেবে খুব একটা পাকা নোস।

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, এজ্ঞে ঠিকই বলেছেন বাবু। আমি লোকের বাড়িতে চুরি করি না। আমার কাজ হাত সাফাই। আমি পকেট মারতাম আগে। তা মাস তিনেক আগে ধরা পড়ে বেজায় পিটুনি খেয়েছি। এই তো সবে জেল থেকে বেরুলাম। ভাবলাম, ক'দিন তাহলে চুরিই করি। পেট চলে যাবে।

সিদ্ধেশ্বর একদৃষ্টে নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে ওর কথা শুনছিলেন। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল তাঁর। বললেন, হ্যাঁ রে, তুই সেই বহরমপুর জেলেতে মাস তিন-চার ছিলি না? নিমাই হেসে মাথা চুলকাল। সিদ্ধেশ্বর বলেন, দাঁড়া, দাঁড়া, মনে পড়েছে আমার। তুই জেলেতে থাকতে একবার আমার পকেট থেকেই মানিব্যাগটা মেরে দিয়েছিলি না? এই, আমাকে চিনতে পারছিস?

নিমাই অমায়িকভাবে হেসে বলে, এজ্ঞে, চিনেছি বাবু। আমি আসলে বুঝতে পারিনি এটা আপনার বাড়ি। জানলে আমি ঢুকতাম না। মা কালীর দিব্যি বলছি।

নিমাই দু'হাতে কান ধরে, জিব কেটে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করল। সিদ্ধেশ্বর হাসলেন ওর ভঙ্গি দেখে। বললেন, তুই তো বহরমপুরে ছিলি? এখানে এলি কি করে?

নিমাই বলল, এজ্ঞে, এখন তো এখানেই থাকি।

সিদ্ধেশ্বরের মেমারি খুব শার্প। এই বয়সেও। সিদ্ধেশ্বর বললেন, কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে, তোর নামে আজিমগঞ্জ না কোথা থেকে মাঝে মাঝে চিঠি আসত। তোর বৌই লিখত বোধহয়।

নিমাই বলল, হ্যাঁ বাবু, আজিমগঞ্জেই বাড়ি ছিল আমার। আপনার দেখি সব মনে আছে? কিন্তু সে বাড়ি তো বাবু পদ্মা নদীর পেটে চলে গেছে। এখন বউ, ছেলে-পুলে নিয়ে উল্টোডাঙা স্টেশানের পাশের ঝুপড়িতে থাকি।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, তুই জেলে ছিলিস বলছিলি না? তোর বউ-ছেলের চলত কি করে তখন?

মজিলপুর কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়। মজিলপুরের বোসপুকুরপাড়ায় থাকে তিন সত্যসন্ধানী— শান্ত, মোটু ও শেলী। মজিলপুরে কোন বড় ধরনের চুরি ডাকাতি হলে ওরা তদন্তে নামবে ভাবে। কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছে না।

সেদিন রাতে গগনবাবুর লাইব্রেরীঘরে আগুন লাগল। ত্রয়ী সত্যসন্ধানী ছুটল আগুন দেখতে। পুলিশ বটেশ্বর খুব মাতব্বরি করছিল। ত্রয়ী এবার নামল আগুন লাগার কারণ সন্ধানে।

সেই অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী—

পোড়াবাড়ির রহস্য

অনিল ভৌমিক

এই তিন সত্যসন্ধানীর আর একটি অভিযান

একটি ঘরের রহস্য ২৫

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

নিমাই বলল, এজ্ঞে, চলত না তো বাবু। বৌটা লোকের বাড়ি কাজ করতো। তা সে কাজও চলে গিয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, কেন? কাজ চলে গেল কেন?

নিমাই ফিক করে হাসল, তা বাবু, চোরের বউরে কে আর কাজে রাখবে বলেন?

সিদ্ধেশ্বরের রাগ চড়ে যায় মাথাতে। বলেন, অত যদি বুঝিস তো চুরি করিস কেন রে হতভাগা? অন্য কোনো কাজকম্ম করতে পারিস না?

নিমাই মিনমিন করে বলে, কাজ আর কে আমারে দেবে বলেন?

সিদ্ধেশ্বর কি চিন্তা করেন মনে মনে। বাইরে পাখির ডাক শোনা যায়। সিদ্ধেশ্বর ঘড়িতে দেখেন পাঁচটা বাজে। তখনও কিন্তু বাইরে বেশ অন্ধকার। চারদিকে ঘন কুয়াশার আবরণ, রয়েছে একটা। সোয়েটার আর মাফলারে শরীর ঢেকে সিদ্ধেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে নিমাইও। সোজা চলে আসেন বাগানে।

বাগানে নানা গাছ-গাছালি। পেয়ারা, নারকেল, সজনে, লেবু, লঙ্কা। সিদ্ধেশ্বর সবজি চাষ করেছেন অনেকটা জায়গা জুড়ে। কপি, পালং, কড়াইশুঁটি, টমেটো, লাল মুলো। বাগানের পাশে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের একটা ঘরে জড়ো করে রাখা আছে বিভিন্ন রকমের সার আর শাবল, কোদাল, নিড়ানি ইত্যাদি সরঞ্জাম। সুপার ফসফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, মিউরেট অফ পটাশ, ইউরিয়া ছাড়াও রয়েছে পলিথিনের প্যাকে বিভিন্ন রকমের বীজ। নিমাই এসব দেখে। প্রশ্ন করে, এগুলো সব কি?

সিদ্ধেশ্বর বলেন, এগুলো হলো সার। শরীরকে ভালো রাখতে যেমন ভিটামিন লাগে, গাছেদের জন্য তেমনি লাগে সার। এতে ফলন বাড়ে, পোকার হাত থেকে গাছ রক্ষা পায়।

সিদ্ধেশ্বর বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখান নিমাইকে। তারপর কুয়োর সামনে এসে দাঁড়ান। বাগানের মাঝখানে একটা গভীর ইঁদারা মতো রয়েছে। সিদ্ধেশ্বর বলেন, এই যে কুয়ো দেখছিস, এরমধ্যে টুলু পাম্প ফিট করা আছে। ঐ পাম্প দিয়ে জল তুলে একটা বড় চৌবাচ্চায় রাখা হয়। তারপর সেখান থেকে পাইপে করে গাছে গাছে দেওয়া হয়।

নিমাই মৌন হয়ে সব লক্ষ্য করে চলেছে। হঠাৎ বলল, আমারে এসব দেখাচ্ছেন কেন বাবু?

সিদ্ধেশ্বর বলেন, তুই কাজের কথা বলছিলি না? আমার এখানেই কাজে লেগে যেতে পারিস ইচ্ছে থাকলে। তোর মতো ছিচকে চোরকে আমি পাত্তা দিই না। কেন জানিস? সারাজীবনে অর্ধেকের বেশি সময়টা আমার কেটেছে বড় বড় সব চোর-ডাকাতের সঙ্গে। তুই যদি ভদ্রভাবে কাজকম্ম করতে চাস, তবে তোকে আমি একটা সুযোগ দিতাম। এই আর কি।

নিমাই তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী। সিদ্ধেশ্বর বললেন, কাজ করলে ৫০ টাকা রোজ পাবি। যেদিন আসবি না, সেদিন কিন্তু টাকা পাবি না। বুঝেছিস? ও হ্যাঁ, একবেলা খেতে পাবি।

নিমাই যেন হাতে স্বর্গ পেল। বলল, এজ্ঞে, আমি কাজ করব।

সিদ্ধেশ্বর ওকে থামিয়ে বলেন, দাঁড়া, আগে আমার শর্ত দুটো শোন। ও দুটো মানলে তবেই তোকে কাজে রাখব কিন্তু।

নিমাই তো সব শর্তেই রাজী। বলল, এজ্ঞে, বলেন আপনি।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, আমার প্রথম শর্ত হলো, তুই আমার বাড়ির মধ্যে কখনও ঢুকবি না। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে থাকবি। ওখানে শোবার জন্য খাট রয়েছে। দুপুরে চাইলে বিশ্রাম করতে পারিস। বাথরুম রয়েছে। দরকার হলে ব্যবহার করতে পারিস। আমার কাজের মেয়ে ওখানে তোকে খাবার দিয়ে আসবে। কি রাজী?

নিমাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, এজ্ঞে রাজী। বাড়ির মধ্যে ঢুকব না আমি।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, আমার দ্বিতীয় শর্ত হলো, যদি কখনও কিছু চুরি করতে দেখি তোকে তো সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দেব একেবারে। তখন আর কোনো অনুনয়-বিনয় চলবে না কিন্তু।

নিমাই নাক-কান মুলল। বলল, কি যে বলেন বাবু? আর চুরি করি? কোনোদিন করব না আর।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, তাহলে আর কি? কাল থেকেই কাজে লেগে পড় তুই। আমার একটা কাজের লোক ছিল, বৃন্দাবন। তা সে তো অর্ধেক দিন আসেই না। ওইরকম লোক দিয়ে আমার চলবে না। কামাই করলে তোকেও ছাড়িয়ে দেব, বলে রাখলাম।

নিমাই বহাল হয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর নিমাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ শেখাতে লাগলেন। গরুর কাজ, বাগানের কাজ। গাছে জল দেবার পদ্ধতি, সার দেওয়ার নিয়মকানুন। নিমাইয়ের মাথা বেশ পরিষ্কার। শেখবারও বেশ আগ্রহ রয়েছে। সিদ্ধেশ্বরের কাছে উৎসাহ নিয়েই কাজ করতে লাগল নিমাই।

বাগানে সবজি হয় অনেক, প্রচুর পরিমাণে দুধও প্রতিদিন। নিমাইয়ের কৌতূহল হয়। বলে, বাবু, এত সব জিনিস দিয়ে আপনি কি করেন? এত দুধ কে খায়?

সিদ্ধেশ্বর মাথা নেড়ে বেশ রহস্য করে দুলে দুলে হাসেন। তারপর বলেন, সত্যিই তো কোথায় যায় এসব বল তো? খুবই চিন্তার কথা? আচ্ছা, শোন তাহলে। এখান থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে মিশনের একটা অনাথ-আশ্রম আছে। অনেক ছোটো ছোটো বাচ্চারা ওখানে থাকে। এইসব জিনিস ওখানেই যায়। এবার বুঝেছিস? ভোরে দুধ আর সবজি নিয়ে লোক যায় ওখানে। তুই এখানে আসবার আগেই লোক চলে যায়।

নিমাই বলে, বুঝেছি। সবই বিনি পয়সায়, না?

সিদ্ধেশ্বর হা হা করে হেসে ওঠেন গলা খুলে। তারপর বলেন, পয়সা? পয়সা দিয়ে আমি কি করব? আমার নিজের যা আছে তা আমার একার পক্ষে যথেষ্ট। হেসে খেলে চলে যাবে। ওই ছেলেরা সব এই জিনিস খায়, এতেই আমার আনন্দ। বুঝলি কিছু? তুই এসব বুঝবি না রে।

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, এজ্ঞে, বুঝেছি।

নিমাই রোজই আসে। কামাই করে না। নিমাইয়ের সঙ্গে বাগান করতে লাগলেন সিদ্ধেশ্বর। সারাদিন ওর সঙ্গে বকবক করেন। সিদ্ধেশ্বর নানারকমের কথা আলোচনা করেন। নিমাই কেবল শ্রোতার ভূমিকায় থাকে। তবে কাজকম্ম সব ঠিকঠাক করে যায়। কাজে লেগে অবধি কখনও ওর কোনো বেচাল চোখে পড়েনি সিদ্ধেশ্বরের।

এভাবেই বছর তিনেক কেটে গেল। নিমাই এখন আর রোজ বাড়ি যায় না। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে থেকে যায় প্রায়ই। বৈশাখ মাসের শেষের দিকে সেই ঘটনাটা ঘটল। একদিন ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল সিদ্ধেশ্বরের। তারপর যা দেখলেন, তাতে তো তাঁর চক্ষুস্থির একেবারে। আলমারি খোলা, ঘরের দরজাও তাই। কী ব্যাপার? সিদ্ধেশ্বর আলমারির ভেতরে উঁকি মারেন। নাহ কিছুই নেই। গয়না, টাকা-পয়সা, জামা-কাপড় সবই উধাও!

সিদ্ধেশ্বর মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দেন। ইস, মরতে চোরকে কাজে রেখেছিলাম। নিমাই সব চুরি করে ভেগেছে নির্ঘাৎ। স্বভাব

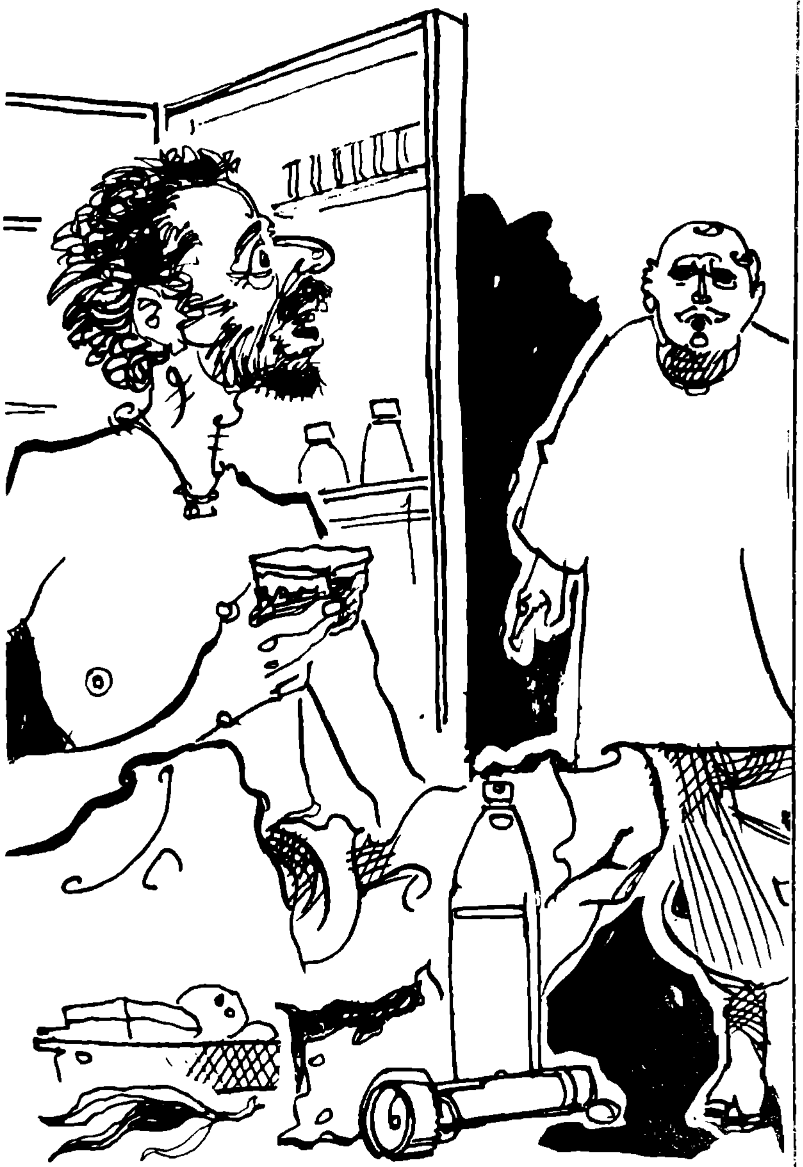

লোকটা গোগ্রাসে ওসব গিলছিল এতক্ষণ।

আর যাবে কোথায়। সিদ্ধেশ্বর বাগানে গিয়ে দেখেন যে, নিমাই নেই। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারেও নেই। সিদ্ধেশ্বর ভাবেন, না, আজ নিমাইয়ের নামে থানায় রিপোর্ট লেখাতেই হচ্ছে। এরপর সিদ্ধেশ্বর থানায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে যান। কিন্তু বাইরের গেটে হাত রাখতেই দেখেন, বাড়ির বারান্দায় বালিশ পেতে শুয়ে আছে নিমাই। অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

সিদ্ধেশ্বর চিৎকার করে ডাকেন, এই নিমে ওঠ শিগগির..। কয়েকবার ডাকাডাকির পর নিমাই ধড়মড় করে উঠে বসে। সিদ্ধেশ্বর বলেন, এই তুই এখানে কি করছিস?

নিমাই বলে, এজ্ঞে, পাহারা দিচ্ছিলাম।

সিদ্ধেশ্বর ব্যঙ্গ করে বলেন, পাহারা দিচ্ছিলি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে? তোকে না বাড়ির ভেতরে ঢুকতে আমি নিষেধ করে দিয়েছি? ওখানে গেলি কি করে তুই?

নিমাই করুণভাবে বলল, এজ্ঞে, কাল রাতে চোর সিঁধিয়েছিল আপনার ঘরে। আমি আমার ঘর থেকে ওরে পষ্ট দেখলাম। ওর হাতে ভোজালি ছিল। তাই আর কাছে যেতে সাহস হয়নি। কিন্তু যেই বাছাধন গেট খুলে বেরুতে গেছে অমনি ওর ব্যাগ থেকে পুঁটলিটা হাত সাফাই করে নিয়েছি। লোকটা অন্ধকারে আমারে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি।

সিদ্ধেশ্বর অবাক। বলেন, পুঁটলি? কিসের পুঁটলি?

নিমাই হেসে বলে, এজ্ঞে, ওই যে আমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, ঐ ব্যাটা সব গয়নাগাঁটি আর টাকাকড়ি একটা কাপড়ে রেখে, পুঁটলি বাঁধছে।

নিমাই এবার ওর বালিশের তলা থেকে পুঁটলিটা বের করে সিদ্ধেশ্বরের হাতে দেয়। সিদ্ধেশ্বর পুঁটলিটা খুলে দেখেন, গয়নাগাঁটি আর টাকাপয়সা সব ঠিকই আছে। সিদ্ধেশ্বর বলেন, কিন্তু তুই তো আমার দুটো শর্তই ভেঙেছিস?

নিমাইয়ের মুখ কাঁচুমাচু। বলে, এজ্ঞে?

সিদ্ধেশ্বর বলেন, প্রথমত, বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিস তুই। দ্বিতীয়ত, আবার চুরি করেছিস।

নিমাই আমতা আমতা করে বলে, একে কি চুরি করা বলে বাবু?

সিদ্ধেশ্বর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলেন, নিশ্চয়ই বলে।

নিমাই বলে, কিন্তু বাবু, ওগুলোন তো আমাদের নিজেদের দব্য এজ্ঞে। এটাও কি চুরি?

সিদ্ধেশ্বর ভাবেন, এগুলো তো সব তাঁরই জিনিস! চোরের কাছ থেকে ফেরৎ নেওয়া হয়েছে কেবল। তাহলে নিমাইকে এখন কি বলা যায়? সিদ্ধেশ্বর মনে মনে চিন্তা করেন।

নিমাই সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে এগোল এবার। সিদ্ধেশ্বর বলেন, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

নিমাই নিরীহভাবে বলে, এজ্ঞে, আমার জামা-কাপড়গুলোন নেব।

সিদ্ধেশ্বর হা হা করে হঠাৎ আকাশ কাঁপিয়ে হেসে ওঠেন। তারপর বলেন, থাক, ওগুলো ওখানেই থাক। এবারের মতো তোকে ক্ষমা করে দিলাম, যা। ভবিষ্যতে আর কোনো বেচাল করবি না কিন্তু। সকাল হয়ে গেছে, বাগানের কাজে লেগে পড়।

সিদ্ধেশ্বর নিমাইয়ের সঙ্গে বাগানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন রোজকার মতো। কিন্তু কাজ করতে করতে কেন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান মাঝে-মাঝে। ভাবেন, তাঁর আত্মজীবনীতে একটা পুরো অধ্যায় বোধহয় নিমুর জন্য রাখতে হবে। লোকটা সত্যিই বেশ ইন্টারেস্টিং!

ছবি ঃ অরূপ ব্যানার্জী

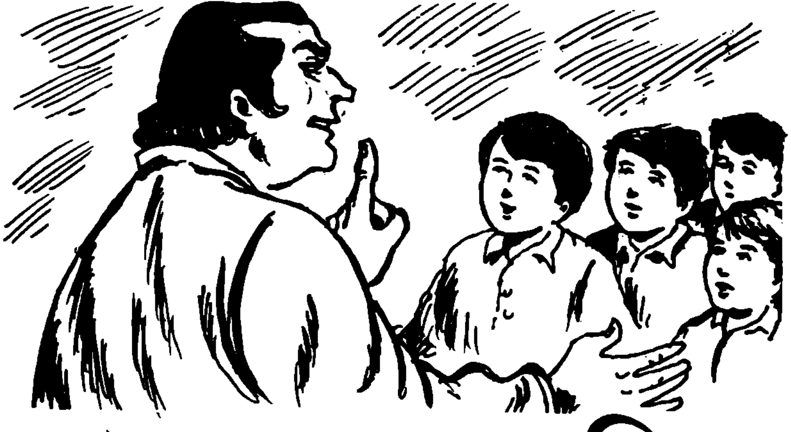

গল্প হলেও সত্যি

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুনিন দ্বীপের গল্পকথক

এই গল্পকথকের নাম হ্যানস। তার বাড়ি ছিল ফুনিন দ্বীপের এক ছোট্ট শহরে। শহরটির নাম ওডেন্স। হ্যানসরা ছিল খুব গরীব। তার বাবা জুতো তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন। জুতো বিক্রির আয় থেকেই চলত তাদের সংসার। হ্যানসের যখন আট বছর বয়স তার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। সংসার অচল হয়ে উঠল। দিন আর চলে না। হ্যানসের মা মেরী সংসারের অবস্থা দেখে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। কিন্তু তাতেও অভাবের কোনো সুরাহা হলো না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তখন তিনি প্রতিবেশীদের বাড়িতে কাপড় কাচার কাজ নিলেন। খুব কষ্টে দিন কাটাতে হতো হ্যানসদের। অভাব-অনটনের মধ্যেও পয়সা বাঁচিয়ে মেরী হ্যানসকে ওডেন্সের এক অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিছুদিন হ্যানস সেখানে গিয়েছিল কিন্তু পঠন-পাঠন করতে পারেনি। কারণ হ্যানস দেখতে ছিল খুব কুৎসিত। একে গরীব তায় কুৎসিত। সব মিলিয়ে হ্যানসের ভাগ্যদেবী যেন তার ওপর খুবই অপ্রসন্ন।

হ্যানস কল্পনা করতে—স্বপ্ন দেখতে খুব ভালবাসে। ছোটবেলায় রোজ তার ঠাকুমার কাছে নানা রূপকথার গল্প শুনত। ঠাকুমা মারা গেলে হ্যানসের বাবা তাকে নানা দেশের রূপকথার গল্প শোনাতেন। এভাবে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে তার মন সর্বদাই রূপকথার রাজ্যে ঘুরে বেড়াত। বয়স আস্তে আস্তে বাড়লেও সেই অভ্যাসের মায়াজাল থেকে হ্যানস বেরিয়ে আসতে পারেনি। তার বাবা জুতো তৈরির অবসর সময় হরেক রকম পুতুল বানাতেন। সেগুলো বিক্রি করেও কিছু আয় হতো। ছোটবেলায় হ্যানস অন্যান্য ছেলেদের মতো খেলাধূলা না করে ঘরের পুতুলগুলোকে রূপকথার নায়ক-নায়িকা সাজিয়ে অভিনয় করে সময় কাটাত।

ওডেন্স শহরে জিপসিদের যাত্রা ছিল খুব জনপ্রিয়। তারা ঝলমলে পোশাক পরে গাঁয়ে-গঞ্জে অভিনয় করত। হ্যানস খুব উৎসাহ নিয়ে সেই সমস্ত যাত্রাপালা শুনত। যাত্রা শুনতে শুনতে তার মনে হতো সেও বড় হয়ে এমন দক্ষ অভিনেতা হবে। আরও একটু বয়স বাড়লে সে ভাবতে শুরু করল, শুধু অভিনেতাই নয় সে যাত্রাপালাও রচনা করবে। সে হবে নাট্যকার। লোকে তাকে বলবে ডেনমার্কের শেক্সপীয়ার।

যতই দিন যেতে থাকে হ্যানসের মনে ঐ কল্পনা ততই শাখা-প্রশাখা মেলে পল্লবিত হয়। কল্পনার রাজ্যে ভাসতে ভাসতে একদিন মাকে না জানিয়ে হ্যানস ওডেন্স ছেড়ে পাড়ি দিল রাজধানী শহর কোপেনহেগেনের দিকে। তাদের বাড়ি থেকে কোপেনহেগেনের পথ অনেকটা। তখন হ্যানসের বয়স চোদ্দ। হাতে একটা কানাকড়িও নেই। অগত্যা হ্যানসকে হাঁটাপথেই যেতে হলো। প্রায় দু'দিন লাগল তার কোপেনহেগেন পৌছাতে।

কোপেনহেগেনে সেসময় রয়্যাল সোসাইটির খুব নামডাক। তাদের অভিনয়ের খ্যাতি সারা শহরময়। নাটকে একটা ছোটখাট অভিনয়ের সুযোগের প্রত্যাশায় হ্যানস দেখা করল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। কর্তৃপক্ষ হ্যানসকে দেখে বিদ্রূপই করলেন। হ্যানস প্রত্যাখ্যাত হলো, কিন্তু দমল না এতটুকু। এরপর সে গেল রয়্যাল আকাডেমির মিউজিক কনট্রাক্টরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনিও তার চেহারার অজুহাত দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। সবদিক থেকে হ্যানস ব্যর্থ হলো। অথচ থাকা ও খাওয়ার অর্থ সংগ্রহ করতেই হবে।

নিরুপায় হ্যানস তার বাবা ও ঠাকুমাকে স্মরণ করে ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেদের নানা রূপকথার গল্প বলতে শুরু করল। গল্প বলার মাঝে মাঝে সে ঘটনার অংশবিশেষ অভিনয় করে দেখায়। শিশুরা মুগ্ধ হয় তার গল্পকথায়। এর ফলে তার কিছু আয় হতে লাগল। সে এই ব্যবসাটা জাঁকিয়ে করতে শুরু করল।

লোকের কানে ভাসতে ভাসতে হ্যানসের গুণের কথা একদিন ডেনমার্কের রাজকুমারীর কানে পৌঁছল। তিনি হ্যানসকে ডেকে পাঠালেন। হ্যানসের গল্প বলার ধরন ও অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলেন রাজকুমারী। তাকে পুরস্কৃত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হ্যানসকে অনুরোধ জানালেন আরো গল্প ও নাটক লিখতে। হ্যানসও ভীষণ উৎসাহে রূপকথার গল্প ও নাটক লিখতে আরম্ভ করল। রাজকুমারীর সুপারিশে হ্যানসের নাটক রয়েল সোসাইটিতে অভিনীত হলো। রয়েল সোসাইটির সহায়তায় হ্যানস লেখাপড়া শুরু করল, সেই সঙ্গে সাহিত্যচর্চা। একে একে প্রকাশ পেতে লাগল তার লেখা গল্প, নাটক, উপন্যাস। পৃথিবী আবিষ্কার করল এক রূপকথার গল্পকারকে। হ্যানস তার সাফল্যের সংবাদ জানাতে যখন ওডেন্সে ছুটে এসেছিল তখন তার মা মেরী আর ইহজগতে নেই। এই হ্যানস হলেন সাহিত্যিক হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন।

তথ্যসূত্র : নির্বাচিত জীবনী সমগ্র : পৃঃ ১১২-১১৫

ছবি : জুরান নাথ

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এল বান.....

তা বান আসার সময়ই বটে এখন। গোটা আকাশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কালো কালো জলভরা মেঘের দল। কখনো ঝিমঝিম, কখনো ঝমঝম, আবার কখনো টাপুর-টুপুর। তারই মাঝে হঠাৎ হঠাৎ এসে যায় এক একটা রোদ-ঝলমলে দিন। ঘামে নাইতে নাইতে তখন মনে হয় এর চেয়ে বৃষ্টিভেজা দিনই ভালো। বৃষ্টিতে চান-টান করে গাছ-গাছালি, লতা-পাতা, ঝোপ-ঝাড় সব এখন সবুজে সবুজ। যতদুর চোখ যায়, দেখা যাবে সবুজের সমারোহ। সেই সবুজের রাজ্যে আলো করে ফুটে আছে নানা রঙের দোপাটি। ফুটছে জিনিয়া, রজনীগন্ধা ফুলের ভারে নুইয়ে পড়ছে, হাসনুহানার গন্ধে চারদিক ম ম করে। জুঁই-কামিনীর গন্ধ তার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। বকুল ফুল আলপনা এঁকে রাখে গাছতলায়। প্রথম কদম ফুল ফুটেছে সেই আষাঢ় মাসে। অনেক গাছে এখনো ফুটছে। এরই মধ্যে এসে যাবে ঝুলন। বেশ লাগে তাই না? শুধু ঐ ভ্যাপসা গরমটুকু ছাড়া।

যদি কোনোদিন সন্ধ্যের পর আকাশ পরিষ্কার পাও তাহলে মাঝ আকাশে দেখতে পাবে শ্রবণা নক্ষত্রকে। এ মাসের নাম এসেছে ঐ নক্ষত্র থেকে। ওদিকে মকর রাশি উঁকি মারছে পুব আকাশে। পশ্চিম আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে কর্কট আর মিথুন রাশি। ছায়াপথ চলে এসেছে আকাশের মাঝামাঝি। আজকাল সূর্যদেবের ঘুম ভেঙে যায় ৫টা বেজে ৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে আর অস্ত যায় ৬টা ২১ মিনিট ৭ সেকেন্ডে। উত্তর গোলার্ধে এখনো রাতের চেয়ে দিন বড়। এ সব খেয়াল করছো তো? নাকি শুধু কোন রাস্তায় কতটা জল জমল কিংবা কবে ভিজে ভিজে স্কুলে গেলে বা ফুটবল খেললে তাই নিয়েই মেতে আছো! বিশ্বকাপের খেলা তো শেষ হয়ে গেছে। ফুটবল জ্বর ছেড়ে গেলেও তার জের এখনো কাটেনি, তাই না। এখনো জিদান, রোনাল্ডো, রিভাল্ডো, ফিগো, বেকহ্যাম, ক্লিনসম্যানরা তোমাদের মন জুড়ে আছে। চোখ বুজলে তাদের খেলা দেখতে পাও। তাই দেখো, সেই ফাঁকে আমি বরং তোমাদের চিঠির ঝাঁপি খুলে বসি।

অনুপমা দে চাকলাদার (প্রযত্নে—অরুণ দে চাকলাদার, এম. ই. এস. এ ৪ ই বি আর (III)), কোয়ার্টার নং-১১৮/এ, বিবেকানন্দ স্ট্রিট, কোচবিহার-৭৩৬ ১০১)

উত্তর ঃ তুমি একেবারে একলা কী করে শুনি। তোমার একজন দাদুমণি আছে, শুকতারার বন্ধুরা আছে আর তুমি বলছ কিনা একা। দেখো শুকতারার বন্ধুরা তোমায় ঠিক চিঠি দেবে। তুমিও দিও।

শুভ্রাংশু বাগ (প্রযত্নে—বিমান বিহারী বাগ, গ্রাম-গড়কমলপুর, পোঃ-মহিষাপুর, মেদিনীপুর)

উত্তর ঃ অনীশ দেবের 'দুখী রাজকুমার' ভীষণ ভালো লেগেছে। আরতি বসুর 'ভারতেই কি ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা', নান্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রূপকথার দেশ ভুটান' ভালো লেগেছে জেনে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে। কুপন কাটতে যাতে অসুবিধে না হয় তা আমরা দেখবো। তুমি নিশ্চয় লেখা পাঠাতে পারো। অংশ নিতে পারো প্রতিযোগিতায়।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী (গ্রাম-তামালতলা, পোঃ-আজিমগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ-৭৪২ ১২২)

উত্তর ঃ তোমার এক কাকা হঠাৎ মারা গেছেন জেনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। মন খারাপ, কষ্ট তো হবেই। মেনে নেওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। ভালো বই পড়ো, মন ভালো হয়ে যাবে। শুকতারার বন্ধুরা তোমায় নিশ্চয়ই চিঠি দেবে।

সুমন রাহা (প্রযত্নে—সুকেশ রাহা, পোঃ-রায়গঞ্জ, গ্রাম-কলেজপাড়া, উত্তর দিনাজপুর)

উত্তর ঃ শুকতারা নিশ্চয়ই তোমার প্রিয় বন্ধু। শুকতারার বন্ধুরাও তো আছে। ওদের চিঠি দাও। দেখবে ওরাও তোমাকে চিঠি লিখবে। দাদুমণি তো দাদুমণি। আলাদা আবার নাম হয় নাকি?

মীনাক্ষী সিনহা (১০, নাগেরবাজার রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০ ০৭৪)

উত্তর ঃ বিশ্বাস হলো তো তোমার চিঠি পড়েছি। তোমার নববর্ষের ওপর লেখা চার লাইনের ছড়াটা খুব ভালো হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হালখাতার খাওয়া-দাওয়া' ভালো লেগেছে জেনে খুশি হয়েছি।

অভিনন্দিতা সরকার (প্রযত্নে—বিমল কুমার সরকার, গ্রাম-জয়নগর মতিলালপাড়া, পোঃ-জয়নগর মজিলপুর, দঃ ২৪ পরগনা)

উত্তর ঃ তোমাদের পাতার জন্যে তোমার আঁকা ছবি নিশ্চয়ই পাঠাতে পারো। একটু ভালো কাগজে সাদা-কালোয় আঁকা ছবি পাঠিয়ো। পেনসিলে এঁকো না। ছাপা ভালো হয় না। শুকতারার বন্ধুদের তোমার ভালোবাসা জানিয়ে দেওয়া হলো।

অমিয় কুমার সেন (গ্রাম-হাতিয়াড়ী, পোঃ-বলাগেড়িয়া, থানা-মারিশদা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১ ৪২২)

উত্তর ঃ তুমি তো শুকতারার বন্ধুই। শুকতারা যারা নিয়মিত পড়ে তারাই শুকতারার বন্ধু। চিঠি দাও না শুকতারার অন্য বন্ধুদের।

সাবির আমেদ (প্রযত্নে—কাওসর আমেদ, গ্রাম-আটঘরা, পোঃ-হারোয়া, উঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩ ৪২৫)

উত্তর ঃ পরীক্ষার রেজাল্ট তো বেরিয়ে গেছে। কেমন হলো? দেখছো তো তোমার দাদুমণি আছে। দাদুর স্নেহ, ভালোবাসা দাদুমণির কাছ থেকেই পাবে। পরীক্ষার ফল জানাতে ভুলে যেও না যেন।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

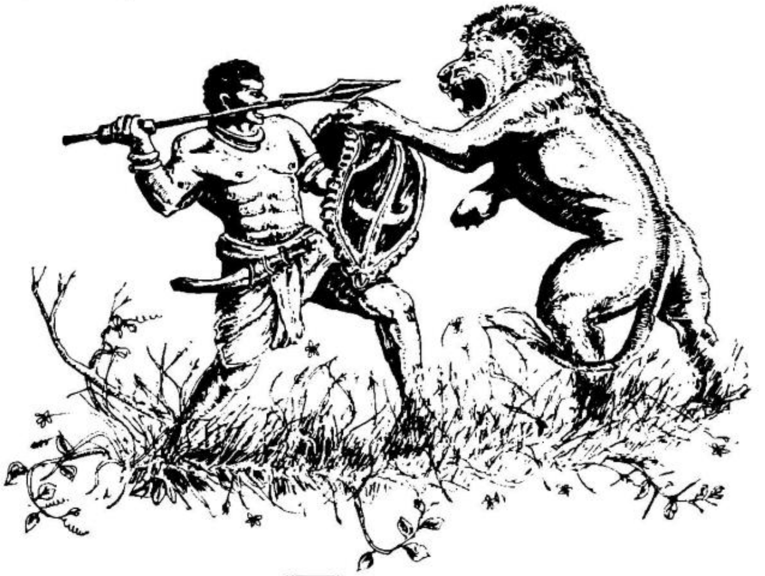

রাজদীপ হাজরা, বয়স পনেরো, একাদশ শ্রেণী, কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বর্ধমান

'শুকতারা' তুমি

বহু দুর্গম পথ পার হয়ে তুমি
আজ পঞ্চান্ন বর্ষ
বেদনার পথে জাগিয়েছ আশা
এক সীমাহীন হর্ষ।
সব ভেদাভেদ ভুলিয়েছ তুমি
তোমার জয়ের পথে

পথভোলা কত পথিক চড়েছে,
তোমার স্বর্ণরথে!
অবোলা যে জন পায়নি কখনো
সৃষ্টিশীলের ভাষা
কল্পলোকের হাতছানি দিয়ে,
যুগিয়েছ মনে আশা।
ভালোবাসাহীন সমাজ যখনই
দেখেছে দু'চোখে ধাঁধা
গোলকধাঁধার পথটি পেরিয়ে,
দূর করেছ যত বাধা!
সব ভীতি-ভয় দূরে ছুঁড়ে ফেলে
শুধুই করেছ সৃষ্টি
তোমার পরশে প্রাণ ফিরে পেল,
দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি।
'শুকতারা' তুমি এগিয়েই চলো
স্বর্গ সুখের হাসি
তোমাকে হারাতে চাই না তো মোরা
তোমাকেই ভালোবাসি!!

কমলেশ কুমার,
বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, বর্ধমান

জীবনযুদ্ধে জিততে গেলে

জীবনযুদ্ধে জিততে গেলে
চাই আত্মবিশ্বাস,
আর চাই সুস্থ সবল
দৃঢ় মনের আশ্বাস।
এ ছাড়াও দরকার হবে
কঠিন পরিশ্রম,
দূরে সরিয়ে রাখতে হবে
মনের নানা ভ্রম।

কল্পনা আর দিবাস্বপ্ন
দিয়ে বিসর্জন,

থাকবে সদা শ্রমের প্রতি
মনের আকর্ষণ।
চলার পথে মানতে হবে
দৃঢ় অধ্যবসায়,
তবেই হবে, হবেই হবে
জীবনযুদ্ধে জয়।

এনাক্ষী চৌধুরী,
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
বিন্দোল উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ),
উত্তর দিনাজপুর

খুকুমণির জেদ

জেদ ধরেছে খুকুমণি
চাঁদটা যে তার চাই,
হাজার লিটার পুড়ুক গে তেল
রকেট হোক না ছাই।
বাবা বলেন, পাবি নাকো—
চাঁদ যে অনেক দূরে,
শুনে খুকি কাঁদতে থাকে
বেদম নাকী সুরে।
রেগে-মেগে বাবা বলেন,
হও না আগে বড়,
তারপরেতে রকেটে চড়ে
—চাঁদকে তুমি ধোরো।।

অয়ন বসু,
বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুল, কলকাতা

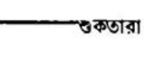

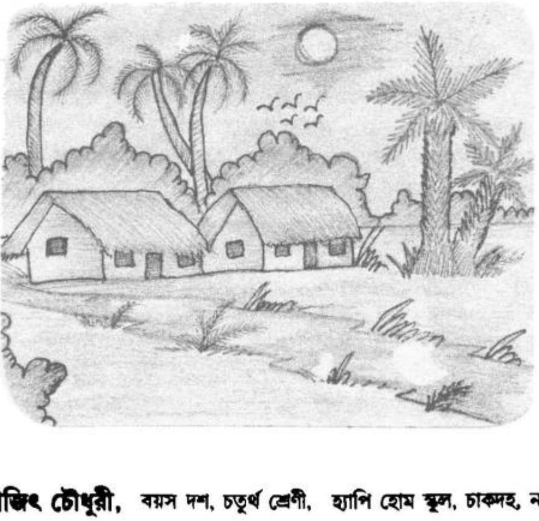

তমোজিৎ চৌধুরী, বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী, হ্যাপি হোম স্কুল, চাকদহ, নদীয়া

ভবিষ্যতে আমরা

আমরা হব নতুন মানুষ
নতুন যুগে থেকে,
নতুন সব ব্যাপার দেখে
নতুন জিনিস শিখে।
থাকব না আর 'ব্যাকডেটেড'
থাকব না আর বাসি,
ফুটবে তখন সবার মুখে

নতুন যুগের হাসি।
পড়াশোনা করবে সবাই
সাইবার ইস্কুলে
'কম্পিউটার' শিখতে যাবো
খেলাধুলো ফেলে।
তখন তো হবে না আর
রান্নার দরকার
গাছই তখন করবে তৈরি
তন্দুরী খাবার।
চড়তে হবে নাকো প্লেনে
যেতে বিদেশে
'Internet'-এ ঘুরব তখন
এদেশে ওদেশে।
তবু আছে চিন্তা
তবুও আছে ভয়
যদি সব দুর্ঘটনা
ঐ সময়-ই হয়?
তখন হয়তো মানব আর
থাকবে না মানব
নতুন যুগের ছোঁয়ায় হবে
'Internet' দানব।
থাকবে না আর আনন্দ
থাকবে নাকো স্বস্তি,
অতি মাত্রায় শিক্ষিতদের
এই কি 'চরম-শাস্তি'?

পার্থ মুখার্জী,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
মেঘমালা রায় এডুকেশন সেন্টার, বেহালা

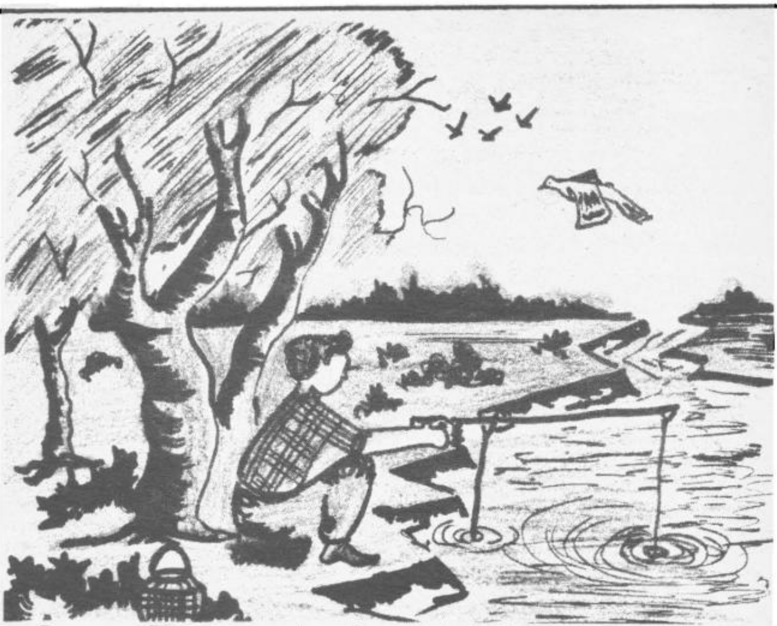

প্রীতম চক্রবর্তী, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, জয়নগর ইনস্টিটিউশন, দঃ ২৪ পরগনা

আজব প্রণাম

আরে আরে। থাক থাক থাক! করছ তুমি একি!
জানলা দিয়ে গলির মোড়ে রোজ তোমাকে দেখি।
তা বলে কি লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করতে আছে?
বয়স আমার নয় যে বেশি, প্রায় একশোর কাছে।
আচ্ছা আচ্ছা, খুব হয়েছে, যাও তো তুমি বাছা,
অতো জোরে দৌড়িও না, আলগা হবে কাছা।
অমন করে ছুট লাগাল। ব্যাপারটা কি তবে?
এই না ভেবে পায়ের দিকে নজর দিলাম যবে,
দেখি চেয়ে জুতোজোড়া ভ্যানিশ হয়ে গেছে!
চুরি করে পালিয়ে সেজন লুকিয়ে কোথায় আছে?
ছি ছি ছি! এই কি তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি করা?
প্রণাম ছলে খসিয়ে নিলে পায়ের জুতো জোড়া!

মধুবন্তী গুপ্ত,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
পাঠভবন, শান্তিনিকেতন

আমার মা

সবার থেকে বাসি ভালো
আমার সোনা মাকে,
সকল কাজের মধ্যে আমি
খুঁজি শুধুই তাঁকে।
সবাই বলে ঠাকুর বড়
আমি বলি, না
সবার থেকে বড় যিনি
তিনি আমার মা।

নমিতা সরকার,
বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
কোন্নগর গার্লস হাই স্কুল

সকালবেলায়

তিড়িং বিড়িং ছাগলছানা
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ চড়াই,
কিচির মিচির শালিখ পাখির
টালির চালে বড়াই।

রামধনু রঙ গায়ে মেখে
প্রজাপতির রঙ্গ,
সবুজ বনের সবুজ টিয়া
দিচ্ছে তারই সঙ্গ।

এসব দেখে সুয্যিমামার
মিষ্টি হাসি ঐ-যে,
মন বসে না পড়াশুনায়
তুলে ফেলি বই-যে।

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়,
বয়স কুড়ি, দ্বিতীয় বর্ষ,
কালনা কলেজ, বর্ধমান

বিষয়—টেলিভিশন ও আমরা ঃ বারাসত প্যারীচরণ সরকার রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়

আমরা বলছি

[*বিদ্যালয়-পরিচিতি ঃ বারাসত প্যারীচরণ সরকার রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে। বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 'আর্নল্ড অব দি ইস্ট' নামে পরিচিত প্যারীচরণ সরকার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘ প্রায় দেড়শত বছর ধরে বিদ্যালয়টি উত্তর ২৪ পরগনার এক বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র রূপে পরিচিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এর ধারাবাহিক সাফল্য অব্যাহত। বিদ্যালয়ের বহু প্রাক্তন ছাত্র পরবর্তীকালে সমাজকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। পূর্বনাম বারাসত রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়। প্রথম প্রধান শিক্ষকের নামানুসারে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করা হয় ১৯৯৭ সালে।*]

প্রথম

বিংশ শতাব্দীতে দূরসম্প্রচার তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার জগতে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো টেলিভিশন বা দূরদর্শনের আবিষ্কার। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশবিদেশের খবর শোনার জন্য মানুষ নির্ভর করতেন বেতারের উপর। দূরদর্শন এবার শব্দের সঙ্গে যোগ করল দৃশ্যের ব্যঞ্জনা। সত্তরের দশকে ভারতে টেলিভিশনের আবির্ভাব ঘটে। তারপর সবই ইতিহাস। এই ত্রিশ বছরে ভারতীয়দের কাছে দূরদর্শন হয়ে উঠেছে বিনোদনের প্রধানতম উপাদান। নব্বইয়ের দশকে ঘরে ঘরে উপগ্রহ চ্যানেলগুলির আগমনে জনপ্রিয়তার মাত্রা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান সমাজে দূরদর্শনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ভীষণই গভীর। যখনই আমরা মানসিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখনই আমাদের হাত খুঁজে নেয় পরিচিত রিমোট আর বোতাম টিপে আমরা হারিয়ে যাই ঐ ছোট্ট চৌকো বাক্সের ভিতরের কাল্পনিক জগৎটাতে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, রোজকার জীবনে যে হতাশা আর অপ্রাপ্তিগুলো আমাদের পীড়া দেয় সেগুলো ঐ কল্পনার জগতে আমাদের তাড়া করে না। ছোটপর্দায় ঐ না-পাওয়াগুলো প্রাপ্তিতে পরিবর্তিত হয়। তবে দূরদর্শন শুধুই বিনোদনের মাধ্যম নয়—বিভিন্ন জ্ঞানবিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের সমাজ, জীবন, ইতিহাস, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে এতটাই স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারে, যা অন্য কোনো গণমাধ্যম দিতে সক্ষম নয়।

এত গুণ থাকা সত্ত্বেও টেলিভিশনকে অনেকে বলেন 'বোকা বাক্স', অনেকে বলেন 'টেলিভীষণ'—এটা কেন? এর হয়তো একটাই কারণ যে, দূরদর্শন আমাদের মগজকে ভোঁতা করে দেয়। ছোটপর্দা যা আমাদের দেখায়, আমাদের তাই মেনে নিতে হয়, স্বাধীন চিন্তার কোনো সুযোগ সেখানে নেই। আগেকার দিনে শিশুরা রূপকথার গল্প শুনে বা বইয়ে পড়ে মনে মনে কল্পনা করত তেপান্তরের মাঠ, পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাক্ষস-দৈত্য, রাজপুত্র-রাজকন্যা ইত্যাদি সবকিছুই। কিন্তু বর্তমানে ঐ একই গল্প ছোটপর্দায় দেখালে, তা আর ছোটদের কল্পনাকে উসকে দেয় না। কারণ সেখানে চরিত্রগুলিকে যেভাবে দেখানো হয়, সেভাবে শিশুরা দেখতে বাধ্য হয়। কল্পনার পাখা মেলবার সুযোগ সেখানে কোথায়? সেভাবেই, বিভিন্ন কুরুচিকর অনুষ্ঠান কিশোরদের মধ্যে ভ্রান্ত জীবনবোধ গড়ে তোলে যা শেষ পর্যন্ত হিংসা, হত্যা, আত্মহত্যা, দুর্ঘটনাতে গিয়েই শেষ হয়।

তবে কি দূরদর্শনকে বয়কট করা উচিত? কখনোই নয়। বর্তমান গতিময়তার যুগে বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে কখনোই দূরদর্শনকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন সংযম এবং অনুষ্ঠান দেখার বিষয়ে সুরুচিকর নির্বাচনী মনোভাব। অপসংস্কৃতির অজুহাতে কোনো বিশেষ চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং দর্শকের স্বাধীনতা এবং রুচিবোধকেই মেনে নেওয়া উচিত। কারণ বিচারের শেষ বাণী তাঁরাই শোনাবেন।

নির্মাল্য বিশ্বাস

দ্বাদশ শ্রেণী

দ্বিতীয়

মহাভারতের সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। মানুষ আজ বিজ্ঞানের অবদানে দূরের কোনো ঘটনাকে বা তার বাণীকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ ও শ্রবণ করতে পারে। বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অবদানের নাম টেলিভিশন। 'টেলি' একটি গ্রীক শব্দ—এর অর্থ 'দূর' ; 'ভিসিও' একটি ল্যাটিন শব্দ—এর অর্থ 'দৃশ্য'। এই দুই-এর সংমিশ্রণে 'টেলিভিশন' শব্দের উদ্ভব।

১৯২৬ সালে এই বিস্ময়কর যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন জন বেয়ার্ড। ভিডিও, রেডিও ও শ্রুতি কম্পাঙ্কের মিলিত তরঙ্গ-প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ঈথার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা গ্রাহক যন্ত্রের অ্যান্টেনায় প্রতিহত হয়ে বিশ্লিষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন পথে সম্প্রসারিত হলে তার চিত্ররশ্মিগুচ্ছ অতিপ্রভ পর্দায় প্রতিফলিত হয় এবং শব্দতরঙ্গ তার বহুস্বনা যন্ত্রে ধ্বনিত হয়।

টেলিভিশন মানুষের আমোদ-প্রমোদ এবং অবসর বিনোদনের মূল্যবান উপকরণ। বিশ্বের সুদূর প্রান্তের ঘটনার সংবাদ আমরা এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে পারি। আধুনিক শিক্ষার সফলতা সাধনে এবং সম্প্রসারণে দূরদর্শনের ভূমিকা অনবদ্য। এছাড়া কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে টেলিভিশন তার সর্বজনীন আবেদনের দ্বারা নিরক্ষর কৃষক-শ্রমিকদের নৈপুণ্য সম্পাদনে খুবই সহায়ক। জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রেও দূরদর্শনের ভূমিকা আছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই টেলিভিশন মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

টেলিভিশন যে কেবল মানবজাতিকে অগ্রগতির পথেই ঠেলে দিয়েছে তা নয়, এর কিছু কুফলও রয়েছে। বহুক্ষণ একটানা

টেলিভিশন দেখা যেমন চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক তেমনই টেলিভিশনে সম্প্রচারিত বেশ কিছু অনুষ্ঠান অত্যন্ত কুরুচিকর ও ক্ষতিকর। এছাড়া টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের মান, রুচি ও পরিমাণজনিত কারণে টেলিভিশন দেখা আজকের দিনে অত্যন্ত বিরক্তিকর।

এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় যে টেলিভিশনের আবিষ্কার মানবজাতির কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। টেলিভিশন যদি সঠিকভাবে মানুষ ব্যবহার করে তবে তাকে আর 'বোকা বাক্স' আখ্যা দেওয়া যাবে না—অচিরেই সে হয়ে উঠবে মানবসম্প্রদায়ের কাছে 'চালাক বাক্স'।

অনিন্দ্য মৈত্র
দ্বাদশ শ্রেণী

তৃতীয়

'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'—বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে কবির একথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এর দুর্বার গতির সাফল্য মানুষকে আজ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি বোকা বাক্স বর্তমান পৃথিবীতে ফাঁদ পেতেছে—সারা বিশ্বের বার্তাকে এনেছে চোখের সামনে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে টেলিভিশন।

স্কুল-কলেজের গণ্ডিবদ্ধ শিক্ষার বাইরে জনশিক্ষা প্রসারে অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলির মতো টেলিভিশনও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদ এবং নানা রকম বিনোদন ছাড়াও শিক্ষা-উপযোগী নানা অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে টেলিভিশন মানুষ গড়ার কারিগর হয়ে উঠেছে।

দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল বার বার বন্ধঘর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে দূর-দূরান্তে জগৎ দেখার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্তি দিতে। টেলিভিশন যেন নিজেই এক অভিযাত্রী। যারা ইচ্ছে থাকলেও গৃহকোণ ছেড়ে দুনিয়াটাকে দেখতে যেতে পারে না তাদের জন্য টেলিভিশন সমস্ত দুনিয়াটাকেই এনে হাজির করেছে চোখের সামনে।

এই গণমাধ্যমটি নানাভাবে মানবজাতির সেবাও করে চলেছে। বিভিন্ন প্রকার কর্মযজ্ঞের মধ্যে একটি হলো আনন্দদানের সূচী—যার মধ্যে শিল্পচর্চা, নাটক, বিতর্ক, ক্যুইজ, গান, খেলা, ভ্রমণ, চলচ্চিত্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। টেলিভিশন এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেমন আনন্দদান করে, তেমনি জনশিক্ষা বিস্তারেও সাহায্য করে। জনশিক্ষা কথাটিকে কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ও সাক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সংগত নয়। জনশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো মনুষ্যত্বের শিক্ষা, সুনাগরিকত্বের শিক্ষা। সরকারী প্রতিটি যোজনা, উদ্যোগ ও উদ্যমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, কার্যক্রম ও অগ্রগতির সম্বন্ধে সমাজের সকলকে সর্বদা ওয়াকিবহাল রাখা, দেশের কোথাও সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা বা জাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে টেলিভিশনের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে প্রতিকার গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়।

তবে টেলিভিশনের যথেষ্ট কুফলও আছে। আজকাল অহোরাত্র টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে অনুষ্ঠান হয়। তারমধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ এবং ছাত্রদের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে।

অতলান্ত নারায়ণ চৌধুরী
দ্বাদশ শ্রেণী

প্রকাশিত হল

অরূপরতন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার একটি প্রামাণ্য বই

বিজ্ঞান যখন ভাবায় ২৬৫

পরিমার্জিত চারটি নতুন অধ্যায় সম্বলিত সংশোধিত সংস্করণ

লুচি কেন ফোলে? রক্তের রঙ লাল কেন? লাল মরিচ লাল কেন? তেঁতুল কেন বেশী টক? নারকেলের তিনটি মাত্র চোখ কেন? উল্কার কি নিজস্ব আলো আছে? গাছের পাতা ঝরে পড়ে কেন? ছাতার রং কালো কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের ছাতার রঙ সাদা কেন?

এই ধরণের অনেক প্রশ্ন আর কৌতূহলের খোরাক আছে এই বই-এর পাতায় পাতায়। অনেক ছবিতে সমৃদ্ধ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি এক ঐতিহাসক প্রকাশন।

* * *

অরূপরতন ভট্টাচার্য্য ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

স্বাস্থ্য যখন ভাবায় ১০০

খেতে বসে কথা বলা কি খারাপ? হোমিওপ্যাথি ও অ্যালাপ্যাথি ওষুধ কি এক সঙ্গে খাওয়া চলবে? কানে পোকা ঢুকলে কি করবো? বাড়িতে মানিপ্ল্যান্ট থাকলে কি ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে? কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া কি দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর? নিম দাঁতন না টুথব্রাশ কোনটা বেশী উপকারী? চোখে গগলস সারাক্ষণ ব্যবহার করা কি চোখের পক্ষে ক্ষতিকর? দেশী ডিম বা পোলট্রি ডিম কোনটা বেশী উপকারী? একটি নবজাত শিশু বধির কিনা তা কি করে জানা যায়? চুলে মেহেন্দি লাগানো কি উচিৎ?

চিকিৎসা শাস্ত্রের কৌতূহলকর এই ধরণের হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই বইটিতে যাতে কেটে যাবে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংশয় ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা।

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

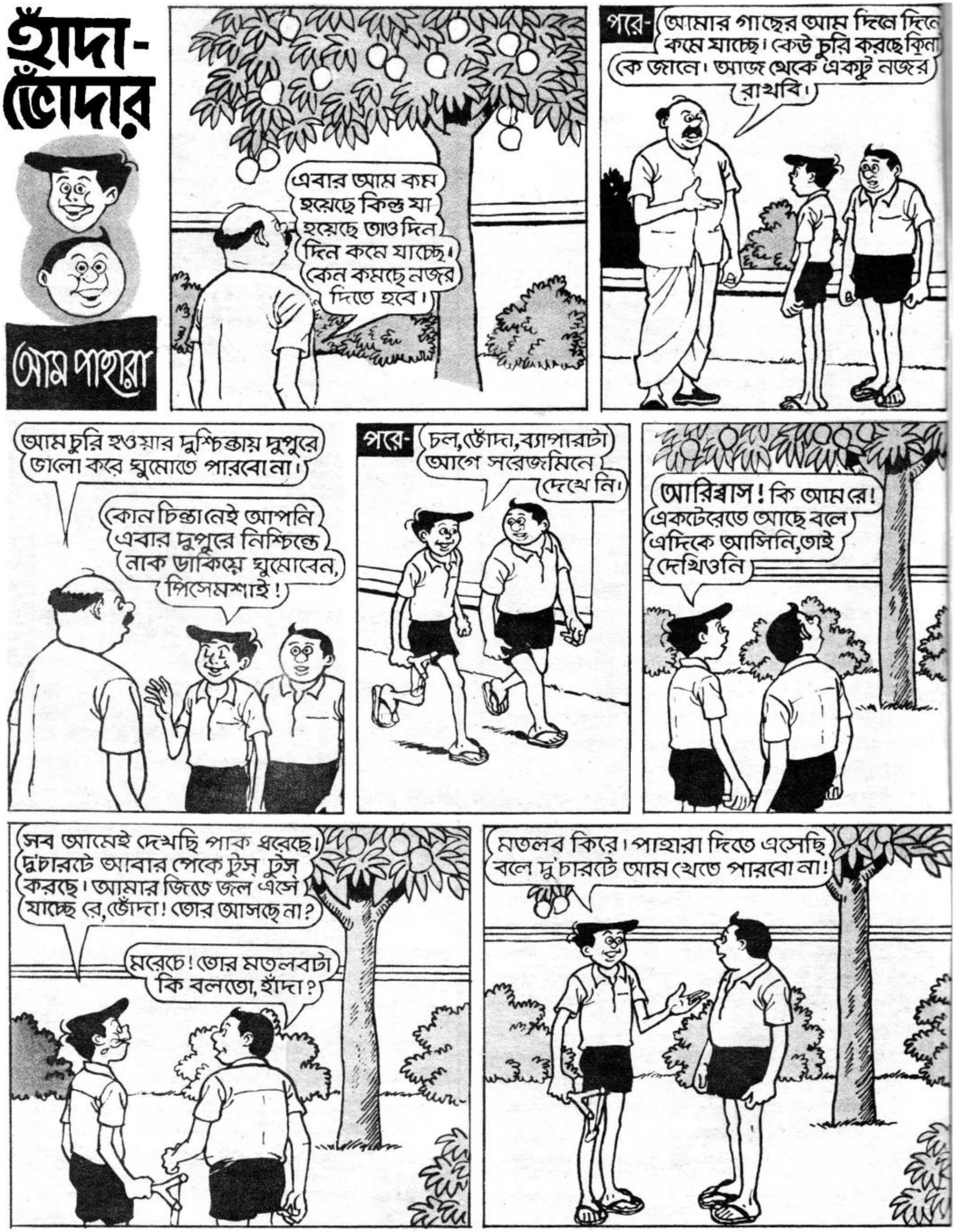
হাঁদা-ভোঁদার
আম পাহারা
এবার আম কম হয়েছে কিন্তু যা হয়েছে তাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। কেন কমছে নজর দিতে হবে।
পরে-
আমার গাছের আম দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। কেউ চুরি করছে কিনা কে জানে। আজ থেকে একটু নজর রাখবি।
আম চুরি হওয়ার দুশ্চিন্তায় দুপুরে ভালো করে ঘুমোতে পারবো না।
কোন চিন্তা নেই আপনি এবার দুপুরে নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবেন, পিসেমশাই!
পরে-
চল, ভোঁদা, ব্যাপারটা আগে সরেজমিনে দেখে নি।
আরিব্বাস! কি আম রে! একটেরেতে আছে বলে এদিকে আসিনি, তাই দেখিওনি
সব আমেই দেখছি পাক ধরেছে। দু'চারটে আবার পেকে টুস্ টুস্ করছে। আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে রে, ভোঁদা! তোর আসছে না?
মরেছে! তোর মতলবটা কি বলতো, হাঁদা?
মতলব কিরে। পাহারা দিতে এসেছি বলে দু'চারটে আম খেতে পারবো না!

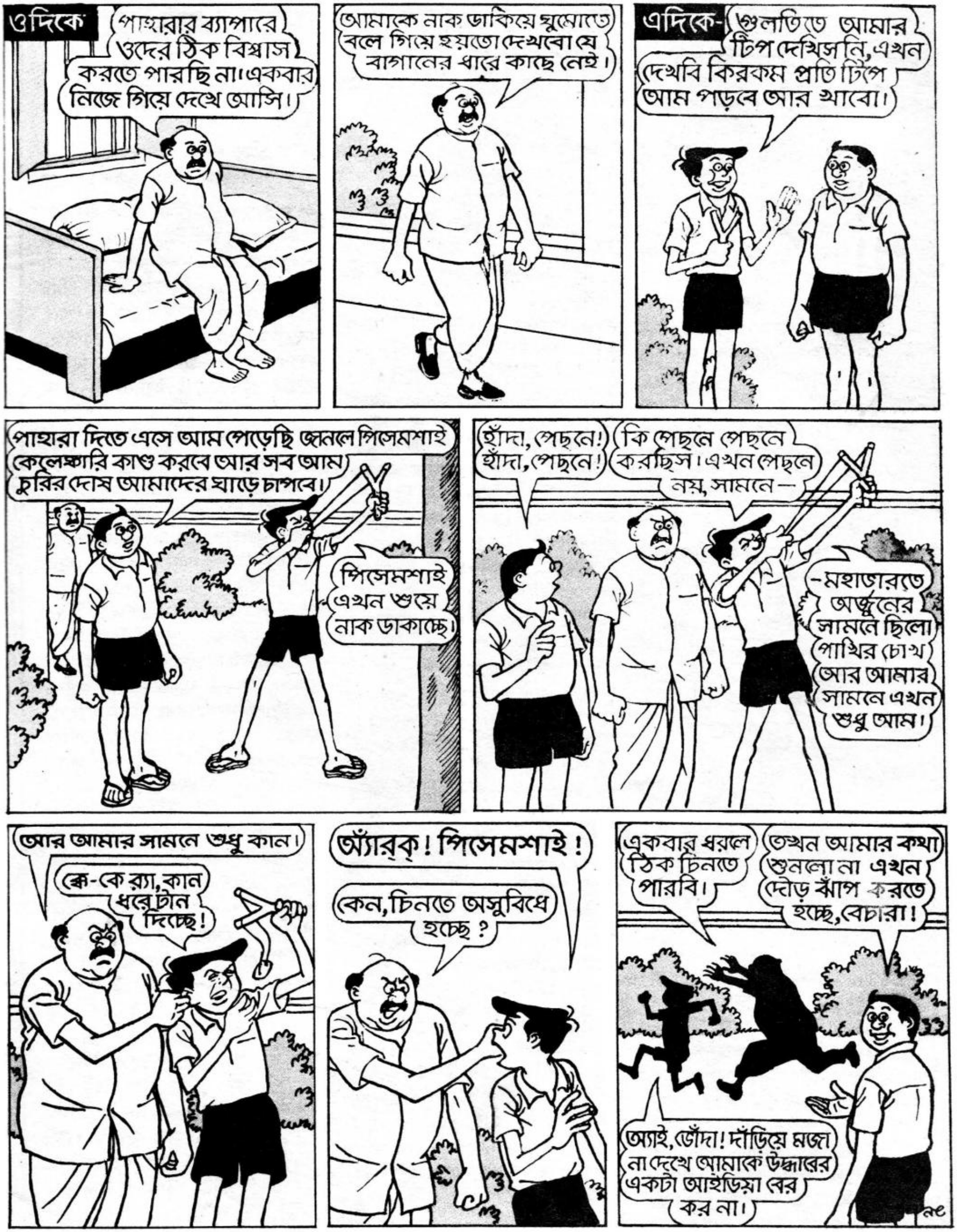
ওদিকে
পাহারার ব্যাপারে ওদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। একবার নিজে গিয়ে দেখে আসি।
আমাকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে বলে গিয়ে হয়তো দেখবো যে বাগানের ধারে কাছে নেই।
এদিকে-
গুলতিতে আমার টিপ দেখিস নি, এখন দেখবি কিরকম প্রতি টিপে আম পড়বে আর খাবো।
পাহারা দিতে এসে আম পেড়েছি জানলে পিসেমশাই কেলেঙ্কারি কাণ্ড করবে আর সব আম চুরির দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপবে।
পিসেমশাই এখন শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।
হাঁদা, পেছনে! হাঁদা, পেছনে!
কি পেছনে পেছনে করছিস। এখন পেছনে নয়, সামনে —
— মহাভারতে অর্জুনের সামনে ছিলো পাখির চোখ আর আমার সামনে এখন শুধু আম।
আর আমার সামনে শুধু কান।
ক্কে-কে র‍্যা, কান ধরে টান দিচ্ছে!
অ্যাঁরক্! পিসেমশাই!
কেন, চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?
একবার ধরলে ঠিক চিনতে পারবি।
তখন আমার কথা শুনলো না এখন দৌড় ঝাঁপ করতে হচ্ছে, বেচারা!
অ্যাই, ভোঁদা! দাঁড়িয়ে মজা না দেখে আমাকে উদ্ধারের একটা আইডিয়া বের কর না।

কেরিয়ার গাইড

ডি. এ. চন্দ্রণ

এন ডি এ পরীক্ষা ও অন্যান্য

মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী/পাশ অনেক পাঠক/পাঠিকার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি এন ডি এ পরীক্ষা সম্পর্কে। এই আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সময়োপযোগী। তরুণ প্রজন্মের কাছে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি পরীক্ষার হাতছানি এড়ানো শক্ত। একই সঙ্গে পড়াশোনা এবং ভাবী জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার স্বপ্ন দুই-ই সফল হতে পারে এই পরীক্ষার মাধ্যমে। এবার তাদের জিজ্ঞাস্য নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। এই উত্তর থেকে শুকতারার অন্যান্য পাঠক বন্ধুরাও দারুণভাবে উপকৃত হবে সন্দেহ নেই।

বয়স সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন করেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এই পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছরের মধ্যে বয়স থাকতে হবে। প্রার্থীর বিবাহিত হওয়া চলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নও অত্যন্ত স্বাভাবিক। এটি হলো শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে। এবার আসি সেই প্রসঙ্গে। ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির 'আর্মি' শাখায় ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পরীক্ষায় যেকোনো শাখায় পাশ করতে হবে। কিন্তু এয়ার ফোর্স কিংবা ন্যাভাল শাখায় ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স সহ ১০+২ পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেছে পরীক্ষাকেন্দ্র কোথায়? কলকাতায় বসে পরীক্ষা দেওয়া যাবে কিনা? হ্যাঁ, সারাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরেই পরীক্ষাকেন্দ্র থাকছে। যেমন আগরতলা, আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, বেরিলি, ভোপাল, চণ্ডীগড়, চেন্নাই, কটক, দিল্লি, ধারওয়াড়, দিসপুর (গুয়াহাটি), গ্যাংটক, হায়দরাবাদ, ইম্ফল, ইটানগর, জয়পুর, জম্মু, জোড়হাট, কোচী, কোহিমা, কলকাতা, লখনউ, মাদুরাই, মুম্বাই, নাগপুর, পানাজী, পাটনা, পোর্টব্লেয়ার, রায়পুর, সম্বলপুর, শিলঙ, সিমলা, শ্রীনগর, ত্রিবান্দ্রাম, তিরুপতি, উদয়পুর, বিশাখাপত্তনম ইত্যাদি।

পরীক্ষার ফি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে অনেকেই। সেজন্য জানিয়ে রাখি পরীক্ষার ফি ধার্য হয়েছে ৫০ টাকা। এটি জমা দিতে হবে সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফি স্ট্যাম্পে।

পরীক্ষার লিখিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন এসেছে। মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে ৩০০ নম্বর। সময় আড়াই ঘণ্টা। এরপর জেনারেল এবিলিটি টেস্টে আড়াই ঘণ্টার প্রশ্নে পরীক্ষায় বসতে হবে ৬০০ নম্বরের মধ্যে।

'ম্যাথমেটিক্স' বিষয়ে কী কী থাকছে? প্রশ্নের উত্তরে জানাই এখানে অ্যালজেবরা, ট্রিগনোমেট্রি, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি, ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস, ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাস, ভেক্টর অ্যালজেবরা, স্ট্যাটিসটিক্স, প্রোবাবিলিটি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।

দ্বিতীয় পেপার অর্থাৎ জেনারেল এবিলিটি টেস্ট পেপারে প্রশ্ন করা হয় ইংলিশ এবং জেনারেল নলেজ বিষয়ে। ইংলিশে থাকে ২০০ নম্বর। তারমধ্যে গ্রামার, ইউসেজ, ভোকাবুলারি, কমপ্রিহেনশন, কোটেশন, সবকিছুর ওপরই প্রশ্ন করা হয়।

জেনারেল নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন থাকে ৪০০ নম্বরের। প্রশ্ন করা হয় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জেনারেল সায়েন্স, সোস্যাল স্টাডিজ, জিওগ্রাফি, কারেন্ট ইভেন্টস বিষয়ে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ইত্যাদি বিষয়ের সিলেবাস মোটামুটি উচ্চমাধ্যমিকেরই সিলেবাস। জেনারেল সায়েন্স বিষয় হলো লাইফ সায়েন্স বিষয়ে। এছাড়া ইতিহাস, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ও প্রশ্ন করা হয়।

সবশেষে প্রশ্ন হলো আবেদন করব কীভাবে? এ প্রসঙ্গে জানাই পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এমপ্লয়মেন্ট নিউজ পত্রিকায়। এটি ভারত সরকারের সাপ্তাহিক কাগজ, সাধারণত এমপ্লয়মেন্ট সংক্রান্ত। আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হয় ২০ টাকার বিনিময়ে জি পি ও কিংবা হেড পোস্ট অফিস থেকে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে এমন অনেকে চিঠি পাঠিয়েছে বিষয় নির্বাচন নিয়ে

আলোচনার জন্য। যেমন সৌমী দত্ত চিঠি লিখেছে—সে অঙ্ক নিয়ে পড়তে চায় না। তার পক্ষে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে ভাল হবে। হ্যাঁ ভাই, অনেক বিষয় নিয়েই পড়ার আছে। তুমি ভূগোল, এডুকেশন, নিউট্রিশন, বায়োলজি, সোসিওলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, হিস্টরি ইত্যাদি কম্বিনেশনের মধ্য থেকে বেছে নাও। তাহলে বিজ্ঞান শাখার মতো গণিতের ভীতি থেকে দূরে থাকতে পারবে। আর এইসব বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে কেরিয়ার গড়ার পক্ষে তোমার কোনো সমস্যা হবে না। যেমন স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় বসতে পারবে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে পারবে। তাছাড়া উচ্চমাধ্যমিকের পর ল কোর্সে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। এমনকি গ্র্যাজুয়েশনে অনার্স নিয়ে পড়লে নিউট্রিশন, এডুকেশনের মতো বিষয়ও তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। নিউট্রিশিয়ানিস্টদের এখন অনেক চাহিদা। তাছাড়া এসব বিষয় নিয়ে পড়লে উচ্চমাধ্যমিকে বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করার সুযোগও থাকছে।

নবনীতা চিঠি লিখেছে হালিশহর থেকে। তার ইচ্ছা রাশিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার। রাশিবিজ্ঞান নিয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ আছে প্রেসিডেন্সি কলেজ, আশুতোষ কলেজ, মৌলানা আজাদ কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স ইত্যাদি কলেজে। কল্যাণী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন রাশিবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছে। তাছাড়া বি. টি. রোডের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট তো আছেই। রাশিবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের এমন পীঠস্থান ভূভারতে কেন তৃতীয় বিশ্বে দ্বিতীয়টি মেলা ভার। এখানে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হয়। তবে মনোনীত হলে পড়া চালানোর জন্য স্টাইপেন্ড পাওয়া যায়। আর ভবিষ্যতে নিয়োগ বা বিদেশের হাতছানি তো আছেই।

নীলাদ্রি ভট্টাচার্য স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার
প্রথম পুরস্কৃত গল্প

গবেষণা

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৌশিকের জ্যাঠামশাই কানাডায় থাকেন। ওখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ওখানেই আছেন। জ্যাঠাইমা শিক্ষিতা বিদেশিনী। বছর পাঁচেক অন্তর এদেশে আসেন। সেই জ্যাঠামশাই চিঠি লিখেছেন। জ্যাঠাইমার চেনা একটি ছেলে, নাম শ্যেন, ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাখি নিয়ে গবেষণা করছে, সে ভারতে আসছে। অন্যান্য রাজ্য ঘুরে বাকি দু'মাস কলকাতায় থাকবে। কৌশিক আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে ও, ফল বেরোলে গবেষণা করবে। এখন হাতে সময় আছে। শ্যেনকে নিয়ে খুব ঘোরা যাবে।

যথাসময়ে শ্যেন এল। বিশ্রাম, আহারের পর কৌশিক স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তোমাকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক পাখি দেখাব, আর বাংলা ভাষা আমি তোমায় শিখিয়ে ছাড়ব।

শ্যেন আনন্দে গ্রহণ করল কৌশিকের প্রস্তাব।

রাতে খেতে বসে কৌশিক বলে, বলো, 'আমি মাংস খাব', 'আমি আলুভাজা খাব', 'আমি রুটি খাব', 'আমি ভাত খাব না'।

শ্যেন কাটা কাটা উচ্চারণে সব বলে, কৌশিক ইংরাজীতে মানে বুঝিয়ে দেয়। যত কথা, যত গল্প সব প্রথমে বাংলায় ওকে দিয়ে বলায়, তারপর মানে বুঝিয়ে দেয় ইংরাজীতে। খেতে খেতে শ্যেনের জলতেষ্টা পেলে ও জিজ্ঞাসা করে, বাংলায় কী বলে ও জল চাইবে।

—আমি জল খাব।

শুনে শ্যেন প্রতিবাদ করে। বলে, ভাষা সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। জল তো তরল পদার্থ! সেটা কেউ 'খায়' নাকি? জল কি চিবানো যায়? তুমি ঠিক করে শেখাও, ভুল শিখিও না।

কৌশিক হাসে, আর বুঝিয়ে দেয় যে শুদ্ধ বাংলায় আমরা বলি 'জল পান করব'। কিন্তু চলতি বাংলায় বলি 'জল খাব'।

এবার শ্যেন হাসে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের উচিত বলা জল 'খাব'। কারণ আমাদের দেশ কানাডার উত্তর দিকে। সেখানে বরফ আর বরফ। তাই আমরা চিবিয়ে চিবিয়ে বরফ খেয়ে অনেক সময় তৃষ্ণা মেটাই। তোমাদের দেশে এত নদী-নালা-পুকুর, এত জল, তবু তোমরা বল জল 'খাব'?

এভাবেই চলল দিন। প্রত্যেকদিন সকালে দুজনে বেরিয়ে যায়, গ্রামে গিয়ে বনেবাদাড়ে ঘোরে। শ্যেন পাখি পর্যবেক্ষণ করে, ফটো তোলে, আর কৌশিক তাকে পরিবেশ অবস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেয়। রাতে বাড়ি ফিরে শ্যেন তার রিপোর্ট লিখতে বসে। তারপর গল্প করা আর খাওয়া-দাওয়া। এই সময় কৌশিক ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে তাকে বাংলা শেখাতে।

কিছুদিনেই শ্যেন চলতি বাংলা কিছুটা আয়ত্ত করেছে। এবার কৌশিক একটা ছবি দেওয়া আ, আ, ক, খ শেখার বই নিয়ে এল। রাতে বসল অক্ষর চেনাতে। অ-অজগর-এর পর আ-আমগাছ পড়তে গিয়েই, আমগাছের ছবিতে একটা পাখির ছবি দেখে গবেষণা করতে বসল, ওটা কী পাখি। চলল শ্যেনের বক্তব্য। কী গভীর জ্ঞান ছেলেটার। কথার পিঠে কথা, একের পর এক পাখির নাম, বিবরণ চলছে তো চলছেই। শোবার সময় এসে গেল।

পরের দিন কৌশিকের মামাতো বোন বেড়াতে এল। ক্লাস ফাইভে পড়ে জয়িতা। তার সঙ্গে গল্প অনেক রাত অবধি। নানারকম পাখির গল্প, শ্যেনদের দেশের গল্প ইত্যাদি। কৌশিক দোভাষীর কাজ করে আর ওকে বাংলা শিখিয়ে চলে।

পরের দিন বিকালে ঘটল এক মজা। ওরা পাখি পর্যবেক্ষণ করে ফিরেছে। জয়িতা আজ বাড়ি ফিরে গেছে। কাল বেশি রাত অবধি জেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটা। কৌশিক শ্যেনকে বলে, আমার

বোন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শ্যেন অমনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ও 'বোন' শব্দে হাড় (bone) বুঝল আর ভাবল তার সঙ্গে রোদে ঘুরে ঘুরে কৌশিকের হাড় দুর্বল হয়ে গেছে। পরে মানে বুঝতে পেরে দুজনের কী হাসি! সে রাতে চলল পাখিদের হাড় নিয়ে গল্প। কোন পাখির কটা হাড়, কটা ছোট, কটা বড়, কোন হাড়টা কী কাজে লাগে ইত্যাদি।

তারপর কয়েকদিন বিকালে অক্ষর পরিচয় খানিকটা হলো। একদিন বিকালে জলখাবার খাওয়ার সময় কৌশিক বলল, 'শ্যেন' মানে, জানো? 'শ্যেন' মানে বাজ পাখি। খুব নিষ্ঠুর।

শ্যেন বলল, বাজ পাখির দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। অনেক দূর থেকে দেখতে পায়। আমিও তেমনি দেখতে পেয়েছি যে তুমি আমাকে ঠকাবার জন্য আমার বাটিতে রসগোল্লার বদলে দুটো একই মাপের সিদ্ধ করা গোল আলু দিয়েছ।

দুজনের অট্টহাসি দিয়ে শুরু হলো বাজপাখি আর আকাশের উঁচুতে ওড়া পাখিদের গল্প। সে রাতে আর অক্ষর পরিচয় অভ্যাস হলো না।

পরের সাতদিন সুন্দরবন আর সাতদিন উত্তরবাংলা ঘুরতে গেল দুজনে। পাখি সম্বন্ধে কৌশিকের অভিজ্ঞতা হলো প্রচুর। মুখে মুখে শ্যেনকে অনেক বাংলাও শেখানো হলো। শ্যেন মাঝে মাঝে ভুল করে আর কৌশিক শুধরে দেয়। একদিন দুপুরে কৌশিক জিজ্ঞাসা করল, ডাব খাবে? শ্যেন বলল, না। ডাভ (Dove—ঘুঘুপাখি) খাব না। তবে ডাভ পেলে কেটে দেখব ওর ভিতরের সবকিছু। সুন্দরবন কথার মানে ও প্রথমে ভেবেছিল সুন্দরী ভগিনী—beautiful sister। পরে কৌশিক যখন বুঝিয়ে দিল যে আসলে উচ্চারণে 'বোন' বললেও শব্দটা 'বন' মানে জঙ্গল তখন ও বুঝল। উচ্চারণ আর লেখা শব্দের বানানের এই পার্থক্য পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই আছে—শ্যেন মানল।

মাঝে মাঝে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু জীববিজ্ঞানের অধ্যাপকদের কাছেও যায় নানা প্রশ্ন আর আলোচনার জন্য।

দেশে ফেরার আর মাত্র সাত দিন বাকি। শ্যেন বাংলা ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারে। অল্প কেটে কেটে বলতেও পারে, কিন্তু অক্ষর পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ হলো না সময়ের অভাবে। শ্যেন ওর কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছিল সময়টা একটু বাড়ানোর জন্য, কিন্তু উত্তর এসেছে অন্যরকম। দেশে ফিরেই ওকে যেতে হবে দক্ষিণ আমেরিকায় একদল নামকরা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে। দলে ও বয়সে সবার ছোট। কিন্তু ওর অধ্যবসায় আর মেধার গুণে ওকে দলে নেওয়া হয়েছে। এ গৌরব শ্যেন যেন হাতছাড়া না করে। কৌশিক জোরে হ্যান্ডশেক করে এটাও শুনিয়ে দিল যে এই সাত দিনে ওর বাংলা অক্ষর পরিচয় শেষ করতেই হবে।

পরদিন সকালে বেরিয়েছে দুজনে। গ্রামের একটা গাছতলায় বসে পাখি পর্যবেক্ষণ করছে আর সিঙাড়া জিলিপি খাচ্ছে। হঠাৎ একটা হনুমান লাফিয়ে সামনে এসে শ্যেনের মাথায় ঠেসে এক চড় মেরে সিঙাড়া জিলিপির ঠোঙা নিয়ে চম্পট। হনুমানের চড়! বেশ লেগেছে, যদিও রক্ত বেরোয়নি। বাড়ি ফিরে ডাক্তারের ওষুধ খেল শ্যেন। ঐ দিন আর কোনো কাজ বা গল্প কিছু হলো না, শুধুই বিশ্রাম। পরদিন বিকালে ব্যথা একটু কমল। কৌশিক শ্যেনকে নিয়ে শহরতলির গ্রাম কোন্নগরে মামাবাড়ি গেল, হাল্কা মেজাজে গল্প করার জন্য। বাড়ির পাশেই একটা গানের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। মামাতো বোন, ভাই সবাই সেখানে রয়েছে। মাঠে চেয়ার পেতে বসার জায়গা। একটি মেয়ে সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত গাইছে। হঠাৎ একটা পেঁচা ওদের কাছাকাছি মাটিতে নেমে এসে ডাকতেই শ্যেন একলাফে উঠে আউল-আউল (পেঁচা-পেঁচা) বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল পেঁচাটার পিছনে। ব্যস, পেঁচার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য সারারাত জাগতে হলো কৌশিককে। পূর্ণিমার রাত, শ্যেনের লোভ লেগে গেল। ওর দেশে এত সুন্দর আকাশ দেখতে পায় না। তাই চাঁদ, আকাশ, পেঁচা দেখে আর পাখির পাশাপাশি অন্যান্য নিশাচর প্রাণীদেরও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে কাটল দুটো রাত।

আর মাত্র তিনদিন বাকি। কৌশিকের অধ্যাপকের কাছ থেকে

জানো কী!

☐ টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিতেই সুনয়নী দেবীর কানে এলো অচেনা ভারী গলার হুমকি......ভয়ে, আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাঁর.........

☐ ভয়ে লোকটা কাঁপছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। হাউমাউ করে লোকটা বলে উঠল, স্যার জলদি চলিয়ে হামারা সাথ.......উধার.......

☐ হালদারমশাই-এর কাছে খবরটা পেয়েই তৈরি হয়ে নিলেন কর্নেল। জয়ন্তও রেডি। দু-এক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে........

☐ দশ বাই দশ—ছোট্ট খুপড়ি। জানলা নেই, আছে শুধু ঘুলঘুলি। বাইরের কোনো শব্দই ঢোকে না এ ঘরে। এমন একটা ঘরে বন্ধ হয়ে আছেন কমলেশ। তা কী করে হবে! ঘটনার শুরু তো আজই, অথচ মনে হচ্ছে, তিনি যেন এই ঘরে বন্দী হয়ে আছেন বেশ কয়েকদিন......

এই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে **শুকতারার ভাদ্র সংখ্যায়**। সেই সঙ্গে তোমাদের ভালো লাগার মতো আরও অনেক, অ....নে....ক কিছু।

একটা ফোন এল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা হচ্ছে। বাংলা ভাষার ইতিহাসের উপর এই কর্মশালায় কৌশিককে যেতেই হবে। আজ রাতেই রওনা হতে হবে। শ্যেনেরও দুটো টেলিফোন এল। ডঃ ব্যানার্জি আর ডঃ সরকার দুজনে আলাদাভাবে তাঁদের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে শ্যেনের গবেষণার বিষয়ে জরুরি আলোচনা করবেন।

রওনা হবার আগে কৌশিক বলল, ভাই শ্যেন, দিগ্বিজয়ী বীরের মতো তুমি এগিয়ে যাও। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও আর অজানাকে জানো। আবার আমাদের দেখা হবে কিনা জানি না। তোমার সাফল্য কামনা করি।

শ্যেন উত্তর দেয়, আমিও কামনা করি তুমি তোমার বাংলা ভাষায় গবেষণা করে শ্রেষ্ঠ সম্মান পাও।

কৌশিক উত্তর দেয়, কিন্তু আমার প্রথম গবেষণাই যে বিফল হয়ে গেল। আমি ঠিক করেছিলাম তোমাকে বাংলা লেখা পর্যন্ত শেখাব। এই অল্প সময়ে কাজটা শেষ করতে পারি কিনা, মনে মনে সেটাই ছিল আমার গবেষণার প্রথম পরীক্ষা। কিন্তু সেটা তো আর হলো না। যাই হোক, যতটুকু পেরেছি, তাতেই আমার আনন্দ। সেই স্মৃতিটুকু থাক।

শ্যেন ওকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাল। কৌশিক যেদিন ফিরল তার তিন ঘণ্টা আগে শ্যেন চলে গেছে। বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করে জানল যে, শেষ তিন দিন ও কোথাও যায়নি। ডঃ ব্যানার্জি, ডঃ সরকার কতবার ডেকেছেন আদর করে, কিন্তু ও যায়নি। বাড়িতে লোক পাঠিয়েছেন তাও যায়নি। পড়ার ঘরে বসে বাংলা অভিধান, বর্ণমালার বই নাড়াঘাঁটা করেছে, আর দিস্তে দিস্তে কাগজে কী সব একের পর এক হিজিবিজি লিখেছে আর ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

—আর এটা তোকে দিয়ে গেছে, মা বললেন।

কৌশিক দেখল একটা নতুন ডায়েরি। তার প্রথম পৃষ্ঠায় কাঁচা হাতে গোটা গোটা করে লেখা :

'তোমার গবেষণা সফল। সেই স্মৃতিটুকু থাক।'

* * *

নীলাদ্রি ভট্টাচার্য স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার
দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

স্মৃতিটুকু থাক

সৌভিক সেন

ঘোষ পরিবারের একমাত্র সন্তান মৌ-এর নতুন আবদার হলো একটি কুকুরবাচ্চা পোষার। ঘোষ পরিবারে সদস্যসংখ্যা মাত্র তিন। ঘোষকর্তা, ঘোষগিন্নি এবং তাঁদের একমাত্র মেয়ে মৌ। মৌ-এর ভাল নাম পারমিতা। লেখাপড়ায় সে খুব ভাল। প্রতিবছর প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়া মৌ ভাল গান গায়। ঘোষকর্তা তাঁর একমাত্র সন্তানকে খুবই স্নেহ করেন। তার সব আবদার তিনি মেটান। তার এই নতুন আবদারটিও মেটানো হলো। ঘোষকর্তা মৌ-এর দশম বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে মৌ-কে একটি কুকুরছানা উপহার দিলেন। ঘোষগিন্নি বাড়িতে কুকুর ঢোকানোর বিরোধী ছিলেন। তিনি কুকুরছানাটিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। মৌ কুকুরছানাটির নাম দিয়েছিল জিমি। জিমি সারাদিন মৌ-এর সঙ্গে থাকে, রাতে তার ঘরেই শোয়।

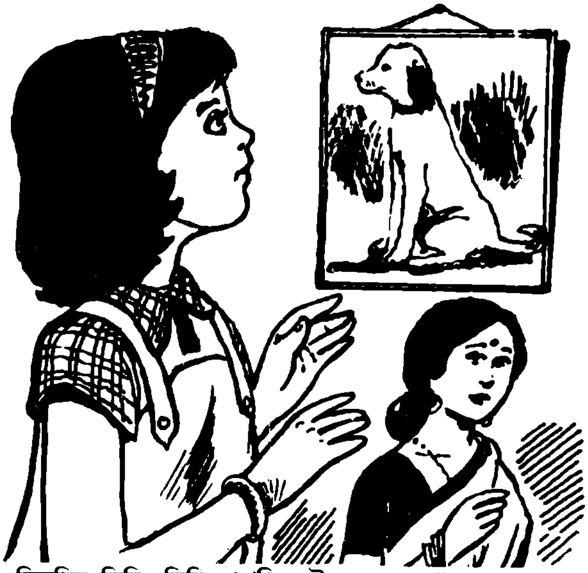

এইভাবে কেটে গেল আট বছর। জিমি এখন বড় হয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা মৌ যখন পড়ছে তখন জিমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল। মৌ ঘাড় ফেরাল জিমিকে দেখবার জন্য, কিন্তু টেবিলের উপর চোখ পড়তেই সে চমকে উঠল। একটি বিষধর কেউটে মৌ-কে ছোবল মারবার জন্য ফণা তুলেছে।

সাপটি মৌ-কে ছোবল মারবার আগেই, জিমি সাপটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আক্রমণ করল। সাপটিও জিমিকে ছোবল মারবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জিমি সেইসব ছোবল অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এড়িয়ে গেল। জিমি সর্বক্ষণ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সাপটির জীবনদশা অন্তিমপর্বে পৌছাল। সাপটি তার জীবনের শেষ ছোবলটি মারল জিমির পেটে। এই ছোবলটি জিমি এড়িয়ে যেতে পারল না। সেও ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। ততক্ষণে সাপটিরও ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। জিমিকে এরকম লড়াই করতে দেখে মৌ হতভম্ব হয়ে গেছিল। জিমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই তার হুঁশ ফিরে এলে। সে চিৎকার করে দৌড়ে গেল জিমির কাছে। ঘোষকর্তা ও গিন্নি মেয়ের চিৎকার শুনে দৌড়ে এলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, জিমি তখন সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যে ঘোষগিন্নি জিমিকে ঘৃণা করতেন, তাঁর চোখেও দেখা গেল জল।

পরদিন সকালে উঠে মৌ অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে তার ঘরে জিমির একটি ছবি রয়েছে। সে ভাবল যে কাল রাত পর্যন্ত ছবিটা ঘরে ছিল না, তাহলে সকালে ছবিটা ঘরে টাঙানো হয়েছে। কিন্তু এত সকালে মা ছাড়া তো কেউ ওঠে না। তাহলে মাই ছবিটি টাঙিয়েছেন। যেখানে জিমির মৃত্যুর জন্য মৌ-এর মন বিষাদপূর্ণ হয়ে থাকার কথা সেখানে মৌ-এর মন এই ভেবে আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল যে, তার মা সকলের সামনে জিমিকে অপছন্দ করলেও মনে মনে তাকে ঠিকই ভালবাসতেন।

কিছুক্ষণ পরে ঘোষগিন্নি মৌ-এর ঘরে এলেন মৌকে ডাকতে। তিনি এসে দেখেন মৌ তার ঘর গোছাচ্ছে। মাকে দেখতে পেয়েই মৌ ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, মা, ছবিটা তুমি টাঙিয়েছ?

ঘোষগিন্নি সজল চোখে বললেন, মৌ, ছবিটা আমিই টাঙিয়েছি। একজন বিশ্বাসী বন্ধুর সঙ্গলাভ যেমন আনন্দের ঘটনা, তেমন সঙ্গছাড়া হওয়াও দুঃখের। আমরা যদি তার কথা মনে না রাখি তাহলে আমাদের কৃতজ্ঞতা বলে কিছু থাকে না। আমরা যদি তার কথা মনে রেখে তার অনুপস্থিতিকে মানিয়ে নিতে পারি, তাহলে তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ পাবে। জিমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তোমার প্রাণরক্ষা করে যে মহৎ উপকার করে গেছে, তা ভুলে গেলে আমাদের মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে না। মনুষ্যত্ব যে কয়টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে তার মধ্যে একটি হলো কৃতজ্ঞতা। মৌ, এই স্তম্ভটি ভেঙে গেলে মনুষ্যত্ব রক্ষা পাবে না। কথাকটি বলেই ঘর থেকে চলে গেলেন ঘোষগিন্নি। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মৌ, সে জিমির কথা কোনোদিনও ভুলতে পারবে না। জিমির স্মৃতি চিরজাগরূক হয়ে থাকবে মৌ-এর মনের মণিকোঠায়। জিমিই তো তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

ছবি ঃ জুরান নাথ

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে ঃ

দেবাশিস গোস্বামী (আনন্দপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর)।। সংঘমিত্রা নাগ (শিবপুর, হাওড়া)।। সঞ্চিতা দত্ত (নিমতা, কলকাতা-৪৯)।। জুমিলা নিয়োগী (ভবানীপুর, কলকাতা-২৫)।। মন্দিরা চট্টোপাধ্যায় (আসানসোল, বর্ধমান)।। দীনবন্ধু বসু (কদমতলা, হাওড়া)।। পুরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (মধ্যমগ্রাম, উঃ ২৪ পরগনা)।। লক্ষ্মীশ্রী লাই (লেকটাউন, কলকাতা-৮৯)।। সুবোধ কুমার মুখার্জী (আন্দুল, হাওড়া)।। বিশ্বজিৎ কর (সুভাষপল্লী, খড়্গপুর)।। বিশ্বজিৎ মণ্ডল (উলুবেড়িয়া, হাওড়া)।।

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি. চন্দ্র তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন। এই মাসের পুরস্কার প্রাপকরা ঃ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌভিক সেন, দেবাশিস গোস্বামী, সংঘমিত্রা নাগ ও সঞ্চিতা দত্ত।

ঘোষণা

কলকাতার তালতলা নিবাসী সুনীল চন্দ্র মৈত্র তাঁর প্রয়াতা পত্নী কল্যাণী মৈত্রের নামে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে কল্যাণী মৈত্র স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য মৌলিক লেখা চাইছি।

৺কল্যাণী মৈত্র

মৃত্যু ঃ ১৪ জুন ২০০০

বিষয়বস্তু

অকৃতজ্ঞ

পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার পৌষ সংখ্যায় ছাপা হবে। লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ শ্রাবণ।

প্রথম পুরস্কার ঃ ১০০ টাকা ◆ দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ৫০ টাকা

বাঘ-সিংহের কোচিং ক্লাসে

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একটা বেড়াল পাওয়া যাবে? খুব আদুরে, গোলগাল এবং মিষ্টি চেহারা হওয়া চাই!

মেনি না হুলো?

মেনি হলেই ভাল।

বেশ। হয়ে যাবে। তা বেড়ালের কাজটা কী?

কি আর এমন কাজ! আমার হিরোর কানে-কানে কিছু কথা বলবে। ব্যস এটুকুই।

দাঁতে সিগারটা চেপে মিঃ ওয়েলস বললেন, কিছু কথা কেন? একটা গোটা গান গেয়ে শোনাতে পারে আমার টিনিয়া।

নির্দিষ্ট দিনে টিনিয়া এল খাঁচায় চেপে হলিউড স্টুডিওতে। ছোটদের ছবির শূটিং হচ্ছে। একটি ছোট ছেলে বাড়ির পোষা বেড়ালটিকে রেগে গিয়ে মেরেছে। সন্ধ্যেবেলায় ছেলেটির বাবা বাড়ি ফিরতেই বেড়ালটি ভদ্রলোকের কোলে লাফিয়ে উঠল। তারপর তাঁর কানে মুখ দিয়ে ফিসফিস করে নালিশ জানাল।

সিনেমার দর্শকরা বস্তুত এমনটাই দেখবেন। কিন্তু আসল গপ্পোটা জানেন শুধু মিঃ ওয়েলস, সিনেমার হিরো এবং এখন জানছে শুকতারার বন্ধুরা। ক্যামেরা জোনের বাইরে বসেছিলেন বেড়ালটির ট্রেনার। তাঁর কোলেই মহা আরামে বসেছিল টিনিয়া। একটু পরেই ট্রেনারের নির্দেশে একজন একটি ছোট চিংড়ি মাছ নিয়ে গুঁজে দিলেন হিরোর কানে। এরপর রেডি হলো ক্যামেরা। স্টার্ট, সাউন্ড, অ্যাকশন বলার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনারের ইঙ্গিতে টিনিয়া সোজা হেঁটে গেল হিরোর সামনে এবং লাফিয়ে উঠে তাঁর কানে মুখ গুঁজে দিল। ফিসফিস করে কথা নয়, আসলে টিনিয়ার টার্গেট ছিল ঐ চিংড়ি মাছ। এভাবেই স্রেফ খাবারের লোভ দেখিয়ে সিনেমায় অভিনয় করিয়ে নেওয়া হয় ছোট্ট নেংটি ইঁদুর থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর বাঘ কিংবা প্রকাণ্ড আফ্রিকার হাতিকে।

তবে সিনেমায় যখন বাঘ কোনও মানুষকে মারে কিংবা হাতি তার পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে দেয় মেঠো বাড়িঘর, তা কী করে সম্ভব হয়? পাঁচিশটি বুনো মোষ ক্যামেরার সামনে একই সঙ্গে ডান থেকে বাঁয়ে মাথা ঘোরায় কিভাবে? অথবা একদল শিম্পাঞ্জি কি করেই বা অবিকল মানুষের মতো আচরণ করতে থাকে হলিউড পাড়ায় ঢুকলেই? এর উত্তর জানতে যেতে হবে ওয়েলস সায়েবের কাছে।

সায়েবের পুরো নাম হুবার্ট ওয়েলস। হুবার্টের এক অদ্ভুত ব্যবসা আছে। সে ব্যবসার নাম Animal Actors of Hollywood। তাঁর পোষা প্রাণীরা বহু ছবিতে অভিনয় করেছে। তার মধ্যে কয়েকটির নাম হচ্ছে Dr. Doolittle, Sheena, Out of Africa, Never Cry Wolf, Born Free, Quest for Fire, Clan of the Cave Bear এবং Project X. শৈশবে হুবার্টের ছিল জীবজন্তু প্রীতি। বড় হয়ে সেটাই হয়ে গেল তাঁর জীবিকার মাধ্যম। অর্থও আসতে লাগল মন্দ নয়।

মিঃ ওয়েলসের জন্তু-জানোয়ার রাখার জায়গা বা র‍্যাঞ্চটি ক্যালিফোর্নিয়ার থাউজেন্ড ওকস-এ। লস অ্যাঞ্জেলস থেকে যার দূরত্ব ষাট মাইল। এখানে সায়েবের একশ রকমের বন্য ও গৃহপালিত পশুপাখি আছে। এরা সকলেই অভিনেতা। যখন যে চান্স পায় নেমে পড়ে সিনেমায়। যে সব অভিনেতারা হরদম ডাক পায় তারা হলো সিংহ, বাঘ, ভালুক, শিম্পাঞ্জি, উট, নেকড়ে, জাগুয়ার, নানা ধরনের

পশু দেখাশোনার কাজটি সত্যিই আনন্দের।

হিংস্র পশুকে প্রশিক্ষণ দেবার সময় সতর্ক থাকেন ট্রেনার।

সাপ এবং কুকুর ও বেড়াল। এদের সভ্যতা, সহবত আর অভিনয় শেখানোর জন্য ছয়জন স্থায়ী ট্রেনার আছেন। ওঁদের সাহায্য করেন আরো পনেরজন অস্থায়ী কর্মী। এঁরাই ওদের খাওয়ান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন, ব্যায়াম করান এবং ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ দেন। বহুদিন ধরে অনেক কসরৎ ও কাণ্ডকারখানা করার পর পশুপাখিরা খেলা দেখাতে এবং ট্রেনারের কথামতো কাজ করতে শেখে। খরচাপাতি কেমন হয়? বছরে প্রায় তিন লক্ষ ডলার বা দেড় কোটি টাকার কাছাকাছি।

শূটিংয়ের সময় ট্রেনারদের খাটুনি বেড়ে যায়। তখন তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হয় চারপেয়ে আর ডানাওয়ালা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ঠিক স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী অভিনয় করছে কিনা। অনেক সময় ওদের দিয়ে মনমতো অভিনয় করিয়ে নিতে ট্রেনাররাই পরচুলো আর সিনেমার পোশাক পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। আসলে যদি দেখা যায় মানুষ অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে ওরা মানসিকভাবে মেনে নিতে পারছে না তখনই ট্রেনারদের ডামি সাজতে হয়।

ওয়েলস সায়েবের ট্রেনিং পাওয়া অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা মাঝে-মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে আউটডোর শূটিংয়ে। শহরের রাজপথ বা গ্রামের ঝোপঝাড় হলে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু যখন ওদের গভীর জঙ্গলে যেতে হয় সেই সময়টায় ট্রেনারদের খুব সতর্ক থাকতে হয়। কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তু-জানোয়ারদের এভাবে জঙ্গলে হঠাৎ চলে আসাটা একেবারেই পছন্দ করে না ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা। ওয়েলস সায়েব একটি পত্রিকাতে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছিলেন, একবার আফ্রিকার জঙ্গলে অভিনেতা সিংহের হাঁক শুনে ওখানে হাজির হয়ে যায় গভীর জঙ্গলের বন্য সিংহ। জঙ্গলের প্রাণীরা নিজেদের এলাকা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। ফলে মুহূর্তের মধ্যে বেধে যায় লড়াই। এমন কিছু হলেই গাড়ি নিয়ে তাড়া করা হয় আক্রমণকারী সিংহ বা অন্য যে কোনও প্রাণীকে।

পঞ্চাশ বছরের ওপর ব্যবসা করছেন ওয়েলস। তাঁর কোম্পানির জীবজন্তুর চরিত্র তিনি ভালই বোঝেন। তবু খাঁচাগাড়ি চড়ে ওরা শূটিংয়ে বেরোলেই ওয়েলস নার্ভাস বোধ করেন। যতক্ষণ না ওরা ফিরে আসছে তাদের ডেরায় তাঁর দুশ্চিন্তা কিছুতেই দূর হতে চায় না। কারণ একটাই। জীবজন্তুরা অভিনয় করতে গিয়ে যদি তার মানুষ সহ-অভিনেতাকে আঘাত করে বসে?

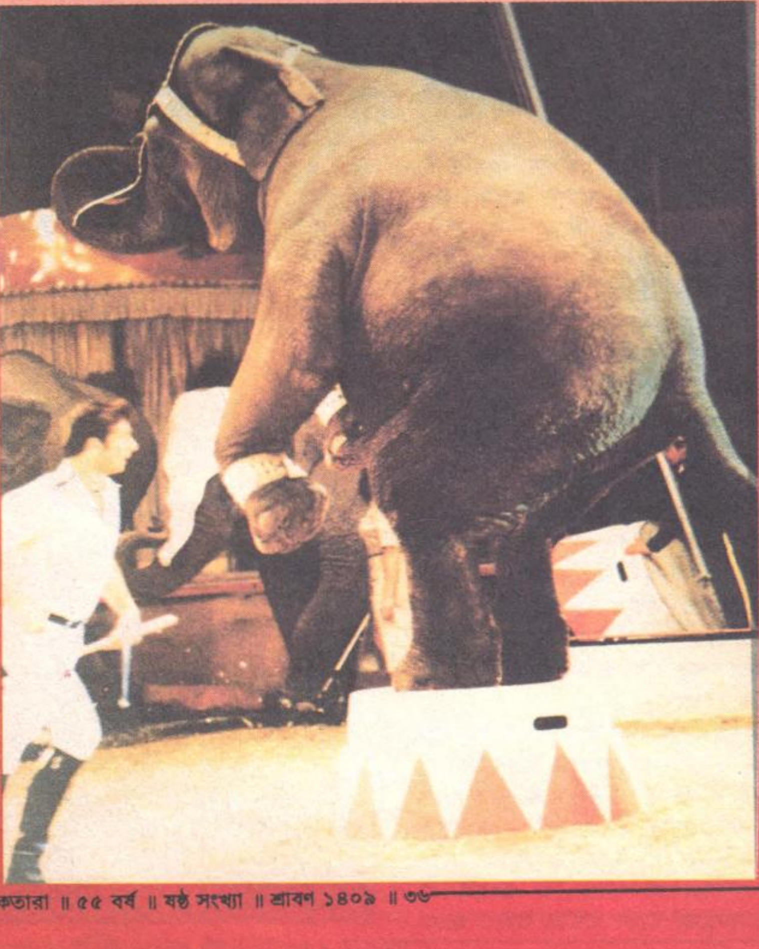

হাতিকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এক ট্রেনার।

আপনি নিজে কখনও আহত হননি ওদের আক্রমণে? সাক্ষাতকারী সব শেষে ওয়েলসকে প্রশ্নটি করেছিলেন।

মুচকি হেসে ওয়েলস বলেছিলেন, প্রতিটি বড় বেড়ালই আমাকে দাঁত কিংবা থাবার আঘাতে জর্জরিত করেছে। ব্যতিক্রম শুধু জাগুয়ার। তবে আমাকে যাই করুক না কেন আমার চারপেয়ে, সরীসৃপ অথবা ডানাওয়ালা ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে কখনোই কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে আঘাত করেনি। ওরা আমার মানটা কিন্তু সত্যিই রাখে।

কারা হতে পারেন বাঘ-সিংহের মাস্টারমশাই?

গোড়ার দিকে জীবজন্তুদের ট্রেনিং দিতেন অবসরপ্রাপ্ত সার্কাসের খেলোয়াড়রা। ট্রেনিংয়ের সময় তাঁরা দুটি জিনিস ব্যবহার করতেন—বন্দুক আর ছপ্‌টি। এখন কিন্তু ছবিটা পুরোপুরি বদলে গেছে। হিংস্র পশুদের মেরে ধরে নয়, ওদের বশ করা হয় স্রেফ স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে। ট্রেনী এবং তার ট্রেনার ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে কাটায়। সেই সময় ট্রেনার লক্ষ্য রাখেন যাতে তাঁর আচরণ কোনোভাবেই পশুটির আত্মসম্মানবোধে আঘাত না করে। এটা করতে পারলেই আস্তে আস্তে সেই পশু ট্রেনারকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। ছাত্র-ছাত্রীর বিশ্বাস জিতে নিতে পারলে তবেই তাকে কোনো বিশেষ খেলা বা কাজ শেখানো সম্ভব হয়। কিন্তু শুধু শেখালেই তো হবে না, তাকে লাগাতার উৎসাহ যোগাতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কথা ঠিক ঠিক শুনলে তাকে পুরস্কৃত করতে হবে মুখে প্রিয় খাবারটি গুঁজে দিয়ে বা বারে বারে পিঠ চাপড়ে তাকে বাহবা দিতে হবে। তবেই না সে কথা শুনবে। আর তখনই মনিবকে খুশি করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে শেখানো কাজটি নিখুঁতভাবে করে দেখাতে।

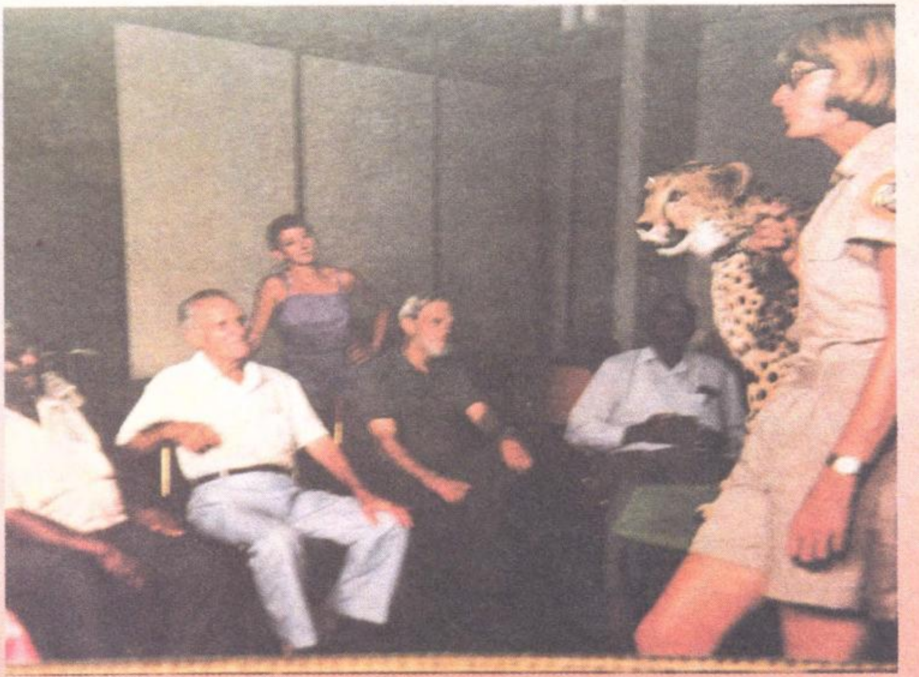

বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়াতে ক্লাস নিচ্ছেন এক পশু-পরিচর্যাকারী।

পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের অ্যানিম্যাল ট্রেনাররা কিন্তু এইসব 'স্নেহ-ভালবাসা' নীতিতে বিশ্বাসী নন। ওঁদের মতে যতই স্নেহ-ভালবাসা দেখানো হোক না কেন হঠাৎ করে ভয় পেলেই হিংস্র জন্তুরা ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ট্রেনারের ওপর। জংলী জানোয়ার সব সময়ই আক্রমণাত্মক হয়ে থাকে। কাজেই ট্রেনারকেও সব সময় কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে পশুদের সঙ্গে। প্রতিটি পদক্ষেপে বোঝাতে হবে আমি মনিব তুমি ভৃত্য। আমার আদেশ পালন করতে তুমি বাধ্য। এই ভাবটি ওঁরা যে কোনও পশুকে যথেষ্ট বড় হওয়ার আগেই বুঝিয়ে দিতে চান। এতে পরবর্তীকালে কাজের সুবিধে হয়।

ট্রেনিং দেওয়ার সময়

ঠিক বই পড়ার মতো করেই যেকোনও পশুকে পড়তে হবে ট্রেনিং চলাকালীন। পশুকে পড়া মানে তার Body Language বা দেহের ভাষা বোঝা। ট্রেনার মাত্রই জানেন হিংস্র পশুদের নিয়ে কাজ করা মানে মৃত্যুর পাশাপাশি থাকা। ওঁরা পশুদের সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ভালরকম ওয়াকিবহাল। ওঁরা জানেন ওদের পছন্দ-অপছন্দ। তাই ওদের আচরণে বিপদের আভাস পেলেই ওঁরা সতর্ক হয়ে যান।

কৌতূহলী বাচ্চাদের সামনে আমেরিকান অ্যালিগেটার হাতে চিড়িয়াখানার এক কর্মী।

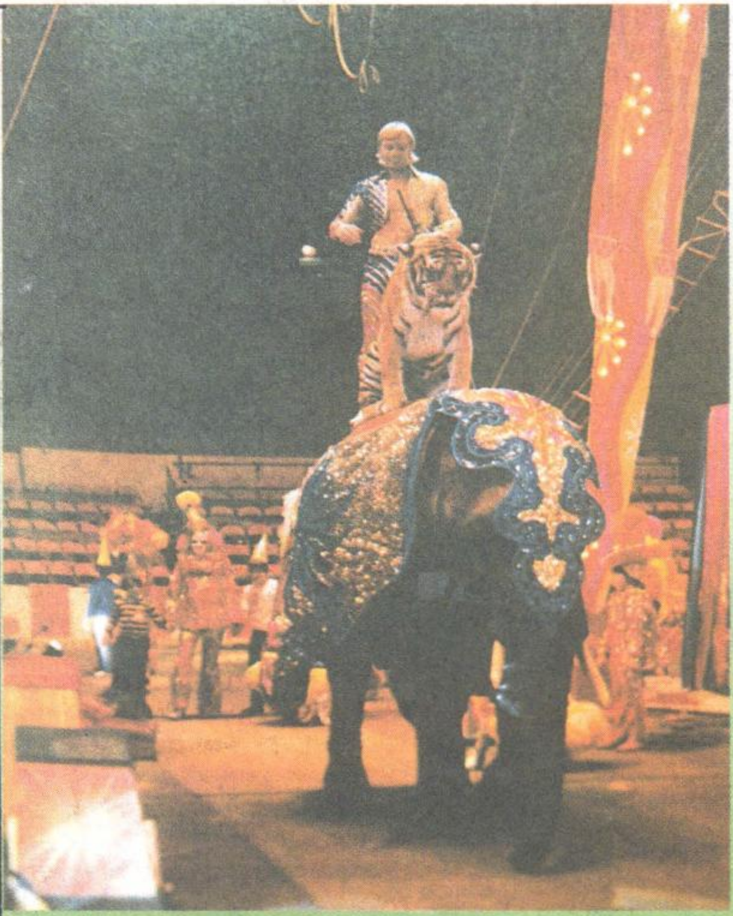

ট্রেনিং-এর গুণে বাঘটি অবশেষে শিখেছে হাতির পিঠে চড়তে।

হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে থেকে থেকে ট্রেনারও বুঝে গেছেন সিংহমশাই নিজের মেজাজ-মর্জির খবর কিভাবে প্রকাশ করে। যেমন কোনও সিংহ যদি ডান থেকে বাঁয়ে কিংবা বাঁ থেকে ডানদিকে ল্যাজটি আন্দোলিত করে, তাহলে বুঝতে হবে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ল্যাজ নাড়াচাড়ার সঙ্গে যদি চাপা গর্জন ওঠে তবে সাবধান, সিংহমশাই লাফ মারল বলে।

হাতি কিংবা ঘোড়াদের রাগ বা ভয় বোঝা যায় ওদের চোখ এবং কান দেখে। ভয় পেলে চোখ দুটি বিরাট বড় হয়ে ওঠে এবং কানজোড়া পিঠে প্রায় আঠার মতো সেঁটে থাকে। সেই সঙ্গে ল্যাজটিও একেবারে খাড়া হয়ে যায়।

কোনো জন্তুকে ট্রেনাররা বিশ্বাস করেন না মোটেই। এমন জন্তু কি আছে যে পোষ মেনে দীর্ঘদিন নিরীহ বেড়ালের মতো আচরণ করার পর হঠাৎই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে? সারা পৃথিবীর বাঘ-সিংহের মাস্টারমশাইরা সমস্বরে উত্তর দেবেন, হ্যাঁ আছে। সে হচ্ছে লেপার্ড বা চিতাবাঘ। হলিউডের এক বিখ্যাত বাঘ-সিংহের আন্টির নাম চেরিল হ্যারিস। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ পাওয়া একটি চিতাবাঘের বয়স তখন মোটে দু' বছর। এই প্রাণীটিকে তিনি কোলে-পিঠে করে বড় করে তুলেছিলেন আক্ষরিক ভাবেই। চেরিলের চোখের ইশারায় তাঁর ইঙ্গিত মতো কাজ করে দর্শকদের বিস্তর বাহবা কুড়োত চিতাবাঘটি।

একদিন চেরিল তাঁর প্রিয় পোষ্যটিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন স্টুডিওর বিশাল চত্বরে। সবে সকাল হয়েছে। ভোরের নরম রোদ এসে লুটোপুটি খাচ্ছিল সবুজ ঘাসে, চারপাশের গাছপালায় এবং হলুদ-কালো ছোপ প্রাণীটির শরীরে। প্রতিটি পদক্ষেপে সঞ্চালিত হচ্ছিল তার জোয়ান শরীরের অমিত শক্তিশালী পেশীগুলি। তবু সে হাঁটছিল ঠিক একটি পোষা কুকুরের মতোই। চেরিলের হাতে ছিল একটি ছড়ি। তবে সেদিন ওঁর সঙ্গে ছিলেন না তাঁর প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গী মহিলাটি। আসলে যে কোনও হিংস্র প্রাণীকে নিয়ে খোলা জায়গায় বেড়াতে হলে সঙ্গে আর একজন মানুষ অবশ্যই রাখা চাই। যাতে হঠাৎ প্রাণীটি হিংস্র হয়ে উঠলে দ্বিতীয় জন যেন প্রথম জনকে সাহায্য করতে পারেন। চেরিলের ভুল হয়েছিল সঙ্গী ছাড়াই তিনি চিতাবাঘটিকে নিয়ে হাঁটছিলেন।

হঠাৎই ঘনিয়ে এলো ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি। চিতাবাঘের গলার চেন আটকে গিয়েছিল একটি ঝোপে। ফলে হ্যাঁচকা টান পড়ল তার গলায়। চেরিল তখুনি ঝুঁকে পড়লেন চিতাবাঘের সামনে চেনটি ঝোপ থেকে ছাড়িয়ে

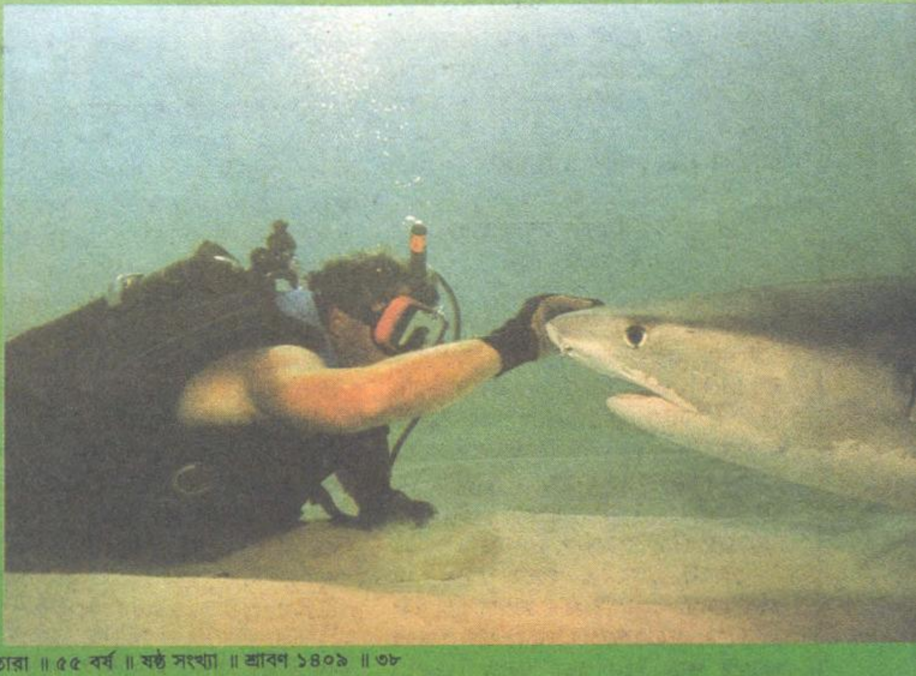

অসুস্থ টাইগার শার্কের ডাক্তারি হচ্ছে জলের নিচে।

নিতে। চোখের পলকে ভয়াল গর্জন করে চেরিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতাবাঘ। তাঁর কণ্ঠনালি ছিন্ন করার জন্য সে বারবার কামড় বসাল গলায় বুকে পিঠে।

সেই ভয়াবহ মুহূর্তেও চেরিল মাথা ঠাণ্ডা রেখে জন্তুটিকে বাধা দিচ্ছিলেন এবং প্রচণ্ড চেঁচিয়ে No-No বলে যাচ্ছিলেন। চিতাবাঘটি একটু চাপ আলগা করতেই চেরিল ভাগ্যক্রমে দাঁড়াবার মতো জোর পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চেন ধরে দাঁড়িয়ে পড়েন। উনি দাঁড়াতেই নিমেষে বদলে গেল দৃশ্যটা। হিংস্র হয়ে ওঠা চিতাবাঘ মুহূর্তে পরিণত হলো নিরীহ বেড়ালে। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে সে বারেবারে তার মাথা ঘষতে লাগল চেরিলের হাঁটুতে। এই মাথা বা নাক ঘষার ব্যাপারটি বেড়াল শ্রেণীর প্রাণীরা খুব করে। এর অর্থ, কি ভাই, সব ভাল তো?

রক্তাক্ত চেরিল চিতাবাঘকে তার জায়গায় রেখে গেলেন হাসপাতালে। চিতার নখ আর দাঁতে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া শরীরে অজস্র সেলাই পড়ে। চেরিল কি সেদিন দোষ দিয়েছিলেন চিতাবাঘকে? বলেছিলেন কি যে এই অবাধ্য প্রাণীটিকে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক, এ ট্রেনিং-এর অযোগ্য?

চেরিল প্রথমেই নিজের দোষ স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, আমার ভুলের কোনও ক্ষমা নেই। প্রথমত লোক ছিল না সঙ্গে। আর দ্বিতীয়ত চিতাবাঘের শরীরের ওপর কখনও ঝুঁকে দাঁড়াতে নেই। অথবা পিছন ফিরে ওদের শরীর স্পর্শ করতে নেই। এরকম অবস্থা হলেই ওরা অজানা কোনও কারণে ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে আক্রমণ করে বসে, যা হয়েছিল এক্ষেত্রে। আতঙ্কের কারণ দূর হতেই সে তখুনি আবার লজ্জা পেয়ে ভাব করে নেয় আমার সঙ্গে।

কারা তৈরি করেন বাঘ-সিংহের মাস্টারমশাইদের?

পৃথিবীতে একটিমাত্র কলেজে জীবজন্তুদের ট্রেনিং দেওয়া শেখানো হয়। শিক্ষাঅন্তে ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। কলেজটির নাম Moorpark College। ক্যালিফোর্নিয়ার মুরপার্ক নামে জায়গাটিতে এই স্কুলটি অবস্থিত। যে কোর্সটি এই ট্রেনিংয়ের বিষয়বস্তু তার নাম "EXOTIC ANIMAL TRAINING AND MANAGEMENT PROGRAM" সংক্ষেপে EATM।

কোর্সটি এককথায় বলতে গেলে বেশ কঠিন। মাত্র পঞ্চাশটি ছাত্র নেওয়া হয় এবং কোর্স শেষ করতে লাগে দু'বছর। ভর্তি হওয়ার দরখাস্ত পড়ে তিন বছর আগে থেকেই। পঞ্চাশ জন ছাত্র পড়তে শুরু করে বটে তবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে পঁচিশ জন। আর এই পঁচিশ জনের ভাগ্যে কিন্তু সত্যিই মেওয়া ফলে। এখান থেকে A. S. Degree পাওয়া গেলে চাকরি জোটে চিড়িয়াখানা, ওসানারিয়াম, অ্যাকোয়ারিয়াম এবং বিভিন্ন থিম পার্কে। অনেকে আবার চাকরি পায় সরকারি অথবা বেসরকারি অ্যানিম্যাল ট্রেনিং ফার্মে। খুব ভাগ্যবান পনেরো কি কুড়ি জন যোগ দেন সিনেমা শিল্পে। সিনেমায় নামা পশুদের ট্রেনার হলে আশাতিরিক্ত অর্থ পাওয়াটা খুব সহজ।

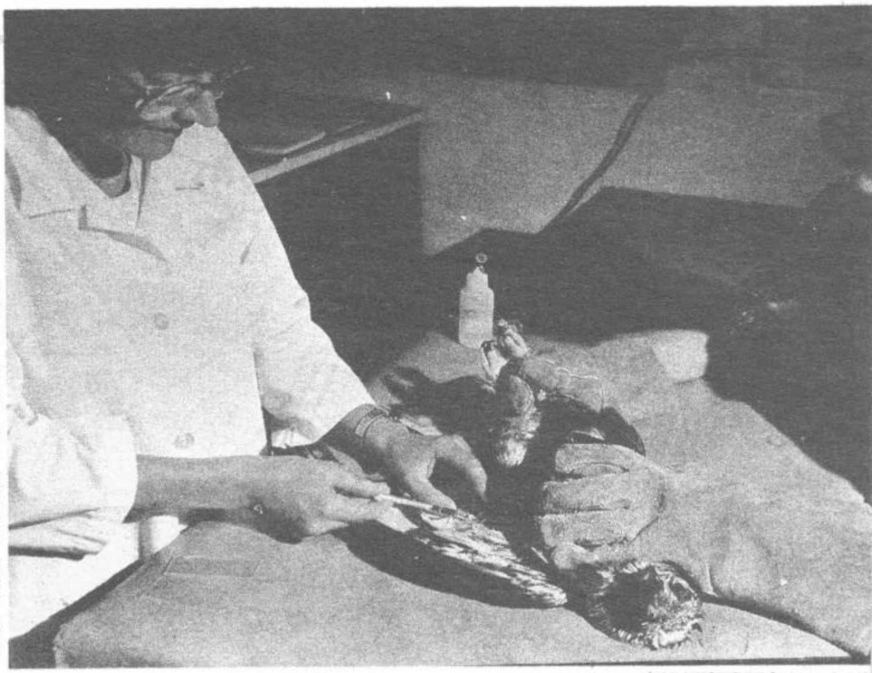

আহত বাজের চিকিৎসার সময় দরকার শক্তপোক্ত দস্তানা।

কেমন হয় ট্রেনিং ক্লাস? নমুনা দেখলেই তা বোঝা যাবে। ঐ কলেজটির ভেতরে ঠিক চিড়িয়াখানার অনুকরণে একটি পশুশালা রাখা আছে। সেখানে সাড়ে তিনশ রকমের প্রাণী আছে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে শিখতে হবে ইঁদুর, খরগোশ, পায়রা ও মুরগী কাটতে। প্রথম প্রথম অনেকের বিশেষ করে মেয়েদের অসুবিধে হয় কিন্তু এর ওপরেও নম্বর আছে যে। এইসব প্রাণী বধ করে অনেক জীবজন্তুদের খাওয়ানো হয় বলে কাজটি প্রত্যেককে খুব ভাল করে শিখতে হবে।

চিড়িয়াখানার বন্দী প্রাণীদের তো কোনও ছুটিছাটা নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের তাই প্রতি সপ্তাহে এক রাত থাকতে হয় কলেজের পশুশালায়। সারা রাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে পশুদের। রাতের অন্ধকারে বিশ্রামের সময় ওদের গতিবিধি কেমন হয়। কলেজের হাজিরা প্রতিদিন সকাল ছটায়। প্রতিটি ক্লাসে প্রতিদিনের কাজের ওপর নম্বর দেওয়া হয়। নম্বর বলতে গ্রেড। 'C' কিংবা আরও ভাল গ্রেডেশন হলে টিকে থাকা যাবে কলেজে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে আলাদা করে শিখতে হবে পশুরা হঠাৎ আক্রমণ করলে কি করে অন্যকে এবং নিজেকে বাঁচাতে হয়। সেই কারণেই নিরাপত্তার বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের সব সময় মনে রাখতে হয়।

ওদের আরো শিখতে হয় পশুপাখিদের চিকিৎসা করতে, ওষুধ খাওয়াতে। মনে রাখতে হবে চিড়িয়াখানা বা যেকোনও জায়গার পশুপাখিকে ওষুধ খাওয়ানো এক অতি কঠিন ব্যাপার।

পশুপাখি সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করে তুলতেও শিখতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। এক একটি প্রাণীকে নিয়ে জনসমক্ষে 'শো' করতে যেতে হয় ওদের। প্রতি বসন্তে কলেজের পশুশালায় অনেক মানুষকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা জনসংযোগের কাজটি খুব ভাল করে করতে পারে।

এত সব কাণ্ড করে তবেই হওয়া যায় বাঘ-সিংহদের কোচিং ক্লাসের মাস্টারমশাই। ছাত্রদের প্রতি ওদের মনোযোগ সর্বদা একরকম। ডিগ্রি দেওয়ার দিন ওদের শেষ উপদেশটি দেওয়া হয়। বলা হয় সারা জীবন ভালভাবে চাকরি করার একটাই উপায়—তা হলো চারপেয়ে কিংবা সরীসৃপ অথবা ডানাওয়ালা প্রাণীদের ভালবেসো। ভালবাসার প্রতিদান দেওয়াতে ওরা কিন্তু মানুষের চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে।

ছবি : ভাস্কর মুখার্জি

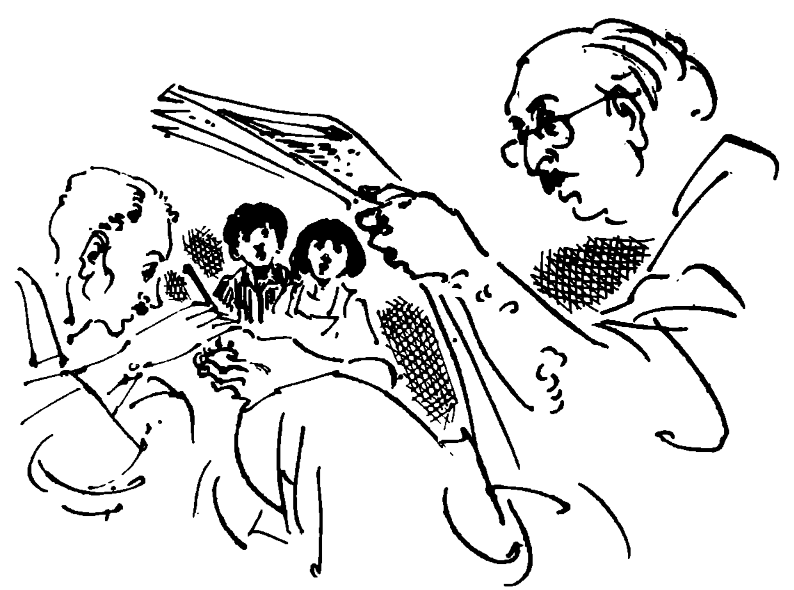

সংস্কার

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত নটা। বাড়ি একদম চুপচাপ। টেবিলে বই রেখে পড়ছিল পিকাই ও টুকাই। সামনেই পরীক্ষা। ভালো ফল না করলে বাবা-মার বকুনি-মার তো আছেই সেইসঙ্গে এ-বছরে দাদুর কাছে পাওয়া পুরস্কারটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। একটু খুলে বলি, এ-বাড়িতে ক্ষুদে পড়ুয়ার সংখ্যা সব মিলিয়ে ছয়। ও ঘরে পড়ছে খেয়া ও বিল্টু আর নিচের তলায় রীতা ও রিন্টু। সবাই ফিবছর পুরস্কার পায় দাদুর কাছে। সব থেকে ভালো করলে তারজন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকে। তাই সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করে ভালো ফল করার।

যে যার ঘরে পড়াশুনা করছিল এমন সময় পিকাই-টুকাই-এর পড়ার টেবিলে ধড়াস শব্দে একচাঁই পলেস্তারা খসে পড়ল। চুনবালি ছিটকে লাগল ওদের চোখ-মুখ-নাকের মধ্যে। বিস্মিত, হতভম্ব দু'ভাই এ-ওর দিকে তাকাল। ভয় পেলেও কিন্তু কিছু বলা যাবে না। এ ঘটনা এ-বাড়িতে নতুন কিছু নয়। বাড়ির বড়রা সব জেনেশুনেও উদাসীন। সারা বাড়িটারই এই হতদ্দশা। গাছ-আগাছায় ভর্তি এদিক-সেদিক, দেওয়ালে ফাটল ধরেছে, কোথাও পাখির বাসা। বাড়ির বড়রা নিজেদের পকেট থেকে টাকা খরচ করবেন এ আশা কম। দাদু একমাত্র ভরসা। ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর তিনিও বড় চুপচাপ থাকেন ইদানীং। বাড়ির ছোটদের সঙ্গেই যা কথাবার্তা বলেন, বড়দের সঙ্গে প্রয়োজন না হলে বলেন না। দাদুর সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য পুরনো চাকর রঘুপতি আছে। সেই দাদুর সবসময়ের সঙ্গী।

রবিবারের সকাল। পরীক্ষা মিটে গেছে তাই পড়াশুনার তাড়া নেই। সকালের জলখাবার খেয়ে বাড়ির পিছনের বাগানে জড়ো হয় পিকাইদের দল। সব ভাই-বোনদের মাঝে পিকাই সব থেকে বড়, তাই সে-ই প্রস্তাবটা দেয়, চল না সবাই মিলে দাদুকে একবার বলি। যেমনি ভাবা অমনি কাজ। সবাই মিলে হাজির দাদুর ঘরে।

দাদু তখন কাগজ পড়ছিলেন। রঘুপতি তাঁর পায়ের নখগুলি কেটে দিচ্ছিল। ওরা কাছে যেতেই দাদু সহাস্যে ওদের আহ্বান জানালেন, কি ব্যাপার, তোমরা? কোনো সমস্যায় পড়েছ মনে হচ্ছে। রীতা সবচেয়ে ছোট, সে দাদুর কাছ ঘেঁষে বলে, তুমি কি করে জানলে দাদু? দাদু নিরুত্তরে শুধু ওদের দিকে চাইলেন। পিকাই এগিয়ে এসে ওদের সমস্যার কথা বলে। বিল্টু যোগ করে, সেদিন দাদাদের পড়ার টেবিলেও চুন-বালি খসে পড়েছিল দাদু। মাথাতেও পড়তে পারতো, গম্ভীর হয়ে বলেন দাদু। আচ্ছা তোমরা এখন যাও, দেখি আমি কি করতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রঘুপতিকে দিয়ে তিন ছেলেকে ডাকালেন দাদু। মা, কাকীমা, জেঠিমার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। ছোটরা গুটিগুটি পায়ে ঘরের বাইরে দাঁড়ায়। ঘরে তখন দাদু বলে চলেছে, আমি তোমাদের ডেকেছি একটি বিশেষ কারণে। তোমরা জানো পেনশনের প্রায় পুরো টাকাটাই আমি সংসারে দিই। এছাড়াও তোমাদের ছোট চাহিদাগুলো আমিই মেটাই। সামনে আমি একটা কাজে নামব ভাবছি। দুইদিনের মধ্যে তোমরা প্রত্যেকে আমাকে ৫০০০ করে টাকা দেবে।

ছেলেরা চুপ। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এলো। তবে বাবার প্রতি ভয়েই হোক বা ভক্তিতেই হোক প্রত্যেকে টাকা এনে তুলে দিলো বাবার হাতে।

এরপর অবাক হওয়ার পালা বাড়ির বড়দের, খুশির জোয়ার ছোটদের মধ্যে। একমাসের মধ্যে রাজমিস্ত্রী ডেকে পুরো বাড়িটাই মেরামত করা হলো। আগাছা নির্মূল করে, রং করে নতুন সাজে সাজল যেন বাড়িটা। বাবা-কাকা-জেঠু অফিস ছুটি নিয়ে হৈ হৈ করে হাত লাগাল জিনিসপত্র সাজাতে। মা, কাকীমা, জেঠিমাও খুশি। রান্নাঘর থেকে তাঁদের হাসির শব্দ ভেসে আসে। ছোটদের সঙ্গে নিয়ে আগামীকাল ১ বৈশাখের দিনটা কেমন কাটাবে তারও পরিকল্পনা হয়ে গেল।

১ বৈশাখের সকালে রঘুপতিকে নিয়ে বাজারে গেলেন দাদু। ফিরে এসে বৌমাদের হুকুম দিলেন, নাতি-নাতনীদের পছন্দমতো পদগুলি রান্না করো। বৌমারাও খুশিমনে ছুটল রান্নার কাজে। সেদিন সারাদিন ঘরে খুশির জোয়ার। সন্ধ্যেবেলায় দাদুর নির্দেশে ছোটবৌমা শোনাল 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ...'। সবশেষে দাদু বলেন, তোরা চিরদিনই মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করিস। কোনো সমস্যা এলে একসঙ্গে সমাধান করবি। দেখবি জীবন কত সুন্দর হয়ে উঠবে, ঠিক আমাদের এই বাড়িটার মতো।

হাসিমুখে বাবার কথায় সম্মতি জানায় ছেলে ও বৌমারা। হাসে বাচ্চারাও। আড়ালে মুখভরা হাসি আর চোখভরা জল নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে রঘুপতি।

ছবিঃ দেবনাথ নন্দী

বিশ্বকাপের জ্বর এখনো ছাড়েনি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

গোল করতে চলেছেন ইংলণ্ডের বেকহ্যাম

বিশ্বকাপের জ্বর কি ছেড়েছে? এত তাড়াতাড়ি কি ছাড়তে পারে! গোটা বিশ্বজুড়ে এখন চলছে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পোস্টমর্টেম। কোন দল কেমন খেলল, বিশ্ববিজয়ী দলের কোন কোন খেলোয়াড় সকলকে চমকে দিয়েছেন, গোল্ডেন বুট কে পেয়েছেন—আলোচনা তো এই সব নিয়েই। তারই মাঝে কখনো-সখনো উঠে আসছে পেলে, মারাদোনা, প্লাতিনি, বেকেনবাউয়ার, পুসকাস, ববি মুর, ইউসোবিওদের নাম। এঁরা ছিলেন বিশ্বকাপের সাড়া-জাগানো খেলোয়াড়। বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসলেই এঁদের নাম ঘুরে ফিরে আসবেই। এবারও এসেছে।

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল অঘটন দিয়ে। বিশ্বকাপের প্রথম খেলায় গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হার মানতে হয়েছিল বিশ্বকাপে নবাগত আফ্রিকার দেশ সেনেগালের কাছে। সেনেগাল সেদিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের থেকে অনেক ভালো খেলেছিল। প্রথমার্ধে ডিওপ দুর্দান্ত গোলটি করার পর জার্সি খুলতে খুলতে সোজা ছুটে গিয়েছিলেন মাঠের বাইরে। ততক্ষণে ছুটে এসেছেন সেনেগালের অন্য খেলোয়াড়রা। ডিওপ তাঁর জার্সিটা মাঠে পেতে দিয়ে তার ওপর নাচতে শুরু করেছিলেন। অন্য খেলোয়াড়রাও তখন সেই জার্সিটার ওপর তালে তালে নাচছেন। বেশিক্ষণ নয়, খুবই অল্প সময়ের জন্যে। ঐ নাচ নাকি ওঁদের জাতীয় প্রথা। তুকও। হাজার হলেও আফ্রিকা তো তুকতাকের দেশ।

আফ্রিকার দেশগুলো বিশ্বকাপের মূল পর্বের গোড়ার দিককার খেলাগুলিতে দারুণ খেলে। সকলকে চমকে দেয়। অঘটন ঘটায়। কোনো কোনো দেশ দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত ওঠে। তারপর আর এগোতে পারে না। এবার যেমন বিশ্বকাপের প্রথম খেলায় গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে সেনেগাল হারিয়ে দিয়েছে, তেমনি ক'বছর আগে দিয়েগো মারাদোনার দল আর্জেনটিনাকে বিশ্বকাপের প্রথম খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল ক্যামেরুন। এই সব অঘটন নতুন কিছু নয়। ব্রাজিলকেও এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছিল। মোটকথা, প্রথম খেলায় আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন দলের পরাজয়, নতুন কিছু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বকাপের আসর থেকেই এই ট্রাডিশান সমানে বয়ে চলেছে।

তবে সেদিন ফ্রান্স নিজের সুনাম বজায় রাখতে পারেনি। জঘন্য খেলেছে। তারা

আর্জেন্টিনার ওর্টেগার পায়ে বল

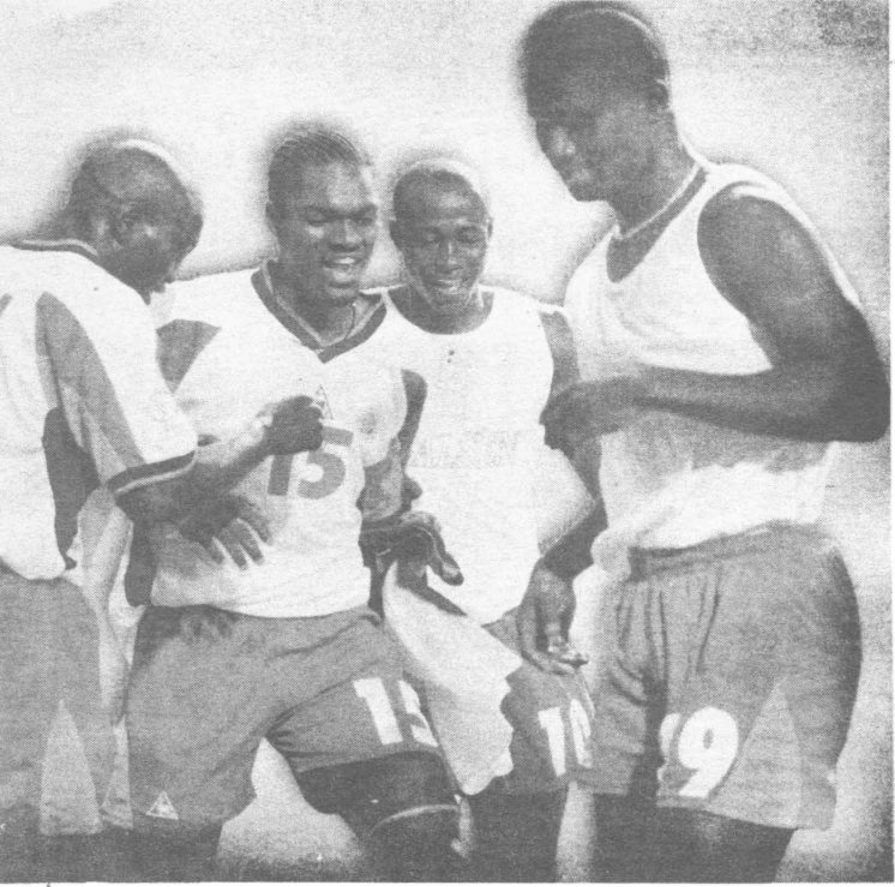

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোল করার আনন্দে নাচছেন সেনেগালের খেলোয়াড়রা

খারাপ খেলেছে শুধু জিদান খেলতে পারেননি বলে! তা কেন হবে? প্রথম খেলায় অমন অঘটন হামেশাই ঘটে। আর্জেনটিনা হেরেছে, ব্রাজিল হেরেছে, উরুগুয়ে হেরেছে। বিশ্বকাপের মজা তো এইটাই। প্রথম খেলায় হেরেও ফাইনালে উঠেছে, চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এমন নজিরও তো একাধিক আছে। কিন্তু অঘটন অঘটনই। প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় সেনেগালের কাছে ফ্রান্সের পরাজয় তাই এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন। যাঁরা বলছেন, জিদান খেলতে পারেননি বলেই ফ্রান্স হেরেছে তাঁরা যদি বিশ্বকাপের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন সেবার বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় মারাদোনা দলে থাকা সত্ত্বেও হার মানতে হয়েছিল আর্জেনটিনাকে তাদের প্রথম খেলায়। পেলের ব্রাজিল দলের ভাগ্যেও একই ব্যর্থতার জ্বালা জুটেছিল। তাই মনে হয়, জিদান দলে থাকলেও তেমন কোনো উনিশ-বিশ হতো না।

এবার আসি সেই সব খেলোয়াড়দের প্রসঙ্গে যাঁরা মাতিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বকাপের আসর অথবা বিশ্বকাপের সময় যাঁদের নাম বারবার সকলের মুখে এসেছে। প্রথমেই **আসবে চার বছর আগের বিশ্বকাপের হিরো** জিনেদিন জিদানের কথা। চার বছর আগে বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে দু' দুটি গোল করেছিলেন তিনি। শুধু গোল করাই নয় খেলেও ছিলেন দুর্দান্ত। তিনি একাই ব্রাজিলের ভাগ্য গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। **খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত খতিয়ান** এবারের বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত।

জিনেদিন জিদান (ফ্রান্স)

জিদানের জন্ম : ২৬ জুন ১৯৭২

ক্লাব : রিয়েল মাদ্রিদ

ফ্রান্সের পক্ষে ৬৯টি ম্যাচ খেলে ১৮টি গোল করেছেন।

মাইকেল ওয়েন (ইংলন্ড)

ওয়েনের জন্ম : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯

ক্লাব : লিভারপুল

ইংলন্ডের পক্ষে ৩২টি ম্যাচ খেলে ১৪টি গোল করেছেন।

লুইস ফিগো (পর্তুগাল)

ফিগোর জন্ম : ১১ এপ্রিল ১৯৭২

ক্লাব : রিয়েল মাদ্রিদ

পর্তুগালের পক্ষে ৭৯টি ম্যাচ খেলে ২৭টি গোল করেছেন। ফিফা ও ইউ ই এফ-এর নির্বাচনে ২০০১ সালে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছিলেন।

জুয়ান সেবেস্টিয়ান ভেরন (আর্জেনটিনা)

জন্ম : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

ক্লাব : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

আর্জেনটিনার পক্ষে ৪৭টি ম্যাচ খেলে ৭টি গোল করেছেন।

২০০১ সালে লাজিও থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যাবার জন্যে ৫৫ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছিল।

গ্যাব্রিয়েল ওমর বাতিস্তুতা (আর্জেনটিনা)

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ক্লাব : এ এস রোমা

আর্জেনটিনার পক্ষে ৭৪টি ম্যাচ খেলে ৫৫টি গোল করেছেন। ১৯৯৮ সালে গোল করার ব্যাপারে ভেঙে দিয়েছিলেন দিয়েগো মারাদোনার রেকর্ড।

রাউল গঞ্জালেজ (স্পেন)

জন্ম : ২৭ জুন ১৯৭৭

ক্লাব : রিয়েল মাদ্রিদ

স্পেনের পক্ষে ৪০টি ম্যাচ খেলে ১৮টি গোল করেছেন। ২০০১ সালে স্পেনের সব থেকে জনপ্রিয় খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন।

ফিগো

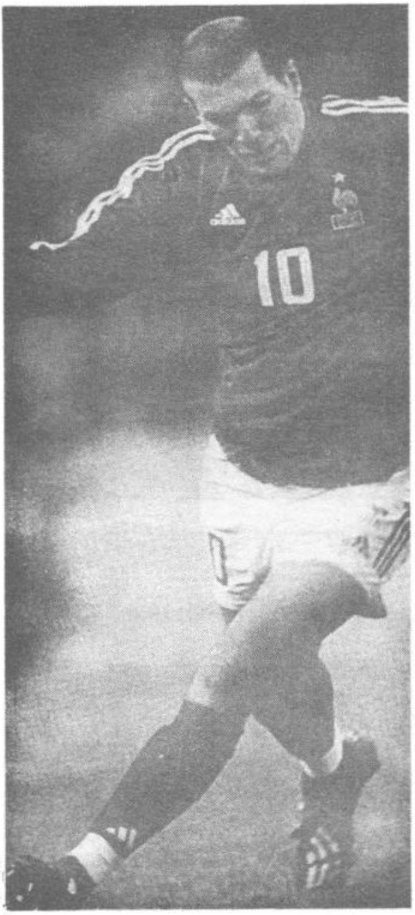

রোনাল্ডো (ব্রাজিল)

জন্ম : ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

ক্লাব : ইন্টার মিলান

ব্রাজিলের পক্ষে এ পর্যন্ত ৫২টি গোল করেছেন। ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়াড়—১৯৯৬, ইউরোপিয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার—১৯৯৭।

রিভাল্ডো (ব্রাজিল)

জন্ম : ১৯ এপ্রিল ১৯৭২

ক্লাব : বার্সিলোনা এফ সি

বিশ্বকাপে ৭টি ম্যাচ খেলে ৩টি গোল করেছেন।

১৯৯৯ সালে তিনি ইউরোপিয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার হয়েছিলেন। ব্রাজিলের পক্ষে ৫৪টি ম্যাচ খেলে ২৮টি গোল করেছেন।

দেল পিয়েরো (ইতালি)

জন্ম : ৯ নভেম্বর ১৯৭৪

ক্লাব : জুভেন্তাস

দেশের পক্ষে ৪৬টি ম্যাচ খেলে ১৬টি গোল করেছেন। ১৯৯৮ সালের চ্যাম্পিয়ন'স লীগে একা ১৯টি গোল করে নতুন নজির গড়েছিলেন।

প্যাট্রিক ভিয়েরা (ফ্রান্স)

জন্ম : ২৩ জুন ১৯৭৬

ক্লাব : আর্সেনেল

দেশের পক্ষে ৪৭টি ম্যাচ খেলেছেন। গোল দিয়েছেন ২টি।

এখন লড়াই ইংলন্ডে

আগামী বছর গোড়ার দিকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তারই প্রস্তুতি চলছে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব জুড়ে। প্রত্যেকটি দেশই এ ওর সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ভারতীয় দল এখন ইংলন্ডে গিয়ে খেলছে। দু' দেশের মধ্যে চারটি টেস্ট ম্যাচ ছাড়াও হবে একটি ত্রিদেশীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ভারত-ইংলন্ড ছাড়া খেলবে শ্রীলঙ্কা। আগেই বলেছি, এ সবই বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের তৈরি করে নেওয়া।

গত দু' বছরের মধ্যে ভারতীয় দলের চেহারা একদম বদলে গেছে। দলে এখন নতুন মুখের ছড়াছড়ি। তাঁরাই নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। কারণ তাঁরা জানেন, জাতীয় দলে তাঁদের সুযোগ পাবার পেছনে আছে দলপতি সৌরভ গাঙ্গুলির অবদান। তিনিই একরকম জোর করে, নির্বাচকদের সঙ্গে লড়াই করে তরুণ খেলোয়াড়দের দলে আনছেন। জোর করে খেলাচ্ছেন। তার ফল তো ভালোই হয়েছে। যুবরাজ সিং, আশিস নেহরা, জাহির খান, দীনেশ মঙ্গিয়া, বীরেন্দ্র সহবাগ, অজয় রাতরা, হরভজন সিং, টিনু জোহাননরা সকলেই দলে এসেছেন সৌরভের জন্যে। তাই দলনেতার জন্যে তাঁরা সব কিছু করতে পারেন। ফলে টিম স্পিরিট বেড়ে গেছে। গোটা দল এককাট্টা হয়ে খেলছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলনেতা সৌরভ গাঙ্গুলি 'ম্যান অফ দ্য সিরিজ' হওয়ায় দলের ওপর তাঁর প্রভাব যথেষ্ট বেড়ে গেছে। যে রবি শাস্ত্রীরা কিছুদিন আগেও সৌরভের নামে ঘটি ঘটি জল খেতেন, তাঁরাই এখন সৌরভের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমনকী ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক কার্ল হুপারও ভারতীয় দলপতির প্রশংসা করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে কলকাতায় ফিরেই

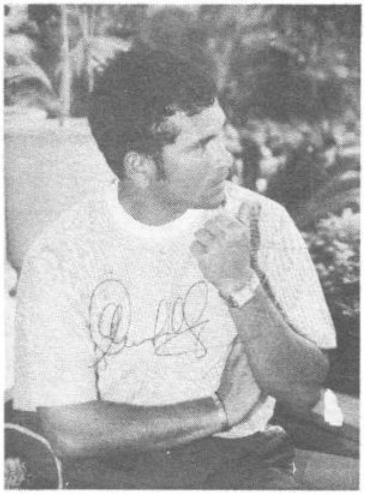

সৌরভ বলেছিলেন তাঁর সব চিন্তা এখন বিশ্বকাপ নিয়ে।

তা ভারতীয় দলটি যেভাবে ধীরে ধীরে এককাট্টা হয়ে উঠছে তাতে বিশ্বকাপে ভালো না খেলার কোনো কারণ নেই। দলে শুধু দরকার আরও বেশি অলরাউন্ডার। তাহলেই বোলিং-এ বৈচিত্র্য এসে যাবে। এই ব্যাপারে ভারত একটু উন্নতি করতে পারলে বিশ্বকাপে ভালো না খেলার কোনো কারণ নেই। আর একটা বিষয়, ভারতীয় দলটি বড় বেশি শচীন-সৌরভ নির্ভর হয়ে পড়েছে। গোড়ার দিকে ব্যাটিং-এ ধস নামলে মাঝের সারির কিংবা শেষের দিককার খেলোয়াড়রা রুখে দাঁড়িয়ে ইনিংসটিকে আগে বাড়াতে পারেন না। এই দুর্বলতার দিকে রাইট সাহেব যে এতদিন কেন নজর দেননি সেইটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

একদিনের ক্রিকেটে সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করে অলরাউন্ডারদের ওপর। ১৯৮৩ সালে কপিলদেবের নেতৃত্বে যে দলটি বিশ্ববিজয়ী হয়েছিল সেই দলে কতজন অলরাউন্ডার ছিলেন ভাবলে অবাক লাগে। কপিল নিজে ছিলেন, ছিলেন মহিন্দর অমরনাথ, মদনলাল, রজার বিনি, সন্দীপ পাটিল এমনকী উইকেটরক্ষকও ছিলেন পাকা ব্যাটসম্যান। সৌরভের দলে সেই অর্থে অলরাউন্ডার কিন্তু একজনও নেই। এক যদি সৌরভ-শচীনকে অলরাউন্ডার বলা হয় তাহলে আলাদা। অজিত আগারকারকে অলরাউন্ডার বলে চালানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁর ব্যাটে রান কোথায়?

ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর এখন ইংলন্ডে গিয়ে ফাস্ট পিচে খেলছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটও কিন্তু এইরকমই ফাস্ট। ভারতে পিচের চরিত্র না বদলালে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিদেশে গিয়ে কিছুতেই ভালো খেলতে পারবেন না। দু-একজন ভালো খেলবেনই। তাই দিয়ে আর যাই হোক বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় জেতা যায় না। এই সরল সত্যটা যতদিন না ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তাদের মাথায় ঢুকছে ততদিন ১৯৮৩ সালের পুনরাবৃত্তি হবে বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, ইংলন্ডের মাঠে সৌরভ-বাহিনী এখন কেমন খেলছে সেইটাই বরং দেখা যাক।

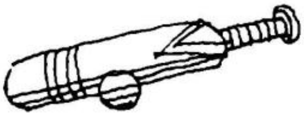

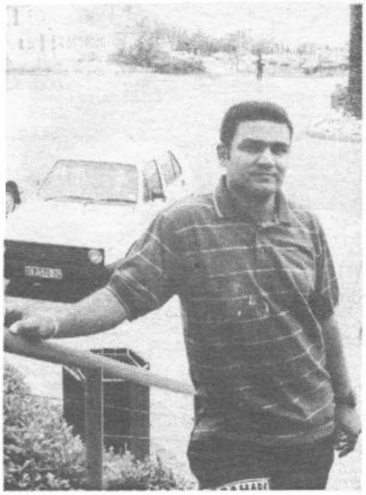

বীরেন্দ্র সহবাগ

স্পোর্টস কুইজ

(প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। তিনটি ভুল। একটি ঠিক। উত্তর ৪৫ পাতায়।)

প্রশ্ন ঃ

১. ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল পর্বে খেলার সুযোগ পেয়েও ভারত কেন নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল?

ক. বিশ্রীভাবে হেরে যাবার ভয়ে
খ. ভিসা পায়নি বলে
গ. খালি পায়ে খেলতে দেওয়া হবে না
ঘ. নিরামিষ খাবার দেওয়া হবে না

২. ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দল ইতালি দীর্ঘ ১২ বছর নিজেদের কাছে জুলে রিমে ট্রফিটি রেখেছিল—কেন?

ক. ফেরত দিতে অস্বীকার করেছিল
খ. মুসোলিনি ট্রফিটি রেখেছিলেন
গ. ১৯৫০ সাল পর্যন্ত খেলা হয়নি বলে
ঘ. ট্রফিটি হারিয়ে গিয়েছিল

৩. ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ফরাসি রেফারি মিচেল ফ্যানট্রট ইতালি-আর্জেনটিনার ম্যাচে ৮ মিনিট বেশি সময় খেলিয়েছিলেন। পরে তিনি কী বলেছিলেন?

ক. তাঁর ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল
খ. সেই খেলায় অনেক সময় নষ্ট হয়েছিল
গ. ইতালির মাফিয়াদের ভয়ে
ঘ. ঘড়ি দেখতেই ভুলে গিয়েছিলেন

৪. ব্রাজিলের ডাকসাইটে খেলোয়াড় রিভাল্ডোর আসল নাম কি?

ক. ভিক্টর বোরবা ফেরিরা
খ. পেপিনো মিয়েজা
গ. আরনেস্ট জিয়ান জোসেফ
ঘ. নসিমেন্টো

৫. ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে আরব এমিরেটস ২টি গোল করেছিল। প্রতিটি গোলের পর খেলোয়াড়দের আনন্দ দেখে মনে হয়েছিল তাঁরা যেন বিশ্বকাপই জিতে গেছেন। কেন?

ক. রোলস রয়েস গাড়ি পাবেন বলে
খ. ইউরোপিয় লীগে খেলতে পাবেন ভেবে
গ. হিরোর সম্মান পাবেন বলে
ঘ. প্রচুর ধনসম্পদ পাবেন বলে

উক্তি

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সব থেকে বড় মজা বা আকর্ষণ হলো অঘটন। অঘটনই বিশ্বকাপ ফুটবলকে উত্তেজনায় টানটান করে রাখে। অঘটন ছাড়া কি কোনো প্রতিযোগিতা জমে?

পেলে

(বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে)

ভারত বিশ্বকাপে খেলবে? পঞ্চাশ বছর না একশ বছরেও হবে না। ফুটবল খেলা এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু পিছিয়েই পড়ছি। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা হয়ে ব্যাক ডোর দিয়ে মূল পর্বে আর কেউ খেলতে পারবে না। সকলকেই এবার থেকে যোগ্যতা অর্জন করে মূল পর্বে খেলতে যেতে হবে।

শৈলেন মান্না

(বিশ্বকাপ ফুটবল ও আমরা—প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে)

আমার পছন্দের দল ব্রাজিল। হ্যাঁ, আমি ব্রাজিলের গোঁড়া সমর্থক। সব খেলা দেখতে ভালো লাগে। চান্স যখন পেয়েছি তখন কিছুদিন আরাম করে খেলা দেখে নিই। তারপর তো আবার 'সাত সাগর, তের নদীর পারে' যেতে হবে।

সৌরভ গাঙ্গুলি

(ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে কলকাতায় ফিরেই বিমান বন্দরে)

আর হাসাহাসি নয়। অনেক হয়েছে। আর্জেনটিনিয়দের বলি,এবার তোমরা অন্য খেলোয়াড়কে দেখতে পাবে। তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবে।

বেকহ্যাম

(বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে বলতে গিয়ে)

বেকহ্যামদের মতো খেলা দুরের কথা, ফুটবল আকাদেমি না গড়লে আমরা এশিয়মানেও পৌঁছুতে পারব না। শুনতে খারাপ লাগলেও এইটাই সত্যি।

সুব্রত ভট্টাচার্য

(বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কলকাতার ফুটবল নিয়ে বলতে গিয়ে)

স্পের্টস কুইজের উত্তর ঃ

১. খালি পায়ে খেলতে দেওয়া হবে না বলে।
২. ১৯৫০ সাল পর্যন্ত খেলা হয়নি বলে।
৩. ঘড়ি দেখতেই ভুলে গিয়েছিলেন।
৪. ভিক্টর বোরবা ফেরিরা।
৫. রোলস রয়েস গাড়ি পাবেন বলে।

ফুটবল খেলার ইতিকথা

সন্তোষ কুমার বেরা

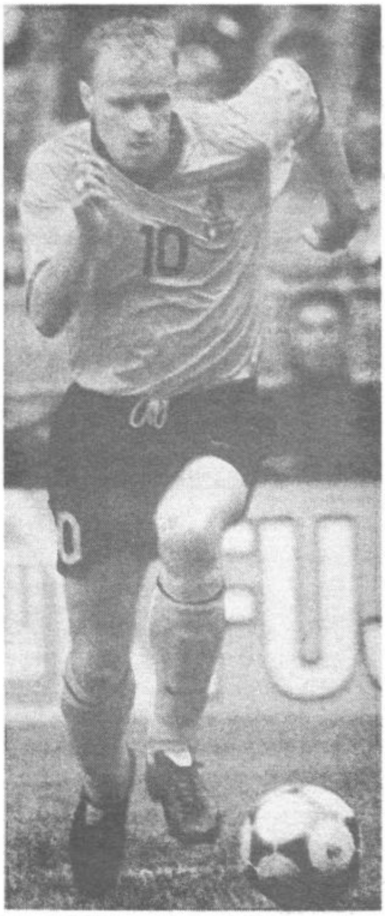

সঠিক কবে থেকে বা কোথা থেকে ফুটবল এল তা বলা শক্ত। তবে ইতিহাসবিদদের বিশ্বাস খ্রিঃ পূঃ ২০৬ অব্দে চীনে ফুটবলের প্রচলন ছিল। সে সময় চীনে শাসন করতেন হান বংশীয় রাজারা। তখন গোলপোস্ট ছিল ত্রিশ ফুট উঁচু। গোলে সিল্কের জাল ব্যবহৃত হতো। সম্রাট চেং লি ছিলেন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়।

প্রাচীন চীনে ফুটবল কতটা সমাদৃত ছিল তা লী য়ু নামে এক ছড়াকারের ছড়া থেকেই বোঝা যায়—

'গোলাকার বল আর আয়তাকার ক্ষেত্র
দুই দল মুখোমুখি যেন যুদ্ধক্ষেত্র
বলটি উড়ছে দেখ আকাশের চন্দ্র
প্রতিদলে দলপতি যে যাহার স্থানে
এর যেন আন নেই ছড়াকার ভনে
এ খেলা এমন খেলা জ্ঞাতি নাহি মানে
এমনকি পক্ষপাত নেই কারও মনে
দৃঢ় মনে ধৈর্য নিয়ে করিতেছে খেলা
হারিলেও রাগ নেই বলে ফুটবল খেলা।'

এদিকে গ্রীক এবং রোমানরাও পিছিয়ে রইল না। তারা তাদের মতো করেই উদ্ভাবন করল খেলাটি। নর্মানরা 'সুলে' নামে ফুটবলের মতো এক ধরনের খেলা খেলত ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাদের ইংলন্ড বিজয়ের সময়। সপ্তম শতকে জাপানীরা 'কেমরি' নামে ফুটবলের মতোই এক খেলা খেলত। চতুর্দশ শতকে ফ্লোরেন্সে 'ক্যালশিও' নামে খেলাটিও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধুনিক ফুটবলের জনক হিসেবে নাম কিনল অবশ্য ইংলন্ডই। জনশ্রুতি আছে ড্যানিশদের হটিয়ে দিয়ে স্যাক্সনরা ড্যানিশ দলপতির মাথা নিয়ে তাৎক্ষণিক খেলা খেলেছিল। যাই হোক ২১৭ খ্রিস্টাব্দের এক মঙ্গলবার ব্রিটিশ

যোদ্ধারা রোমানদের পরাজিত করে প্রথম ফুটবল খেলেছিল।

প্রথমদিকে ফুটবলের কোনো নিয়মকানুন ছিল না। খেলার সময় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে ঘুঁষোঘুঁষিও চলত। ক্রমে খেলোয়াড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। গোলপোস্টের দূরত্বও বাড়ল। এমনকি সকলকে একই মাঠে খেলানোর জন্য কয়েক মাইল ব্যবধানে গোলপোস্ট বসানো হলো। হৈ-হল্লা হট্টগোল এই ছিল খেলার বৈশিষ্ট্য।

সব দেখেশুনে ইংলন্ডের রাজা বেজায় রেগে উঠলেন। ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় এডওয়ার্ড ঘোষণা করলেন শহরের মধ্যে ফুটবল খেলা চলবে না। আদেশনামা জারি করে বললেন, ‘যেহেতু শহরে বিশাল গোলমাল হয়, এই খেলা থেকে নানান বিপদ ঘটতে পারে তাই আদেশ দিচ্ছি ভবিষ্যতে ফুটবল খেলা শহরে অনুষ্ঠিত হলে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।’

১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে অনুরূপ আদেশ জারি করলেন রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড, ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রিচার্ড এবং ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে রাজা চতুর্থ হেনরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ক্রীড়ামোদি জনসাধারণ এইসব আদেশকে অগ্রাহ্য করেছিল। স্কটল্যান্ডের ফুটবল খেলায় অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় জেমস ফুটবল খেলাটিকেই আদেশবলে নিষিদ্ধ করে দিলেন।

খেলাটির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন স্যার টমাস এলিয়ট নামে এক বিখ্যাত শিক্ষাবিদও। তিনি বলেছিলেন, ফুটবল খেলা পাশবিক উল্লাস ও ব্যাপক হাঙ্গামা ছাড়া কিছুই নয়। সুবিখ্যাত লেখক ফিলিপস্ স্টাবিজ লিভারপুলে অনুষ্ঠিত খেলা দেখে ক্রোধে নীল হয়ে বলটিকেই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এখানেই হিংসা ঈর্ষা বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ অসন্তোষ শত্রুতা এসব জন্মলাভ করে। এমনকি বিবাদ কলহ হত্যা নরহত্যা যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তক্ষয়ের শিক্ষা দেয় এই খেলা।

যে যাই বলুন না কেন ফুটবল খেলার উন্মাদনা কিন্তু ততদিনে মানুষের মজ্জায় প্রবেশ করেছে। উনবিংশ শতকে এই খেলা সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিল। ধীরে ধীরে স্কুলের গণ্ডির ভেতর ঢুকে পড়ল খেলাটি। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ল স্কুল থেকে স্কুলে। শুরু হলো আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র খেলার একটা নীতি নির্ধারণ করল। সেই নীতি সংশোধন করে ফুটবল খেলার প্রথম লিখিত নিয়ম চালু হলো ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। এরপর গড়ে উঠল ফুটবল সংস্থা। প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হলো ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ ইংলন্ডে। প্রথম টিকিট কেটে খেলা দেখা শুরু হলো। খেলাটি ছিল চ্যালেঞ্জ কাপের খেলা। টিকিটের দাম এক শিলিং। খেলায় ওয়ান্ডারার ক্লাব রয়েল ইঞ্জিনিয়ারদের ১-০ গোলে পরাজিত করল।

সেই বছরই ফুটবলের প্রথম আন্তর্জাতিক খেলাটি হয়। ইংলন্ড বনাম স্কটল্যান্ড। খেলার ফলাফল ছিল ০-০। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ৪৩টি ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফুটবল খেলার ইতিহাসে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই পেশাদারি ফুটবলের আইন চালু হলো। খেলোয়াড়রা এবার খেলাটিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অধিকৃত বিভিন্ন দেশে ফুটবল ছড়িয়ে পড়ল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদ, ব্যবসায়ী এবং দক্ষ শ্রমিকেরা গিয়ে বসবাস শুরু করল। কাজের ফাঁকে তারা ফুটবল খেলায় উৎসাহিত করতে লাগল সেই সব দেশের লোকেদের। সেখানকার জনগণও বিপুল উদ্দীপনায় তা গ্রহণ করল।

ফুটবল দ্রুত প্রসার লাভ করল সুদূর ব্রাজিল, আমেরিকা এবং রাশিয়ায়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ নাবিকেরা রানী ইশাবেলার সম্মানে এক প্রদর্শনী খেলা খেলল ব্রাজিলে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায়, ১৮৭৫-এ পর্তুগালে এবং ১৮৯১-তে প্রথম সুইডেনে ফুটবল এল।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এক ওলন্দাজ ব্যবসায়ী আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাব মতো ওই খ্রিস্টাব্দের ২১ মে ফ্রান্স, ডেনমার্ক, স্পেন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে ফিফা বা ফেডারেশন ইন্টারন্যাশন্যাল দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুললেন। প্রথম সভাপতি হলেন গেরিন নামে এক ফরাসী।

আশ্চর্যের বিষয় ফুটবলের স্রষ্টা দেশ ইংলন্ড বাদ পড়ে গেল। ইংলন্ড ছাড়াই ফিফা সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করতে লাগল। ফুটবল ওলিম্পিকের সূচনা হলো ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। বিপুল সমর্থনে ব্রিটেন ডেনমার্ককে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রথম সোনার পদকটি দেশে তুলে রাখল।

১৯২০-তে ফিফার সভাপতি জুলে রিমে, হেনরি ডেলুনে এবং হিডগো মিশেলের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক স্তরে ফুটবল খেলা নিয়মিত করার প্রস্তাব দিলেন। সেই প্রস্তাব ১৯৩০ সালে অনুমোদিত হলো। জন্ম হলো বিশ্বকাপ ফুটবলের।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ‘The Mad. Bad Origins of Soccer’—Sumit Dutta ‘The Gentleman’ June ’90.

উঠছে যারা

বীরু বসু

চন্দননগর স্টেশন থেকে জারুরা গ্রামের দূরত্ব তিন মাইল। হাঁটা পথে আধঘণ্টা সময় লাগে। একমাত্র সাইকেল ছাড়া আর কোনওরকম যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। গ্রামটির চারধারে পুকুর আর বাঁশঝাড়। জনসংখ্যা অধিক হলেও গ্রামের অধিকাংশই চাষী। সুতরাং সরস্বতী, রাজেশ্বরী এবং বনশ্রী দাসের পরিচয় ওরা চাষীর মেয়ে। বাবা মহাদেব দাস। প্রাক্তন জাতীয় কবাডি খেলোয়াড়। সম্প্রতি রাজ্য কবাডি সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে প্রশংসা-পত্র পেলেও গ্রামের চাষী মহাদেববাবুর কাছে তা অর্থহীন। বয়স বেড়ে ওঠায় তাঁর একার পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মেজো মেয়ে রাজেশ্বরী ও ছোট মেয়ে বনশ্রীকে বাবার সঙ্গে হাত লাগাতে হচ্ছে। সংসারের অভাব-অনটনকে সামাল দিতে দাস পরিবারের সকলকেই এখন চাষের কাজে সময় দিতে হচ্ছে। মাত্র এক হাজার টাকা উপার্জন করার জন্যই সম্পূর্ণ সংসারটাকে চাষের কাজে বেঁধে ফেলেছেন চুয়ান্ন বছরের বৃদ্ধ মহাদেব দাস।

অভাব-অনটনে মহাদেববাবু ক্লান্ত হয়ে পড়লেও বড় হওয়ার প্রবল ইচ্ছা কিন্তু মেয়েদের দমাতে পারেনি। কষ্টই যে ওদের চিরসাথী এই সত্যটা এতদিনে ওরা জেনে গেছে। সে কারণেই রোদে-জলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার পরও ওরা বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। আর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মতো ওরাও ভাল কিছু করতে চায়, এ ব্যাপারে বাবা-মায়ের পূর্ণ সমর্থন আছে। বড় মেয়ে সরস্বতী চন্দননগর খলিসানী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক দেবে। বাকি দুই মেয়ে রাজেশ্বরী এবং বনশ্রী বেছে নিয়েছে খেলাধুলো। টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক কিংবা সাঁতার, এই ধরনের কোনো খেলাই কিন্তু ওদের মন ভরাতে পারেনি। ওদের ভাল লাগে কবাডি খেলা। আসলে বাবার অবস্থা দেখে ওরা বুঝে গেছে খেলার পিছনে পয়সা খরচ করার মতো সামর্থ্য ওদের নেই। ওদের আছে শারীরিক শক্তি। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওরা দুই বোন গত কয়েক বছর ধরে কবাডি খেলে আসছে।

রাজেশ্বরী ও বনশ্রী দাস

কবাডি খেলায় ওদের হাতেখড়ি হয় চন্দননগর মনসা সমিতিতে। ওদের প্রশিক্ষক প্রাক্তন কবাডি খেলোয়াড় জগবন্ধু সাঁতরা। এর আগে জাতীয় স্কুল গেমসে খেললেও আন্তঃজেলা মহিলা কবাডিতে এবারই ওরা প্রথম। সম্প্রতি হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মাহেশ কলোনিতে যুব কিশোর সংঘ ও শুকতারা সব পেয়েছির আসর-এর পরিচালনায় মাস্টারদা সূর্য সেন স্মরণে এই কবাডি প্রতিযোগিতাটির আয়োজন হয়েছিল। জেলা স্তরে অন্যান্য খেলাগুলোর যখন নাভিশ্বাস উঠেছে ঠিক তখনই কবাডিতে বছরের সেরা উপহারটি কেড়ে নিতে পেরেছে হুগলির মেয়েরা। রীতিমতো সেরা প্রাপ্তি। কারণ কবাডিতে হুগলির মেয়েরা এতদিন পিছিয়ে ছিল। আজ থেকে ছ'বছর আগে উঃ ২৪ পরগনা জেলার সোদপুরে তারা প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তারপর থেকে চ্যাম্পিয়ন শব্দটা তাদের কাছে অধরাই থেকে গেছে। সেই খরা কাটিয়ে এবারের ৭ম আন্তঃজেলা কবাডিতে হুগলি ফের চ্যাম্পিয়ন হলো। জয়ের অন্যতম দুই কাণ্ডারী রাজেশ্বরী দাস ও বনশ্রী দাস প্রমাণ করেছে তারাই এখন জেলার সেরা।

অসংখ্য মানুষ তাদের খেলা দেখে তৃপ্তি পেয়েছেন। যেমন তৃপ্তি পেয়েছেন যাঁরা এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে আমন্ত্রণমূলক কবাডি খেলা দেখতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কবাডি সংস্থার মাঠে গিয়েছিলেন। এই আমন্ত্রণমূলক খেলার মূল আকর্ষণ ছিল জাপানের দলটি। কিন্তু আট দলের খেলায় জাপানের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। কোনো অর্থেই কোর্টে সুস্থভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি জাপানের মেয়েরা। একের পর এক হানা দিয়ে মনসা সমিতির মেয়েরা তাদের হারিয়ে দিয়েছে। খেলার শেষে জাপানের কোচ স্বীকার করে গেছেন এই পরাজয় রাজেশ্বরী ও বনশ্রীর জন্য। হুগলির দুই কন্যা যদি কোর্টে না খেলত তাহলে জাপানের জয় সুনিশ্চিত ছিল।

এই কথার রেশ ধরে বলা যেতে পারে বাংলার কবাডিতে রাজেশ্বরী এবং বনশ্রীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। দুই বোনের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য মিল। দেখতে এতই একরকম যে চেনা মুশকিল হয়ে ওঠে। কে বড় কে ছোট তা ওদের জার্সি নম্বর না দেখে বোঝা যাবে না। কথাবার্তায় সপ্রতিভ। লেখাপড়ায় ভাল। চন্দননগর ন'পাড়া গার্লস হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী রাজেশ্বরী। ছোট বোন বনশ্রী জারুরা গার্লস হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। দু'জনেরই কোচ জগবন্ধু সাঁতরা। দু'জনেরই লক্ষ্য কবাডি খেলায় নিজেদের সাফল্য মেলে ধরা। এখন প্রশ্ন হলো শুধুমাত্র একটি চাকরির আশা সামনে রেখে জারুরা গ্রামের যে দুটি মেয়ে কবাডি খেলছে, তাদের সে আশা কি আগামী দিনে পূরণ হবে? এ ব্যাপারে ওদের মা ললিতাদেবী এবং মামা সনাতনবাবু বিশেষ চিন্তিত। কর্মকর্তারা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখবেন তো?

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

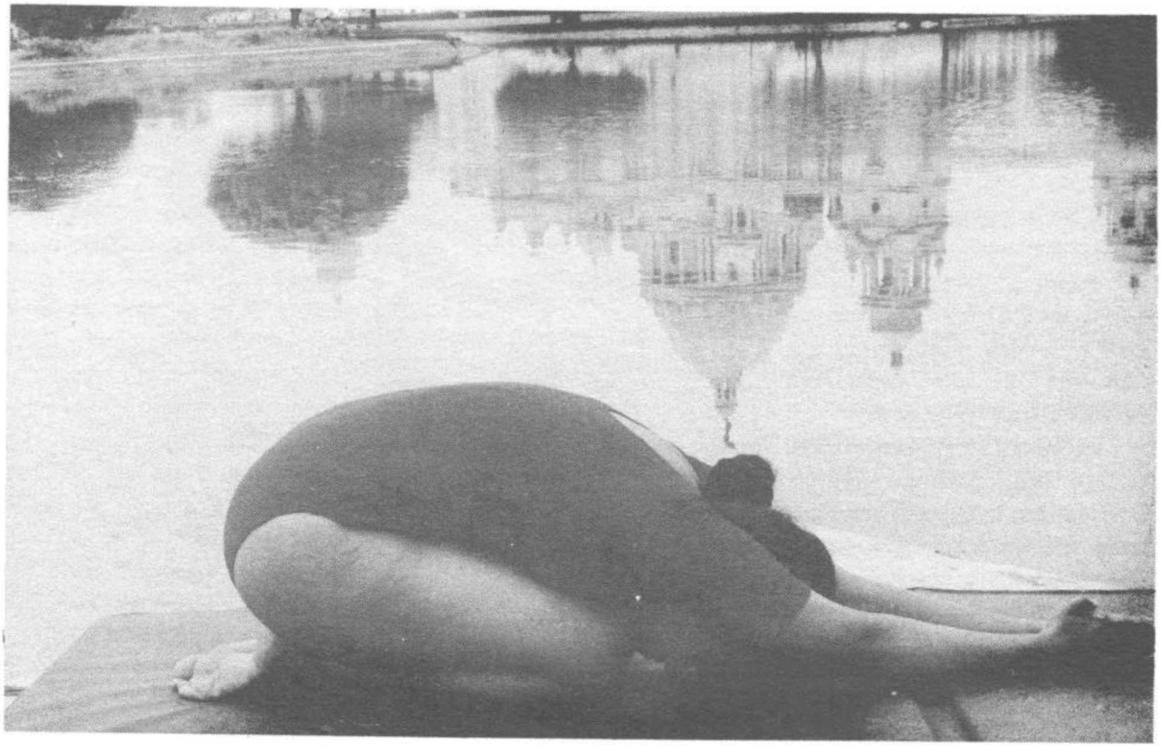

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা, ব্যায়াম, সাঁতার যে কোনো ধরনের শরীরচর্চা করলে অনেক রোগ-জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। শরীরের গঠনও সুন্দর হবে। এখন থেকেই শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে তুললে ভবিষ্যতে এর সুফল পাবে। ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। সুন্দর খেলার সঙ্গে খেলোয়াড়দের সুগঠিত শরীরও নিশ্চয় নজরে পড়েছে। এই সুন্দর শরীরের মূলমন্ত্রই হচ্ছে নিয়মিত খেলাধূলা ও শরীরচর্চা। এখন বর্ষাকাল। জল সম্বন্ধে খুব সচেতন হবে। যেখানে সেখানে জল খাবে না। যাদের পেটের অসুখের প্রবণতা রয়েছে তারা জল ফুটিয়ে খাবার অভ্যাস গড়ে তোল। প্রয়োজন হলে স্টুলের রুটিন পরীক্ষা করে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাও। তবে খেয়াল রেখ বারোমাস ওষুধ খেয়ে পেট ভাল রাখা যাবে না। এর জন্য চাই খাদ্য ও জল সম্বন্ধে সচেতনতা, আর চাই আসন ও প্রয়োজনীয় ব্যায়াম অভ্যাস করা।

অর্ধকূর্মাসন ঃ বজ্রাসনে বসে শ্বাস নিতে নিতে দু'হাত পাশ দিয়ে মাথার উপর তোল। এইবার মেরুদণ্ড সোজা রেখে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে শরীরের উর্ধ্বাংশ অর্থাৎ কোমর থেকে উপরের অংশকে সামনের দিকে নামাও ছবির মেয়েটির মতো। কপাল, দুই কনুই ও হাতের আঙুল মাটিতে লেগে থাকবে। লক্ষ্য রেখ গোড়ালি দুটির সঙ্গে পাছা আর পেট ও বুকের সঙ্গে উরু দুটি যেন লেগে থাকে। প্রথম প্রথম এভাবে লেগে না থাকলে বা কপাল মাটিতে না লাগলে জোর করে করবার চেষ্টা করবে না। প্রয়োজনে হাঁটুর সামনে একটি বালিশ রেখে তাতে কপাল রাখ। এই অবস্থায় ১৫/২০ সেকেন্ড স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস রাখ, পরে চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—অর্ধকূর্মাসন মেরুদণ্ডকে সোজা ও নমনীয় রাখে। কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয়, অম্বল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ এবং পায়ের হাঁটুর, কাঁধ ও হাতের সন্ধিস্থলের বাতজনিত ব্যথা দূর করে।

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

আমাদের স্যার

তখন আমরা স্কুলে একটু উঁচু ক্লাশে পড়তাম। প্রত্যেক বছর গরমের ছুটির আগের দিন আমরা সবাই মিলে ক্লাশটিচার এবং অন্য শিক্ষকদের মিষ্টিমুখ করাতাম। ফুলের তোড়া উপহার দিতাম। সেই জন্যে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চাঁদা দিতাম। বাহারি পাতা, ফুল, রঙিন কাগজ দিয়ে আমরা আমাদের ক্লাশটিকে সাজাতাম। ধূপ আর ফুলের গন্ধে সারা স্কুল সেদিন ম ম করত। এই ব্যাপারে ক্লাশের প্রত্যেক ছাত্র ছিলাম সমান উৎসাহী। ক্লাশ শুরু হবার আগেই আমরা কাজ শেষ করে ফেলতাম। তারপর ক্লাশের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম স্যাররা আসার অপেক্ষায়। সেদিন মনে হতো, আমরা যেন হঠাৎই বড় হয়ে গেছি। শিক্ষক মহাশয়রা খুশি হয়ে আমাদের সেদিন প্রাণভরে আশীর্বাদ করতেন।

একবারের কথা আমার আজও মনে আছে। সেদিন শ্রেণীশিক্ষক সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে আমাদের শুনিয়েছিলেন ওঁর ছাত্র-জীবনের কথা। আমরা জানতাম না, উনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ছাত্রাবস্থাতেই উনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এর জন্যে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা, অনেক লাঞ্ছনা। শত অত্যাচারেও মনের জোর হারাননি তিনি। অদম্য ইচ্ছা, ধৈর্য আর আন্তরিকতা তাঁকে শিক্ষাজগতে বিশেষ স্থান এনে দেয়। অন্য কোথাও না গিয়ে তিনি স্কুলের শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করেন।

ওঁর কথা শুনে আমাদের মন গর্বে ভরে উঠেছিল। উনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ওঁর কথা আজও আমরা কেউ ভুলতে পারিনি।

সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১ এ, ব্যানার্জি পাড়া রোড, পোঃ-তালপুকুর, ব্যারাকপুর,
উঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩ ১৮৭

ছায়ায় মায়ায়

বৈশাখ সংখ্যায় শুকতারায় সঞ্জীব কুমার দের গল্প 'ছায়ায় মায়ায়' খুব ভালো লেগেছে। অনেকদিন পরে একটা সত্যিকারের ভালো গল্প পড়লাম।

সুধাংশু, তনুশ্রী, বিদ্যুৎ ও দিদা

(বি-৩১৭, সি আর পার্ক, নতুন দিল্লি-১১০ ০১৭)

দুঃখী রাজকুমার

বৈশাখ সংখ্যায় অনীশ দেবের 'দুঃখী রাজকুমার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হালখাতার খাওয়া-দাওয়া' ভীষণ ভালো লেগেছে। হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল তো ভালো লাগেই। দুঃখী রাজকুমারের মতো গল্প আরও ছাপা হলে খুশি হবো।

ইন্দ্রজিৎ রায় (ঝন্টু)

(ভুবনডাঙা, বোলপুর, বীরভূম)

ও সন্দীপন চক্রবর্তী

(৩০, সারদা চ্যাটার্জি লেন, কদমতলা, হাওড়া-১)

রঙিন ছবি

আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। ক্রিকেট খেলোয়াড় যুবরাজ সিংকে আমি খুব পছন্দ করি। যুবরাজ সিং-এর একটি রঙিন ছবি যদি শুকতারায় ছাপা হয় তাহলে খুশি হবো।

প্রণয় গুপ্ত

(৫৬/৪/২, আন্দুল রোড, পোঃ ডি এস লেন,
হাওড়া-৭১১ ১০৯)

বাঁটুল দি গ্রেট

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বাঁটুল দি গ্রেট', 'হাঁদা-ভোঁদা', 'দাদুমণির চিঠি' ও কৃষ্ণদাস চ্যাটার্জির 'একতার জয়' খুব ভালো লেগেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষের লেখা যদি মাঝে মাঝে ছাপা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। শচীনের রঙিন ছবি চাই।

প্রসেনজিৎ সামন্ত

(৫৩/৩৫/১, বিদ্যায়তন সরণী, পোঃ-
আলমবাজার, কলকাতা-৭০০ ০৩৫)

ষষ্ঠীর দল

গত বৈশাখ সংখ্যায় ডঃ গৌরী দের 'ষষ্ঠীর দল', কালীপদ দাসের 'ঠাকুরমার ছড়ি' খুব ভালো লেগেছে। ফিরে দেখায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হালখাতার খাওয়া-দাওয়া'র তো তুলনা নেই। শচীন তেন্ডুলকারের রঙিন ছবি চাই।

সুদীপ্ত পাত্র

(গ্রাম-মথুরাপুর, পোঃ-শ্যামনগর,
জেলা-উঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩ ১২৭)

ভালো লেগেছে

অরবিন্দ ভট্টাচার্যর 'কাক ও সোনার আংটি', অনীশ দেবের 'দুঃখী রাজকুমার', কালীপদ দাসের 'ঠাকুরমার ছড়ি', মিতালী সেনগুপ্তর 'নারদের পরীক্ষা', বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোনামণির বাচ্চারা', সঞ্জীব কুমার দের 'ছায়ায় মায়ায়', ডঃ গৌরী দের 'ষষ্ঠীর দল' আমার খুব ভালো লেগেছে।

সুমিত্রা পাল

(প্রযত্নে—বসন্ত কুমার পাল, ১১৩ বড়বাজার, হুগলি)

ভয় দেখানো ভূত নয়

শুকতারার বৈশাখ সংখ্যায় সঞ্জীব কুমার দে-র 'ছায়ায় মায়ায়' আমার খুব ভালো লেগেছে। ভয় দেখানো ভূত নয়, মানুষ ও অশরীরীর মধ্যে দরদী মানবিক সম্পর্কের চমৎকার উপস্থাপনা লেখাটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

ডঃ তপনজ্যোতি ভৌমিক

(সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্সটিট্যুট, রসায়ন বিভাগ,
বিধাননগর-৭০০ ০৯১)

তিতলিপুরের জঙ্গলে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'তিতলিপুরের জঙ্গলে' খুব ভালো লাগছে। চৈত্র সংখ্যায় দীপালি মুখোপাধ্যায়ের 'সোনালী মাছ', নিধু হাজরার 'বিষবৃক্ষে অমৃত ফল', সুনির্মল চক্রবর্তীর 'লোভী বুড়ি ও লেবুগাছটি' ভালো লেগেছে। শচীন তেন্ডুলকার ও সৌরভ গাঙ্গুলির রঙিন ছবি চাই।

মেহুলী চক্রবর্তী

(গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪)

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খাম বা ইনল্যান্ডের ওপর 'সেরা চিঠি' কথাটি লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) ....

সম্পূর্ণ ঠিকানা ....

কাঁসার থালা

অনুপ বড়ুয়া

দুপুরে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়িটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দিনের বেলাকার লোকজনের গমগমে ভাব দুপুরের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। মধ্যাহ্নভোজনের পর যে যার ঘরে খাট-পালঙ্কে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। ঘুমন্ত তিন কাকার নাক ডাকার একঘেয়ে শব্দ ছাড়া সেসময় অন্য কিছুর শব্দ থাকে না। সেজকাকার নাসিকা গর্জনের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। ছোটকাকা নাম দিয়েছিল এ.কে. সাতচল্লিশ। মানেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। এখন জানি ওটা একটা বন্দুকের নাম। দাদু আরামকেদারায় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। এতো বড়ো বাড়িতে কেবলমাত্র দুটি প্রাণীর চোখে ঘুমের লেশমাত্র থাকে না—আমার ছোটকাকা আর আমাদের পোষা কুকুর জিঙ্গো। ছোটকাকা দোতলায় নিজের ঘরে বসে গল্প লেখে। কখনো উপন্যাস পড়ে। জিঙ্গো নিঃশব্দে নিচের তলার বারান্দায় হাঁটাচলা করে। অন্য সময়ে উঠোনে কাক-পক্ষী বসলে সে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে যায়, তবে দুপুরের দিকে সে চুপচাপ থাকে।

এরকম এক থমথমে পরিবেশে বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। ছোটকাকা নিজের ঘরে বসে উপন্যাস পড়ছে। জিঙ্গো দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। নিচের বারান্দায় তীব্র রোদ্দুর এসে এমন তাতিয়ে দেয় যে সেখানে চলাফেরা করা যায় না। তাই জিঙ্গো এখন দোতলায়। তবে সে উপরে থাকলেও মন কিন্তু তার নিচের তলার বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে। কাঁসা-পিতলের এঁটো বাসনগুলো খনার মা মেজে-ধুয়ে বারান্দায় জল ঝরতে দিয়েছে। সেগুলো বিকেলে তোলা হয়। মাঝে মাঝে ছোটকাকা ব্যালকনি থেকে উঁকি দিয়ে উঠোনে আচারের বোতলগুলো দেখছে। সব ঠিক আছে দেখে আবার উপন্যাসের পাতায় মগ্ন হয়ে পড়ছে।

এমন সময় সদর দরজা দিয়ে এক বৃদ্ধা এসে উঠোনে দাঁড়াল। পরনে ছেঁড়া নোংরা সাদা থান। কাঁধে ঝোলানো একটা পুঁটলি। বয়স যে সত্তর পেরিয়ে গেছে তা দেখলেই বোঝা যায়। হাতের, গালের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। মাথার চুল সাদা। চোখ ঘোলাটে। সারা দুপুর ঘুরে বেড়ানোর একটা গভীর ক্লান্তির ছাপ রয়েছে তার শরীরে। বৃদ্ধা সামনে-পেছনে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বারান্দায় রাখা বাসনের কাছে চলে এলো। এরপর রুগ্ন কালো হাতটা সেদিকে একবার বাড়াচ্ছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ইতিমধ্যে সন্দেহবাতিক জিঙ্গো শরীর নাচিয়ে লাফিয়ে উঠল।

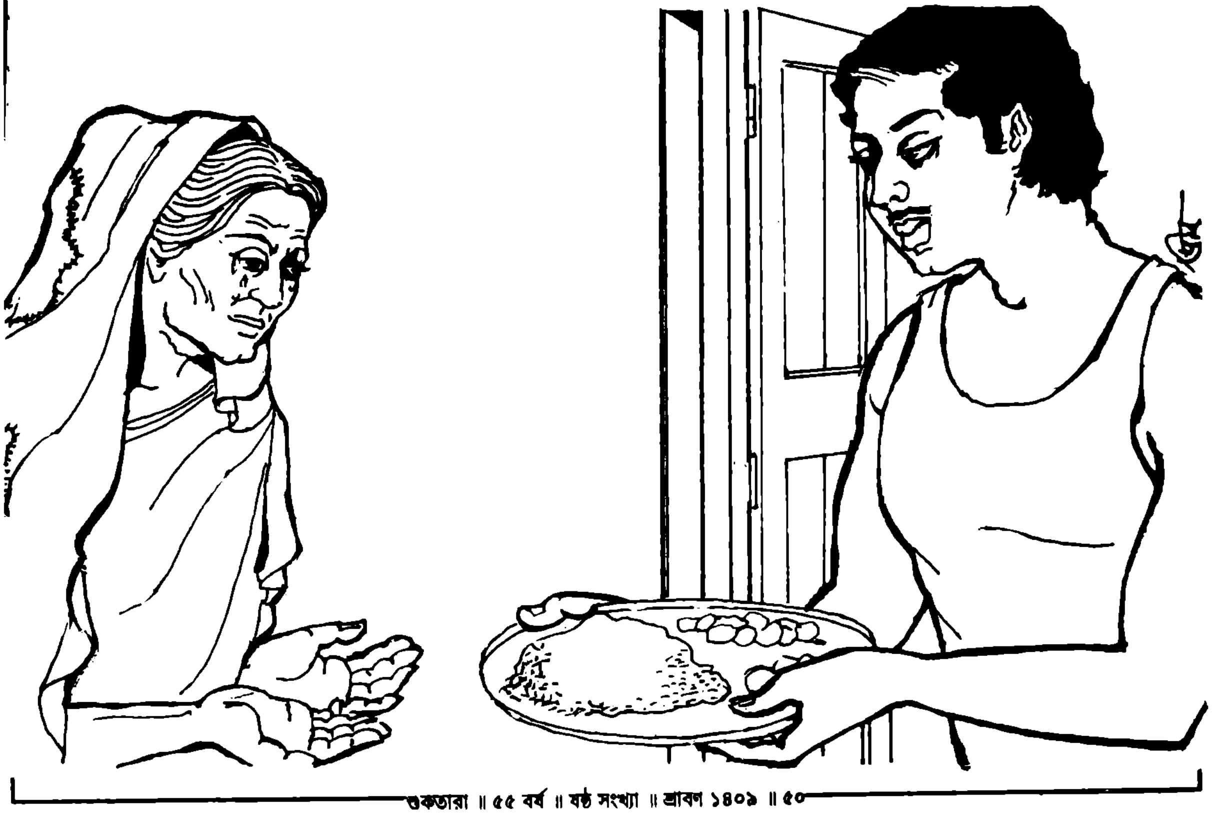

দোতলার বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে নিচের যে দৃশ্য সে দেখল তাতে তার শরীরের ঝাঁকড়া লোমগুলো খাড়া হয়ে যাবার উপক্রম। জিঙ্গোর গতিবিধি ছোটকাকার নজর এড়াতে পারল না। আচারের বোতলে বাঁদরে হামলা করছে না তো? ঘর-লাগোয়া ব্যালকনিতে এসে ছোটকাকা দেখল এক বৃদ্ধা একটা কাঁসার থালা তুলবে তুলবে করছে। আর তাই দেখে জিঙ্গো এক পায় খাড়া। নিচে ছুটল বলে। ছোটকাকা চাপাস্বরে জিঙ্গোকে নিষেধ করতেই সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, শুধু একটি আদেশের অপেক্ষায়।

ছোটকাকাকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখে বৃদ্ধা চমকে উঠল। তারপর দ্রুত কাঁসার থালাটা রেখে পেছন ফিরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ছোটকাকা বলল, এই যে ঠাকুমা, যেটা নিয়েছিলেন সেটা নিয়ে যান। এরপর আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না।

বৃদ্ধা আমতা আমতা করে বলল, আমি তো কিছু নিইনি। ভিক্ষার জন্যে এসেছিলাম, কেউ নেই দেখে চলে যাচ্ছি।

ছোটকাকা জোর গলায় বলল, মিথ্যা কথা বলছেন কেন? আমি তো দেখলাম আপনি চুরি করছিলেন। তবে একটা কথা শুনে যান, আমি না থাকলে আমাদের পোষা কুকুর আপনাকে আস্ত রাখতো না।

জিঙ্গোর উপর চোখ পড়তেই বৃদ্ধা শিউরে উঠল। বলল, আর কোনোদিন হবে না। পেটের জ্বালায় ভিক্ষা করে খাই। তাই লোভ সামলাতে পারিনি। বৃদ্ধা হাত দুটো জোড় করে বলল, এবারের মতো আমি ক্ষমা চাইছি বাবা, জীবনে আর এবাড়িতে কোনোদিন ঢুকবো না।

বৃদ্ধার কথা শুনে ছোটকাকা কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, দেখে তো মনে হচ্ছে সারা দিন কিছু খাননি। দাঁড়ান, কিছু খাবার নিয়ে যান।

ছোটকাকা বৃদ্ধার সেই পছন্দের কাঁসার থালাতে করে রান্নাঘর থেকে ভাত ও তরকারি নিয়ে তার হাতে দিল। সঙ্গে কিছু চাল ও কাঁচা সবজি দিয়ে বলল, বাড়ির লোকজন জেগে ওঠার আগেই এগুলি নিয়ে এক্ষুণি আপনি চলে যান। তবে ভবিষ্যতে এরকম কাজ করবেন না।

বৃদ্ধা চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তার জীবনে এইরকম অভিজ্ঞতা আর কখনো হয়নি।

এই ঘটনাটা সবার কাছে অজানা থাকল। কাঁসার থালাটির খোঁজ পড়ল চার-পাঁচদিন পরে। সবাই বলল, জিঙ্গো থাকলেও যদি থালাবাসন উধাও হয়ে যায় তাহলে তো বাড়িতে বাস করা মুশকিল। কেউ কেউ বহুদিনের বিশ্বস্ত খনার মাকে সন্দেহ করল।

কিছুদিন পরে একদিন উঠোনে সেই কাঁসার থালাটি পড়ে থাকতে দেখা গেল। কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। সেটাকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে রাখা হলো।

সেদিন রাতে খেতে বসে ছোটকাকার গম্ভীর গলায় আমরা সবাই শুনলাম সেই বৃদ্ধা ও কাঁসার থালার কাহিনীটি।

ছবি : প্রীতিশ ব্যানার্জী

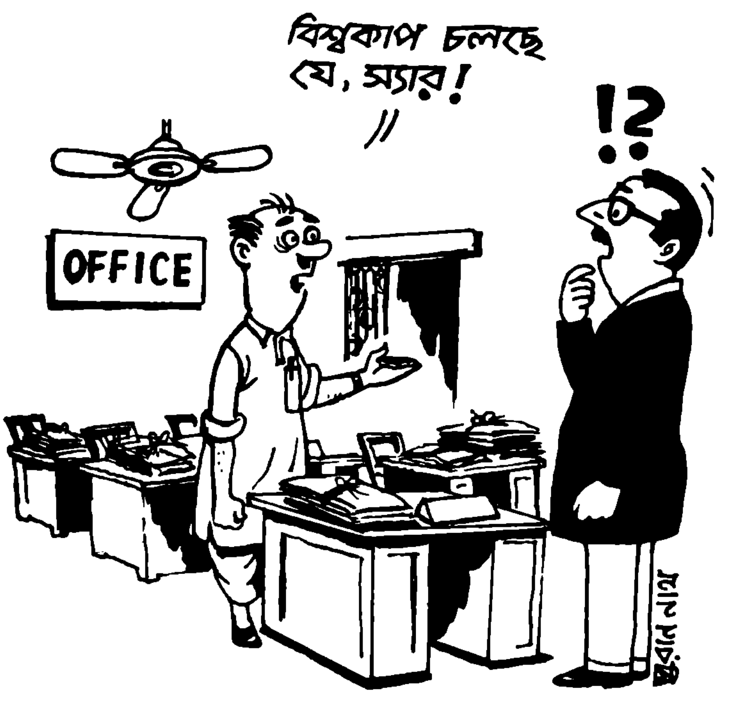

দেব সাহিত্য কুটীরের সব রকম
বই-এর প্রাপ্তিস্থান :

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
দেব লাইব্রেরী
১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
অক্সফোর্ড বুক স্টোর
১৭, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
বিংশ শতাব্দী
৭৫ সি, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
সিগ্যাল বুক সেন্টার
৩১, এস পি মুখার্জী রোড, ভবানীপুর,
কলকাতা-৭০০ ০২৫
ও
স্বভূমি : ৪৯ সি, মৌলানা আবুল কালাম
আজাদ সরণী, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
ল্যান্ডমার্ক
৩, লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

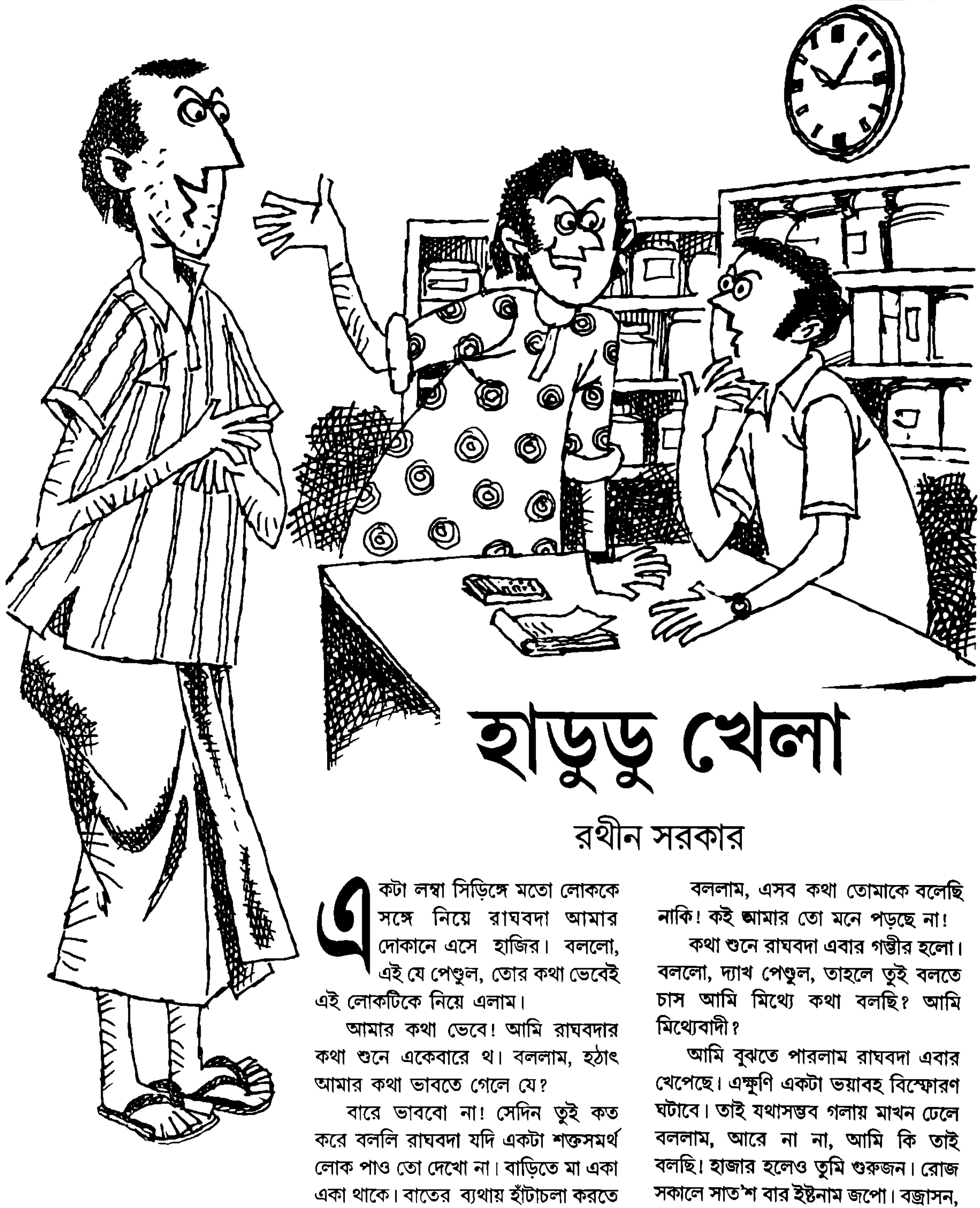

হাডুডু খেলা

রথীন সরকার

একটা লম্বা সিড়িঙ্গে মতো লোককে সঙ্গে নিয়ে রাঘবদা আমার দোকানে এসে হাজির। বললো, এই যে পেণ্ডুল, তোর কথা ভেবেই এই লোকটিকে নিয়ে এলাম।

আমার কথা ভেবে! আমি রাঘবদার কথা শুনে একেবারে থ। বললাম, হঠাৎ আমার কথা ভাবতে গেলে যে?

বারে ভাববো না! সেদিন তুই কত করে বললি রাঘবদা যদি একটা শক্তসমর্থ লোক পাও তো দেখো না। বাড়িতে মা একা একা থাকে। বাতের ব্যথায় হাঁটাচলা করতে পারে না। তাছাড়া বয়স তো হলো, এত খাটুনি আর পারবে কেন? একটা শক্তসমর্থ লোক পেলে, যে ঘরে বাইরে সামলাবে, তা হলে আমি খাওয়া-পরা এমনকি কিছু মাইনে দিয়েও রাখতাম।

বললাম, এসব কথা তোমাকে বলেছি নাকি! কই আমার তো মনে পড়ছে না!

কথা শুনে রাঘবদা এবার গম্ভীর হলো। বললো, দ্যাখ পেণ্ডুল, তাহলে তুই বলতে চাস আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমি মিথ্যেবাদী?

আমি বুঝতে পারলাম রাঘবদা এবার খেপেছে। এক্ষুণি একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাবে। তাই যথাসম্ভব গলায় মাখন ঢেলে বললাম, আরে না না, আমি কি তাই বলছি! হাজার হলেও তুমি গুরুজন। রোজ সকালে সাত'শ বার ইষ্টনাম জপো। বজ্রাসন, শীর্ষাসন, অষ্টরম্ভাসন কত কী আসন-ফাসন করো। তুমি কি কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারো! আসলে কি জানো কাকে কখন কী বলি আমার ঠিক মনে থাকে না।

হুঁ। রাঘবদা এবার আমার দিকে

করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুই এক কাজ কর, এক শিশি মৃত সঞ্জীবনী গরল খা। দেখবি সাতদিনে তোর স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে।

বললাম, বারে গরল তো বিষ। ও খেলে তো মানুষ মরে যাবে! তুমি না একটা যাচ্ছেতাই—

রাঘবদা বললো, তোর ক্ষেত্রে ওটাই অমৃত। তোর পেটে গিটকিরি হয়েছে, এতে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়।

গিটকিরি। আমি অবাক হয়ে বললাম, সেটা আবার কী জিনিস?

রাঘবদা বললো, ওটা একটা রোগের নাম। কুচো ক্রিমির বড় ভাই। এ রোগটা হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে মানুষ একদিন পাগল হয়ে যায়।

ইচ্ছা হলো বলি রোগটা আমার হয়নি। হয়েছে তোমার। তা না হলে এই সাত সকালে এমন একটা বিতিকিচ্ছিরি লোককে নিয়ে হাজির হও! এগুলো তোমার রোগেরই পূর্বলক্ষণ।

কিন্তু সে কথা আর বলতে পারলাম না। তার আগে রাঘবদা লোকটিকে কাছে ডেকে বললো, শোন হে বলভদ্র, এই তোমার মনিব। এর কাছেই তুমি থাকবে। এর কথা শুনে চলবে। কোনোরকম বেচালগিরি করবে না,বুঝলে? বলে রাঘবদা যেমন এসেছিল তেমনি আবার চলে গেল।

আমি এবার লোকটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। হাড়-জিরজিরে রোগা প্যাংলা শরীর। বয়স বোঝা দায়। চোখ দুটি যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসছে। ভীষণ হাঁপাচ্ছে। খালি গা। বললাম, কী নাম তোমার?

এজ্ঞে বলভদ্র সর্দার।

বাড়ি কোথায়?

এজ্ঞে পেত্নীপাড়ায়।

কী কী কাজ তুমি করতে পারো?

এজ্ঞে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। মাঝে মাঝে হাতসাফাই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সেটা আবার কী জিনিস?

বলভদ্র এটুকু বলেই হাঁপাতে লাগলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, বাবু সেসব বেতান্ত শুনতি হলি এক কাপ—চা আর দুটো সিঙ্গাড়া খাওয়াতি হবে।

বললাম, সে কি হে! গাছে উঠতে না উঠতেই এক কাঁদি!

বলভদ্র হাসলো। বললো, এজ্ঞে বাবু প্যাট। বলে নিজের পেটটা দেখিয়ে বললো, এই পোড়া প্যাটের জন্যিই তো বাবু কাম করতি আসা। এই প্যাট না থাকলি কি আর আপনার দুয়ারে কাম করতি আসা লাগে? তা বাবু অনেক বকালেন, এক গ্লাশ জল দ্যান তো।

আমি ঘরের কোণে কলসী আর গেলাশ দেখিয়ে বললাম, ঐ তো ওখানে আছে, ঢেলে খাও।

লোকটি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললো, সেকি বাবু! আমি অতিথি। অতিথি নারায়ণ। তারে কি কেউ হুকুম করতি লাগে? অতিথিকে সেবা করাই তো গেরস্থের ধম্ম বাবু।

বুঝলাম লোকটি সুবিধের নয়। মহা ঘোড়েল। মনে মনে স্থির করলাম লোকটিকে যতশীঘ্র সম্ভব বিদায় করতে হবে। এমন লোককে বাড়িতে পোষা মানে নিজের প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া। অগত্যা বাধ্য হয়ে এক গ্লাশ জল এগিয়ে দিয়ে বললাম, নাও খাও—

লোকটি ঢকঢক করে এক গ্লাশ জল খেয়ে আমার হাতে গ্লাশটি ধরিয়ে দিয়ে বললো, বাবু গেলাশটা ধুয়ি রাখবেন। আমার তো সেই ছোটবেলা থেকি হাঁপানির রোগ। এ ছাড়া আর কী কী রোগ আছে তা বাবু জানি না—জানে আমার পাড়ার নন্দ কবরেজ। সেই তো আমারে দ্যাখে-ট্যাখে কিনা!

বললাম, বলো কি হে, তোমার আরও রোগ আছে!

তা তো থাকতিই পারে বাবু। বলভদ্র বললো, মানুষের শরীল থাকলিই রোগ হবে। আপনের যেমন প্যাটে খিটিমিটি রোগ রাঘববাবু কইলেন না? তেমনি আমারও কত রোগ আছে।

বললাম, তুমি এর আগে কোথাও কাজ করেছো?

এজ্ঞে না বাবু, এই পেরথম।

বললাম, এই প্রথম। তাহলে এর আগে কী করতে?

এজ্ঞে বাবু ঐ যে বললাম হাতসাফাই।

হাতসাফাই। মানে?

বলভদ্র এবার হাসলো। বললো, গল্প শুনতি হলি বাবু সে অনেক সাতকাহন। খালি প্যাটে কী গপ্পো কওন যায়। আপনার চা-সিঙ্গাড়া কিন্তুক এখনো আসে নাই।

সুতরাং বাধ্য হয়ে চা-সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিতে হলো। মনে মনে রাঘবদার উপর বেজায় রাগ হলো। এমন একটা উটকো বেয়াদব লোককে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য রাঘবদাকে ঘনঘন অভিসম্পাত করতে লাগলাম। মনে হলো রাঘবদা ইচ্ছা করেই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেল আমাকে জব্দ করার জন্যে। ঠিক আছে আমিও বারুইহুদোর পেণ্টুলচাঁদ। আমার পেটেও জিলিপির প্যাঁচ। তোমাকে কী করে জব্দ করতে হয় তা আমি ভালো করেই জানি। সুযোগ পেলেই তোমাকে কুপোকাৎ করতে আমার হাত-পা একটুও কাঁপবে না।

বলভদ্রকে বললাম, কই এবার বলো তুমি এর আগে কী কাজ করতে?

বলভদ্র আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তা হলি বাবু দুইডা বিড়ি দ্যান।

বিড়ি! তুমি কি বিড়িও খাও নাকি?

আমার কথা শুনে বলভদ্র অবাক হলো। যেন অষ্টম আশ্চর্যের কথা শুনছে এমনিভাবে বললো, সেকি বাবু,পুরুষ মানুষ নেশাভাঙ করবি না এইডা আবার হয় নাকি! আমাদের সমাজে বাবু নেশাভাঙ না করলি তার হাতে জল চলে না।

বললাম, আমার কোনো নেশা-টেশা নেই। আমি বিড়ি-ফিরি খাই না।

বলভদ্র যেন আহতই হলো। বললো, তা হলি বাবু আসল কথাডা কই। আমার দিনে দুই তাড়া বিড়ি লাগে। আপনে মাইনে যা দেবেন তার সঙ্গে দুই তাড়া বিড়ির দাম ধইর‍্যে দেবেন বাবু। এইডা কিন্তুক ফিরি।

—ফ্রি! আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। হাজার রকম বায়নাক্কা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আমি এবার ধমকে উঠলাম। বললাম, তুমি কী আসল কথাটা বলবে? কী কাজ করতে আগে?

বলভদ্র চোখ দুটো ছোট ছোট করে আমার দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ আমাকে জরিপ করার চেষ্টা করলো। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, বাবু, এইডা কী করেন! চাকরবাকরদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলি কি চলে! চাকরবাকরেরা তো মুনিবের খাইয়াই মুনিবের তেইশ ঠাণ্ডা করে। তারে ভিখিরি বানাইয়া ছাড়ে। কিণ্ডক মুনিবের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতি হয়। সব দেখেও না

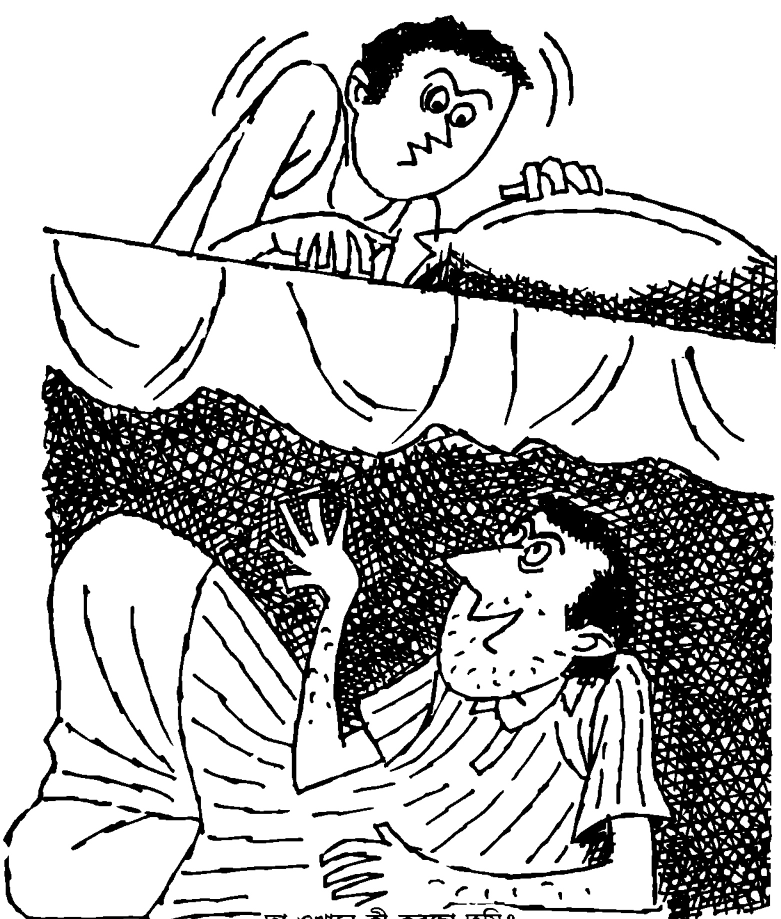

তা ওখানে কী করছো তুমি?

দেখনের ভান করতি হয়। তাছাড়া বাবু, আমি এখনও চাকরবাকর হই নাই। আপনি তো এখনও আমার সঙ্গে চুক্তি করেন নাই।

আমি এবার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলাম। বুঝতে পারছি লোকটি ক্রমশ মাথায় উঠবার চেষ্টা করছে। তাই যতটা সম্ভব গুরুগম্ভীর হয়ে বললাম, দেখ বলভদ্র তোমার ধানাইপানাই অনেক শুনেছি। এবার আসল কথাটা বলবে কী বলবে না আমি সেটুকুই শুনতে চাই—

বলভদ্র বোধহয় আমার মেজাজটা বুঝতে পেরে থাকবে। তাই তাড়াতাড়ি বললো, আপনে চটেন কেন বাবু! আমি তো আসল কথাডা কইতেই চাই।

তাহলে বলো এর আগে তুমি কী কাজ করতে?

বলভদ্র বললো, এজ্ঞে বাবু চুরি করতাম।

চুরি! আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, তুমি তাহলে চোর?

বলভদ্র বললো, তা যা বলেন বাবু, এক্কেবারে পাকা সিঁদেল চোর। আমার বংশটাই চোর-ডাকাতের বংশ। আমার বড় ভাই দশখানা গাঁয়ের মধ্যে নামকরা ডাকাত। আমার ছোট ভাইডা বাবু ছিঁচকে চোর। আর বাবু আমার একডাই বোন তারে বিয়া দিছি এক পকেটমারের সঙ্গে। তা রোজগারপাতি খারাপ করে না বাবু, দিনে দশ-বিরিশটা টাকা হয়।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে বলভদ্র এবার হাপরের মতো হাঁপাতে লাগলো। ততক্ষণে পাশের দোকান থেকে চা-সিঙ্গাড়া এসে গিয়েছে। আমি সেগুলো বলভদ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, নাও বলভদ্র খাও।

বলভদ্র আর একমুহূর্ত দেরি করলো না। সেগুলোকে গলাধঃকরণ করতে করতে বললো, বাবুর আমার দয়ার শরীল। তা বাবু চাকরবাকরদের খুশি রাখলে মনিবের মঙ্গল হয়। কী বলেন বাবু?

আমি এবার কী বলবো ভেবে পেলাম না। মনে মনে প্রচণ্ড চটে গেলাম রাঘবদার উপর। রাঘবদা যে সব জেনে শুনে এমন একটা বদখৎ লোককে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একে লোকটা ধান্দাবাজ ঘোড়েল, তার উপর রোগগ্রস্ত এবং সর্বোপরি চোর। সুতরাং এই ভয়াবহ লোকটিকে নিয়ে আমি কী করবো ভেবে পেলাম না। একে কী বাড়িতে রাখা সমীচীন? এ যে গলায় ছুরি মেরে সব কিছু নিয়ে চম্পট দেবে না তার গ্যারান্টি কোথায়! দুর্জনকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই মনে মনে স্থির করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকটিকে বিদায় করতে হবে।

খেতে খেতে বলভদ্র অনেকক্ষণ ধরে আমাকে লক্ষ্য করছিল। হয়তো আমার মনের আঁচ পাবার চেষ্টা করছে। তাই বললো, বাবু একটা কথা কইবো?

বললাম, বলো কী বলবে?

এজ্ঞে আপনে ভয় পাচ্ছেন না তো বাবু?

ভয়! কেন, ভয় পাবো কেন? আমি যথাসম্ভব সাহস সঞ্চয় করে বললাম, তোমাকে দেখে খামোকা ভয় পেতে যাবো কেন?

বলভদ্র বললো, না, মানে আমি সত্যি কথাডা কইলাম তো। আমার কথা শুনে অনেকেই ভয় পায় বাবু। তাই কইছিলাম।

এবার আর দ্বিরুক্তি না করে বলভদ্রকে সত্যি কথাটাই বললাম, তা একটু ভয় ভয় করছে বই কি! তোমাকে বিশ্বাস কী। তুমি আমার সব ফাঁক করে দিয়ে যে একদিন সটকে পড়বে না কে বলতে পারে!

বলভদ্র আমার কথা শুনে এবার দমকে দমকে হাসতে লাগলো। আর আমার মনে হলো বলভদ্র যেন হাসছে না গোঙাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে গোঙানি থামলে বললো, বাবু, আপনেরে একডা কথা কই শোনেন। সব মানষের মধ্যিই আইন কানুন নিয়ম আছে। কাক যেমন কাকের মাংস খায় না তেমনি বাবু আমাদের সমাজেও নিয়ম আছে নিজের গাঁয়ে নিজের বাড়িতে চুরি করতি নাই। তাতে বাবু চোর সমাজের অমঙ্গল হয়, আমাদের দেবতা রাগ করেন। তাছাড়া বাবু আমি তো চুরি করা ছাইড়া দিছি। আমি

তো এখন সাধুসন্ত হইছি বাবু।

বলভদ্র চুপ করলো।

আর আমি মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ! চোর এখন সাধু হয়েছে—এ তো আরও সাংঘাতিক কথা। কথায় বলে চোরে না শোনে ধম্মের কথা। অথচ বলভদ্র বলছে সে আর চুরি করে না। সে এখন ভালো হয়েছে। আমি হাসবো না কাঁদবো ভেবে পেলাম না। কথায় বলে চোরের মুখে রাম নাম। বলভদ্র আমাকে সেই কথাটাই বিশ্বাস করাতে চায়—বলভদ্র এখন সাধু হয়েছে।

অনেক রাতে খুটখাট শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি খাটের উপর সোজা হয়ে বসলাম। বুঝতে পারছি ঘরে আমার লোক ঢুকেছে। এ নিশ্চয়ই বলভদ্র কিংবা বলভদ্রর কোনো অনুচর। তাই চুপ করে সমস্ত ব্যাপারটার উপর নজর রাখতে লাগলাম। রাত্রে বাধ্য হয়ে বাড়িতে আনতে হয়েছিল বলভদ্রকে। খাওয়া-দাওয়ার পরে বাইরে বারান্দার এক কোণে বিছানা পেতে দিয়ে বলভদ্রকে বলেছিলাম, বলভদ্র তুমি এখানেই শোও। রাতে কোনোরকম অসুবিধা হলে আমাকে ডেকো।

সেই বলভদ্র এখন সোজা ঘরে ঢুকে আমারই জিনিসপত্র চুরি করতে শুরু করেছে। চোরদের স্বভাবই এই যে পাতে খাবে সেই পাত ফুটো করবে।

ইচ্ছা হলো চিৎকার করে পাড়ার লোকজনকে ডেকে তুলি। বলভদ্রকে ধরে পুলিশে হ্যান্ডওভার করি। কিন্তু তা আর সাহস হলো না। কেননা আজকাল চোরেরা খালি হাতে চুরি করতে আসে না। ওদের হাতে অস্ত্রপাতি থাকে। যদি আমাকে গুলি-ফুলি করে অথবা গলার টুঁটি কটে দেয়! মা পাশের ঘরে থেকেও জানতে পারবে না; কেননা মাকে বলভদ্রর কথা কিছু বলা হয়নি। মা এমনিতেই ভীতু মানুষ, তায় হার্টের রুগী।

সুতরাং সব দিক চিন্তা-ভাবনা করে মোলায়েম কণ্ঠে বললাম, ঘরে কে, বলভদ্র নাকি?

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আমি আবারও বললাম, কী বলভদ্র, কথা বলছো না কেন? আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

অন্ধকার থেকে এবার খিকখিক করে হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। বললো, এইডা আপনে ঠিক বলেন নাই বাবু। আপনি আমারে দেখবেন কেমন করে! আমি তো তক্তপোশের তলায় আঁধারে সেঁদিয়ে আছি।

তা ওখানে কী করছো তুমি?

এজ্ঞে বাবু, হাত-পায়ের একটু মক্‌সো করতেছি।

তার মানে? তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কেমন করে?

আবারও খিক খিক হাসি। অন্ধকার থেকেই জবাব ভেসে এলো, এইডা আমার গুরুর কাছ থিইক্যা শিখছি বাবু। আপনে দরজায় তালা লাগান, খিল দেন না বাবু, আমি একটা তুড়ি দিব, সব দরজা খুইল্যো যাবে। তা বাবু আপনে ঘুমান নাই?

বললাম, কী করে ঘুমুবো! সারারাত ধরে যদি খুটখাট শব্দ করো তবে কেউ ঘুমুতে পারে?

এইডা যে আমার স্বভাব বাবু। বলভদ্র একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আপনেরা সারাদিন খাটাখাটনি কইর্যা যখন ঘুমান বাবু তখন আমরা গেরস্থের সব্বোনাশ করি। আমার যে ঘুম আসে না বাবু। সারারাত কী কেউ জ্যাইগ্যা থাকতি পারে? চুরি করা ছাইড়া দিয়া সাধুসন্ত হইছি ঠিকই, কিন্তুক অভ্যাস তো যায় নাই। তাই একটু হাত-পায়ের মক্‌সো করতিছি বাবু।

তা তুমি অন্ধকারে কী করছো? বাইরে বেরিয়ে এসো, মুখটা একটু দেখি। বলে টর্চটাকে আমি বিছানার উপর হাতড়াতে লাগলাম।

বলভদ্র তা দেখে বললো, আপনে কী খুঁজতিছেন বাবু?

বললাম, টর্চ।

টর্চ তো আমার কাছে বাবু। এই দেখেন—

বলে বলভদ্র খাটের তলা থেকেই টর্চ জ্বাললো। আর সেই আলোয় উদ্ভাসিত হলো ঘর। আমি দেখলাম সামনের দরজা খোলা। কিন্তু বলভদ্রকে দেখা যাচ্ছে না। বলভদ্র খাটের তলায় লুকিয়ে আছে। আমি ডাকলাম, কই বলভদ্র, বাইরে বেরিয়ে এসো।

বলভদ্র খাটের তলা থেকেই বললো, এজ্ঞে বাবু ওইডা পারবো না। রাত্রে আমাদের মুখ দেখাতে নাই। গুরুর বারণ। তাছাড়া রাত্রে আমার মুখ দেখলি আপনে

নানা স্বাদের বই

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মুখোশ ১৬.০০
মুখোশের আড়ালে ও কে? মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে গোটা দেশ ছটফট করছে জানার জন্য কিন্তু...
তীরন্দাজ ১৮.০০
রাধারমণ রায়ের
রণডাকাত ২৬.০০
দুর্ধর্ষ রণডাকাতের লোমহর্ষক কাহিনী
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুর্গপাহাড়ে বন্দী ২০.০০
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
ফাঁসি ২৫.০০
ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে আসার দুর্দান্ত কাহিনী, সঙ্গে ফাঁসুড়েদের সচিত্র সাক্ষাৎকার।
অপারেশন এক্স ৩০.০০
চিত্তরঞ্জন মাইতির
রুরু ৩৫.০০
এক নির্ভীক কিশোরের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী
সুভাষ ধরের
বুদ্ধমূর্তির সন্ধানে ৩০.০০
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের
সোনার মেডেল ২০.০০

উপন্যাস

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবী ৩৬.০০
মন্দিরে বিগ্রহ নেই, আছে একটি পদচিহ্ন।
আনন্দ বাগচীর
অদৃশ্য মৃত্যুর ছক ৪০.০০
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
ডাক্তারের ডায়েরি ৩৫.০০
ডাক্তারদের ডায়েরি ভরা থাকে বিচিত্র সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ফসলে। ঘটনাগুলি সব-ই সত্যি।
শিপ্রা দত্তর
গেস্ট হাউসের ডায়েরি ৪০.০০
গেস্ট হাউসের মধ্যে কী হয়—সেক্স, ভায়োলেন্স, সাসপেন্সের টানটান কাহিনী।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভয় পাবেন বাবু। আমরা অন্য মেজাজে থাকি তো। প্রয়োজনে আপনেরে খুন কইর‍্যা ফেলাইতি পারি।

সর্বনাশ! বলভদ্র বলে কী! আমার হাত-পা এবার ভয়ে সিঁটিয়ে এলো। ভেতরে ভেতরে ঠকঠকানি কাঁপুনি শুরু হলো। কিন্তু বাইরে যথাসম্ভব সাহস বজায় রেখে বললাম, তা তোমার কাছে অস্ত্রপাতি আছে নাকি ?

তা তো আছেই বাবু। পেস্তল, নেপালি কুকরি, আরও অনেক কিছু আছে বাবু।

বুঝতে পারলাম বলভদ্র মারাত্মক অস্ত্রপাতি নিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে আছে। ওর উদ্দেশ্য বোঝা মুশকিল। ও যে কী করতে চায় কিছুই খুলে বলছে না। ভয়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। ইচ্ছা হলো চিৎকার করে পাড়ার লোকজনকে ডাকি। কিন্তু সাহসে কুলালো না। তাই মনে মনে ঠিক করলাম বাকি রাতটুকু বলভদ্রর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেবো। তারপর দিনের আলোয় যা হোক একটা কিছু করা যাবে। তাই বললাম, তুমি যে এরকম চুরি করে বেড়াও তা ধরা পড়ো না?

এজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। কয়েকবার ধরা পইড়েছি। পেরথমবার বাবু ধরা পইড়া বেদম মার খাইছি আমার বড় ভাইয়ের থিইক্যা।

বললাম, সেকি, বড় ভাই তোমাকে মারলো!

এজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। চোর-ডাকাতের শরীলে দয়ামায়া থাকে না। আপনেরে কইছি না বংশডাই আমার চোর-ডাকাতের বংশ। বড় ভাই বিয়া কইর‍্যা তখন আমারে আলাদা কইর‍্যা দিছে। আমি সেই রাগে বড় ভাইয়ের ঘরে সিদ দিছি বাবু। তা উনার চোখকে ফাঁকি দেবো কেমনে। দশ-বিশটা গাঁয়ের মধ্যে নামকরা ডাকাত, তার চোখকে কী ফাঁকি দেওন যায়! সিঁদ দিয়া যেই না ঘরে পা রাখছি অমনি দাদা আমারে ক্যাঁক কইর‍্যা টুঁটি টিপে ধরছে। কইলো, বদমাশ তোরে আজ আমি খুন কইর‍্যা ফেলুম। বলে বাবু দাদা আমারে ঠ্যাং ধইর‍্যা ছুড়ে মান গাছের জঙ্গলের মধ্যে ফেলাইলো। তারপর গোটা কয় ঘা দিয়া আমারে কইলো, ভাই হইয়া ভাইয়ের রক্ত নিতে নাই। যা এবার তোরে ছাইড়া দিলাম। আবার যদি এই কামডা করবি তবে তোরে আর ভাই বইলা খাতির করবো না। টুঁটি কাইট্যা জলে ভাসাইয়া দিমু। বোঝলেন বাবু সেই থিকা আর ও গাঁয়ে যাই নাই। দাদাই আমারে শিখাইছিলো, নিজের গাঁয়ে চুরি করতি নাই। যে পাত্রে খাবা সেই পাত্র কেউ ফুটা করে!

বলে বলভদ্র হাঁফাতে লাগলো। তবু আমাকে মুখ দেখালো না। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললো, বাবু আপনে ঘুমান। আপনে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমান। আপনের ঘরে চুরি করনের মতো কিছু নাই। আপনের সঙ্গে আমার তো তফাৎ কিছু নাই বাবু। আমিও ভিখিরি, আপনেও ভিখিরি। তবে আপনেরে একডা কথা কই বাবু—

বললাম, বলো।

বলভদ্র বললো, আপনের বাড়িতে আমি কাম করতি পারবো না বাবু। যে বাড়িতে চুরি করনের মতো কিছুই নাই সে বাড়িতে আমি কাম করি না বাবু। আজ রাতেই কিন্তুক আমি চলে যাবো।

বললাম, কোথায় যাবে?

এজ্ঞে বড়লোকের বাড়িতে।

এবার হঠাৎ আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। প্রতিশোধ নেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর হতে পারে না। এই বদখত লোকটাকে রাঘবদা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মজা দেখছে। দাঁড়াও এবার আমিও মজা দেখবো কী করে তুমি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারো! তোমার হাই প্রেসার কী করে বাড়াতে হয় তা আমার ভালো করেই জানা আছে।

তাই বলভদ্রকে বললাম, তোমাকে আমি একটা বড়লোকের বাড়িতে নিয়ে যাবো বলভদ্র। সেখানে তুমি মহা আরামে থাকতে পারবে আবার প্রতি রাত্রে চুরিও করতে পারবে।

বলভদ্র খুশিই হলো। বললো, কখন যাবেন বাবু?

বললাম, ভোর হবার আগেই নিয়ে যাবো।

যা বলা তাই কাজ। আমরা দু'জনে রাস্তায় বেরুলাম ভোর হবার আগেই। হাঁটতে হাঁটতে রাঘবদার বাড়িতে এসে পৌছালাম যখন তখনও অন্ধকার আছে অল্প অল্প। আমি বলভদ্রকে রাঘবদার ঘরের সামনে এনে বললাম, এই ঘরেই তোমার বাবু শুয়ে আছে বলভদ্র, তুমি ওর কাছেই থাকবে। বড্ড ভালোমানুষ, দয়ার শরীর। এর কাছে থাকলেই তোমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

বলামাত্র বলভদ্র এবার হাতের কায়দায় দরজাটা হাট করে খুলে ফেললো। তারপর সটান ভেতরে ঢুকে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম রাঘবদা তড়াক করে বিছানায় সোজা হয়ে বসলো। তারপর চিৎকার করে উঠলো, কে? কে?

বলভদ্র বললো, এজ্ঞে আমি বাবু, আমি বলভদ্র।

বলভদ্র! তুমি হঠাৎ?

বলভদ্র বললো, আমি আর ও বাড়িতে কাম করতি পারবো না বাবু। ছোটবাবু লোক ভালো না। আমারে সারাদিন মারধর করে। আমি আপনের কাছেই থাকবো বাবু। আপনি আমারে বাঁচান।

বলে বলভদ্র আর দ্বিধা না করে সটান রাঘবদার দুই পা চেপে ধরলো। রাঘবদা প্রথমটা থতমত খেয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। তার আগেই বলভদ্রর দুই বাহুর ফাঁদে তার চরণযুগল ধরা পড়েছে।

রাঘবদা যত বলে, আরে, ছাড় ছাড়—

বলভদ্র ততই তার পা আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে। হাউমাউ করে বলে, না বাবু, আগে কথা দ্যান আমারে রাখবেন? আমি আর ও বাড়িতে কাম করতি পারবো না।

ভেতরে তখন একটা রীতিমতো নাটক। ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম রাঘবদা যত পা ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে, বলভদ্র ততই তার চরণযুগল আঁকড়ে ধরছে। যেন বলভদ্র রাঘবদার পায়ের সঙ্গে আঠার মতো লেপ্টে রয়েছে। এমন বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় রাঘবদাকে বোধহয় আর জীবনে কখনো পড়তে হয়নি। এ যেন সাপের ছুঁচো গেলা। রাঘবদা না পারছে বলভদ্রকে গিলতে না পারছে উগড়াতে!

ছবি : জুরান নাথ

মনের জানলা

জগদিন্দ্র মণ্ডল

[অধ্যাপক, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

প্রশ্ন ঃ আমার কাছে শুকতারা গল্পের চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠেছে। মনের জানলা সকলের সমস্যা সমাধান করে। আশা করি আমার সমস্যা সমাধান করবে। আমার সমস্যা হলো আমি ছোট থেকেই লেখাপড়া করতে একটুও ভালবাসি না, কিন্তু ছোটবেলায় আমি পড়াশুনায় বেশ ভালই ছিলাম। পড়াশুনা করে জীবনে বড় হতে আমার কিন্তু ইচ্ছা করে। আমি এবার নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি। তাই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। আমার স্কুলে যেতে লজ্জা করে। আমি জীবনে উন্নতি করতে চাই-ই চাই, কিন্তু মনের মধ্যে আমি কোনো জোর পাই না। আমি বাবা-মার একমাত্র কন্যা। আমার বাবা রেলে চাকরি করেন। আমি কি করলে লেখাপড়ায় মন বসাতে পারবো, আপনি তা বলে দিন। আমার লেখাপড়ায় একটুও মন বসে না।

আমি একজন শিক্ষকের কাছে বেহালা শিখতে যাই, অন্যরাও সেই শিক্ষকের কাছে বেহালা শিখতে যায়। তারা বেশ উন্নতি করছে বেহালা বাজানোয়, আমি ততটা পারছি না। ফলে শিক্ষক মহাশয় ওদেরই বেশি ***attention*** *দিচ্ছেন। এতেও আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি বেহালা বাজানোতেও উন্নতি করতে চাই।—সুতাগর, শান্তিপুর, নদীয়া—৭৪১ ৪০৪*

উত্তর ঃ নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় তুমি অকৃতকার্য হয়েছ। এতে স্বাভাবিকভাবেই তুমি ভেঙে পড়েছ। তোমার স্কুলে যেতে লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু এতটা খারাপ ফল হলো কেন? পড়াশুনায় তোমার একেবারেই মন নেই, লিখেছ। মন তাহলে কোথায়? মন তো কোথাও না কোথাও থাকে—হয় পড়ায়, নয় লেখায়, নয় আড্ডায়, নয় টি.ভির পর্দায়, নয় তো অন্য কোনো দিকে! পড়ায় যখন মন বসছে না, তখন ভেবে দেখ, অন্য কোথাও তোমার মূল্যবান মনটা দিয়ে বসে আছ কি-না। ওই দিকে এতটা মনোযোগ দিচ্ছ কেন? তোমার বয়সটাই এরকম যে তোমার দৃষ্টিকে আবেগে আচ্ছন্ন করে দেবে—যা কঠিন সত্য ও বাস্তব তা থেকে তোমাকে সরিয়ে রাখবে। তুমি তোমার 'মনের মাধুরী' দিয়ে এখন সাধারণ কাউকে অসাধারণ করে ভাবছ! মনে রাখবে এটা বয়ঃসন্ধিকালের একটা মানসিক সমস্যা। ছেলেরা মেয়েদের, মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হতে চাওয়া, সান্নিধ্য পাওয়ার ইচ্ছা—এই বয়সের এটি মানসিক চাহিদা। তাৎক্ষণিক এই চাহিদা পূরণ ইচ্ছাকে যদি কঠিন সত্য ও বাস্তবের প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ করতে না পার, তাহলে পড়ায় মন আসবে না—বেহালা বাজানোতেও মন আসবে না। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে পড়াশুনা কর, বেহালা বাজাও, নিয়ত নিয়মে চর্চা কর—উন্নতি তোমার অবধারিত। নিজেকে উন্নত করলে, মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে মনের অমোঘ শক্তি দিয়ে তুমি যদি পড়াশুনায় উন্নতমানের হও, জ্ঞান অর্জন কর, বেহালাবাদনেও উন্নতমানের হও, সুরজ্ঞান অর্জন কর, জ্ঞান ও সুর সুষমায় তুমি যে সৌন্দর্যের অধিকারিণী হবে, তাতে সকলেই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তোমাকে ভালবাসবে, সম্মান করবে। তুমি বয়সধর্মে কিছুটা মোহাচ্ছন্ন হয়ে, নিজের আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে মূল্য না দিয়ে পরের পিছনে ছুটেছ। উন্নতি করার যখন প্রবল ইচ্ছা রয়েছে তোমার মধ্যে তখন উন্নতি করার যে পথ সে পথেই তোমাকে হাঁটতে হবে। সেটা হলো আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কঠোর সুশৃঙ্খল পরিশ্রম—এর কোনো বিকল্প নেই। তুমি যে গুণগুলি অন্যের মধ্যে ভালবাসো, সে গুণগুলি তুমি নিজেই নিজের মধ্যে অর্জন করতে পার। হতাশায় হাল ছেড়ে দিও না।

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই
ছাত্রছাত্রীরা লুফে নিয়েছে

বাংলায় লাখ কথার এক কথা হল বাগ্‌বিধি বা প্রবাদ-প্রবচন। বাচ্য অর্থকে ছাড়িয়ে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনাকে তা অতিক্রম করে অর্থে আনে আশ্চর্য চারুতা। তাই বিশিষ্টার্থক বাগ্‌গুচ্ছ, বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচন ভাষার আত্মা। পরীক্ষার্থীর পাঠসূচিতেও এই বাগ্‌ধারা অন্তর্ভুক্ত...

কৌতূহলী ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ পাঠকও এই বইটি ব্যবহারে উপকৃত হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছাত্রছাত্রীরা তো উপকৃত হবেই, বইটি সাধারণ পাঠকের কাছেও সমাদৃত হবে।

জ্যোতিভূষণ চাকী

বাগ্‌ধারা সংগ্রহ ২০

শৈলেন চক্রবর্তী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

বিচ্ছুর যাদুশক্তি

জুরান নাথ

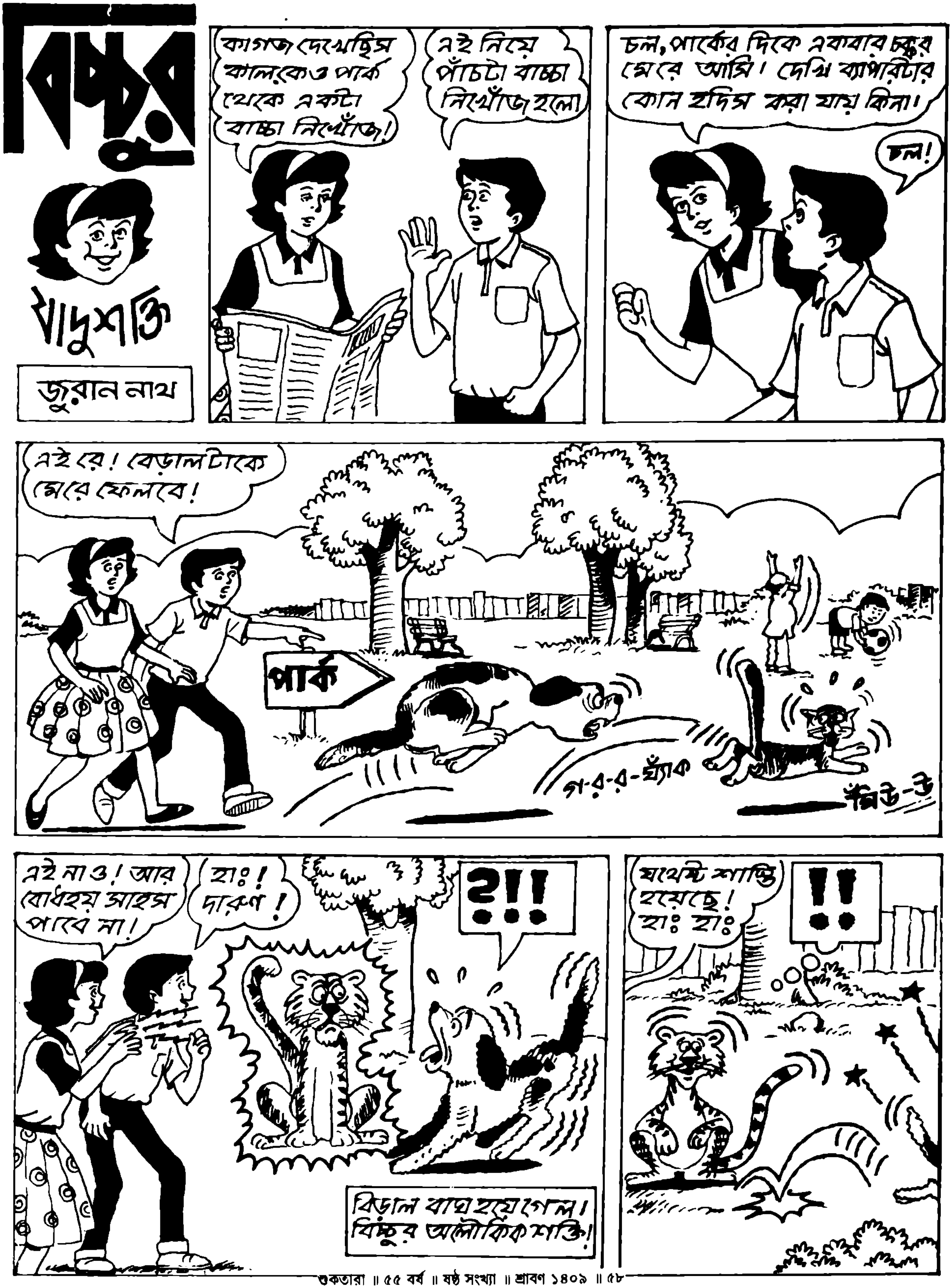
কাগজ দেখেছিস কালকেও পার্ক থেকে একটা বাচ্চা নিখোঁজ!
এই নিয়ে পাঁচটা বাচ্চা নিখোঁজ হলো
চল, পার্কের দিকে একবার চক্কর মেরে আসি। দেখি ব্যাপারটার কোন হদিস করা যায় কিনা।
চল!
এই রে! বেড়ালটাকে মেরে ফেলবে!
পার্ক
গ-র-র-ঘ্যাক
ম্যাঁউ-উ
এই নাও! আর বোধহয় সাহস পাবে না!
হাঃ! দারুণ!
?!!
বিড়াল বাঘ হয়ে গেল। বিচ্ছুর অলৌকিক শক্তি!
যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে! হাঃ হাঃ
!!

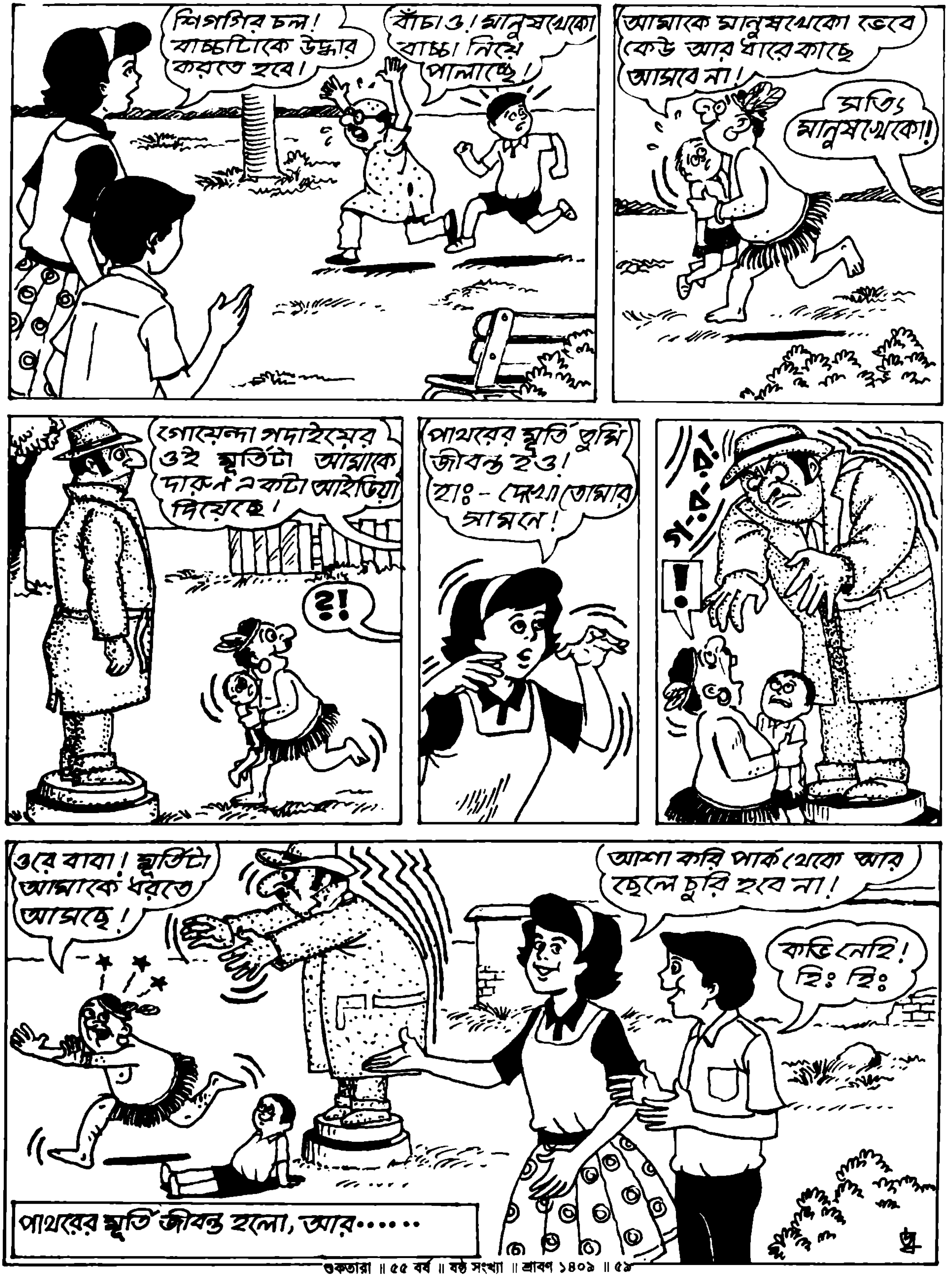
শিগগির চল! বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে হবে।
বাঁচাও! মানুষখেকো বাচ্চা নিয়ে পালাচ্ছে!
আমাকে মানুষখেকো ভেবে কেউ আর ধারেকাছে আসবে না!
সত্যি মানুষখেকো!
গোয়েন্দা গদাইয়ের ওই মূর্তিটা আমাকে দারুণ একটা আইডিয়া দিয়েছে!
?!
পাথরের মূর্তি তুমি জীবন্ত হও! হাঃ — দেখো তোমার সামনে!
গ-র-র!
!
ওরে বাবা! মূর্তিটা আমাকে ধরতে আসছে!
আশা করি পার্ক থেকে আর ছেলে চুরি হবে না!
কভি নেহি! হিঃ হিঃ
পাথরের মূর্তি জীবন্ত হলো, আর......

ফিরে দেখা

একটা আজগুবী গল্প

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[শুকতারার বয়স ৫৫ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বাংলার যশস্বী সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই শুকতারায় লিখেছেন। 'ফিরে দেখা' বিভাগে আমরা শুকতারার পাতা থেকে এক এক করে তুলে আনবো বাংলার শিশুসাহিত্যের কিছু মণি-মাণিক্য। শুকতারার শারদীয়া সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে এই পর্ব। এই সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'একটা আজগুবী গল্প'। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল শুকতারার পঞ্চদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে।]

বোশেখ মাস ; কনকনে শীত। এবার যেন শীতটা বড্ড বেশী পড়েচে। শীতের চোটে লোকে গায়ে জামা-কাপড় রাখতে পারচে না। শীত পড়তেই অধিকাংশ গাছের পাতা বিলকুল ঝরে গিয়ে একেবারে নেড়া সেজে দাঁড়িয়ে আছে। বসন্তে গ্রীষ্মে যে-সব পাখীর দল দেশ ছেড়ে দেশান্তরে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা আবার ফিরে এসে ঐ-সব নেড়া গাছের উলঙ্গ ডালে বোসে, ঠাণ্ডা-লাগা ধরা-গলায় বিকৃত স্বরে ডাকতে শুরু কোরে দিয়েচে। বড়লোকেরা মুহুর্মুহুঃ বরফ-জল খাচ্চে, মধ্যবিত্তরা মাটির কলসীর জলেই বার বার তেষ্টা মেটাতে বাধ্য হচ্চে, আর গরীবরা পুকুরধারে বোসে অনবরতই পেট পুরে পুকুর-জল খাচ্চে। পথের কুকুরগুলো পথ-পাশের কোন বাড়ির ছায়ায় কুণ্ডুলী পাকিয়ে, মরার মত নেতিয়ে পড়ে আছে—আর সমস্ত জিবটা বার কোরে একনাগাড়ে ধুঁকচে।

এই দুর্দান্ত বোশেখী শীতের এক মধ্যাহ্নে একটি বাহাত্তর বছরের বালক স্কুল পালিয়ে, বাগবাজার গঙ্গার ঘাটের এক পৈঠার ওপর বোসে, শালপাতার ঠোঙ্গায় কোরে মুড়ি আর ছোলাসেদ্ধ খাচ্ছিলো। তার জামার পকেট দুটোয় একখানা 'আঙ্ক-আঙ্ক' লেখার খাতা আর একখানা 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ' বই। গঙ্গায় তখন প্রবল ভাঁটা, কুলকুল কোরে তখন জলস্রোত দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হচ্ছিলো। খোকাটি খেতে খেতে প্রবল স্রোতের এই ঘোড়দৌড় একান্ত মনে দেখছিল। এমন সময় পেছন থেকে দুটি আট-নয় বছর বয়সের প্রৌঢ় এসে, একজন তার হাত খুব জোরে ধরে ফেললে, আর একজন তার পিঠে গুমগুম কোরে চার-পাঁচটা কিল বসিয়ে দিলে। একজন লোক ঘাটে নামছিল, জিজ্ঞাসা করলো—"খোকাটিকে আপনারা মারচেন কেন?"

যে প্রৌঢ় লোকটি খোকার হাত জোরে ধরে রয়েছিল, সে বললো—"মারবে না! স্কুল পালিয়ে এখানে বোসে-বোসে মুড়ি-ছোলাসেদ্ধ খাচ্চে!"

"আপনাদের উনি কে হয়?"

"দাদু হয়। কি রকম দুষ্টু ছেলে, মশাই, কি আর বোলবো! একদিনও স্কুলে যায় না, রোজ স্কুল পালিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। এখনো দ্বিতীয়ভাগখানা শেষ করতে পারলে না। তিনখানা পাটীগণিত ছিঁড়ে শুধু গুণটা কোনরকমে শিখেচে, কিন্তু যোগ-বিয়োগটা এখনো শিখতে পারলে না।"

অপর লোকটি বললো—"আর রোজ আমাদের পকেট থেকে পয়সা চুরি করে!"

এদিকে পিঠে কিল খেয়ে, খোকাটি কাঁদতে শুরু করেচে, আর একটা হাত দিয়ে চোখের জল মুচছে ; অন্য হাতটায় মুড়ি-ছোলাসেদ্ধর ঠোঙ্গাটা ছিল।

"চল আগে বাড়ি, তোমার আজ কি হয়, দেখবে!"—একটি নাতি তার দিকে কটমট কোরে চেয়ে এই কথা বলতেই, খোকাটি তড়াক কোরে দাঁড়িয়ে উঠে—দে দৌড়! একেবারে ঘাটের শেষ পৈঠেতে, জলের ধারে এসে, হাতের ঠোঙ্গাটা স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে, তড়াক কোরে তার ওপর চেপে বসলো। হালকা শালপাতার ঠোঙ্গা, ভাঁটার টানে সোঁ-সোঁ কোরে তীরের মত ছুটলো। তীরে দাঁড়িয়ে নাতি দু'জন খানিকক্ষণ পর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থাকবার পর বাড়ি ফিরে গেল।

এদিকে দাদু ভয়ে পালিয়ে এসে ঠোঙ্গার মধ্যে নির্ভয়ে বসে রইলো। তার চোখের জল তখন শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শুকনো, টোল-খাওয়া গালদুটোর ওপর দাগটা শুকিয়ে গিয়ে ফুটে উঠেছিল।

ভাঁটার প্রবল স্রোতে দাদুর ঠোঙ্গা তীরবেগে ভেসে চললো। ডান পারে বরানগর, আলমবাজার, দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটি, পানিহাটি ; বাঁ পারে বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া। ঘাটে-ঘাটে, মাঠে-মাঠে, আ-ঘাটায় আ-ঘাটায় কতো লোক হাঁ কোরে চেয়ে রইলো। ঠোঙ্গা পাঞ্জাব মেলের মতো ছুটে চলেচে—চলেচে—চলেচে। তীরের ছাগলগুলো ভয়ে ভ্যা-ভ্যা করতে করতে খোঁটা উপড়ে ছুটে পালালো গরুগুলো হাম্বা-হাম্বা রবে ডাকতে লাগলো। ঠোঙ্গা ছুটেচে—সোঁ-সোঁ সাঁই-সাঁই। মেল্-ঠোঙ্গা! কোথায় গিয়ে যে থামবে তার ঠিক নেই।

অবশেষে থামলো, একেবারে ও-পারে শ্রীরামপুরের ঘাটে। থামতেই দাদু একলাফে ঘাটের ওপর নেমে পড়লো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হাঁটতে শুরু করলো। বেলা তখন একটা কি দেড়টা। রোদের প্রচণ্ড উত্তাপ। রাস্তায় বড়-একটা কেউ চলাফেরা করচে না। বোশেখের এই দুর্দান্ত শীতের মধ্যেও দাদুর গা দিয়ে দরদর কোরে ঘাম ঝরতে লাগলো। দাদু ক্লান্ত হোয়ে পড়লো। রাস্তার ধারের একটা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ির ছায়া পড়েছিল। দাদু সেইখানে এসে একটু দাঁড়ালো। মিনিট দু'তিন পরেই বাড়ির ভেতর থেকে পাঁচ সাত বছর বয়সের তিনজন ষণ্ডা মত লোক বেরিয়ে এসে ওকে ধরে ফেললো। একটু ধরা-গলায়, অথচ বেশ-একটু 'তেরি-মেরি'ভাবে ওদের একজন ঘুষি পাকিয়ে গর্জে উঠলো—"আমাদের বাড়ির ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েচিস্ কেন? দিন-দুপুরে ছায়া চুরি?" আর দুজন কটমটিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো। একজন চোখ রাঙিয়ে বললো—"কোথায় তোমার বাড়ি হে?" তার হাতে একগাছা বাড়ি ছিল ; সেটা আস্ফালন করতে করতে আবার বললো—"এই বয়সেই এই, এর পর না-জানি......"

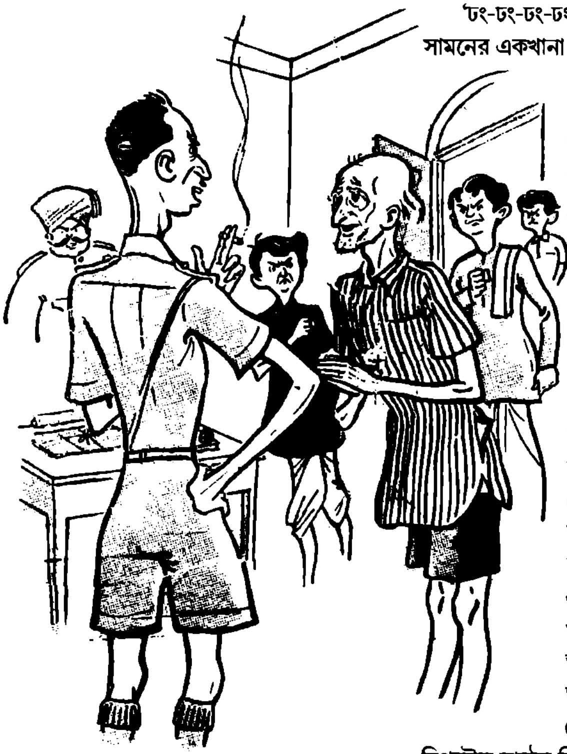

থানার দারোগা রোগা হলেও তেজী

"লোকের জান্ নেবে! চুরির ঠাকুর্দা।" অপর লোকটি ফোড়ন দিয়ে উঠলো।

দাদুকে তখন তিনজনে মিলে থানায় নিয়ে গেল। থানার দারোগা রোগা হোলেও তেজী; জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হোয়েচে?"

"চুরি।"

"চুরি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দুর্দান্ত চোর মশাই ; আমাদের বাড়ির ছায়া চুরি করেচে।"

দারোগা শুনেই চমকে উঠলেন ; জিজ্ঞাসা করলেন—"দিনদুপুরে ছায়া চুরি?"

"আজ্ঞে, রাত্রির অন্ধকারে ছায়া চুরি করবে কি কোরে! তখন ছায়া তো বাড়ির মধ্যে বন্ধ থাকে।"

"দিনে চুরি! তা হোলে তো ভয়ানক চোর!"

"বোগ্দাদ-কি-চোর, মশাই।"

সেই রাত্রেই স্পেশ্যাল পল্লী-পঞ্চায়েত কোর্টে দাদুর বিচার হোল। দাদুর মুখের দিকে চেয়ে পঞ্চায়েত-মোড়ল জিজ্ঞাসা করলেন—"ছায় চুরি করেচো?"

দাদু বললেন—"না হুজুর, ছায়া দান করেচি।"

"দান করেচ? মানে?"

"মানে, ওঁদের বাড়িটার ছায়া খুব বড়, আর আমার নিজের ছায়াটা খুবই ছোট, একরত্তি। ওটুকু ছায়ার এ পৃথিবীতে কোনই উপকারিতা বা আদর নেই। তাই আমি ওঁদের বড় ছায়ার মধ্যে প্রবেশ কোরে, আমার ছোট ছায়াটা দান করছিলাম।"

বিচার দেখতে লোক ভেঙে পড়েছিল। দাদুর ঐ কথা শুনে সকলেই তখন চমকে গেল। খানিক আগে সকলেই যাকে মনে-মনে নিন্দে ও তিরস্কার করছিল, পরিষ্কারভাবে এখন তারা বুঝতে পারলো যে, এ তো চুরি নয়, এ দান—মহাদান, আত্মদান! চারিদিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। এই বাহাত্তুরে বালকটি নিশ্চয়ই কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা বা মুনি-ঋষি হবেন। মুগ্ধ হাকিম হুকুম করলেন—"ওঁকে বসতে চেয়ার দাও।" তারপর তিন মিনিটের মধ্যে চড়াচ্চড় রায় লিখে ফেললেন—"আসামী একজন মহাজন, কিন্তু মহাজনের মত গ্রহণ ও সংগ্রহ করেন না, করেন দান—নিঃস্বার্থ দান। সুতরাং ফরিয়াদীদের বিপক্ষে এই মোকদ্দমা ডিসমিস করা হইল এবং আসামীকে মিথ্যা বদনাম ও ক্লেশ দিবার অপরাধে তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচ টাকা করিয়া পনের টাকা এবং এক টাকা ফাউ—একুনে মোট ষোল টাকা জরিমানা ধার্য হইল। এই টাকা আসামীর প্রাপ্য হইবে।" মুখে হুকুম করলেন—"জরিমানার বেবাক টাকা এখনি আমার সামনে আসামী বালকটিকে নগদ দিয়া দিতে হইবে।"

তাই হোল।

টাকাটা পেয়ে দাদুর মনে স্ফূর্তি আর ধরে না। হাসতে-হাসতে ওখান থেকে বেরিয়ে, নাচতে-নাচতে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকলো। দোকানী তখন কচুরি ভাজছিল। দাদু একখানা বেঞ্চিতে বোসে পড়ে বললো—"আটখানা গরম-গরম দাও।" খানিক আগের চুরির আসামী কচুরি ভক্ষণে আত্মনিয়োগ করলো।

খাওয়া হোয়ে গেলে দাদু দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা একেবারে শ্রীরামপুর রেল স্টেশন। দাদুর জোর-বরাত, বাকী রাতটা ঘুমোবার জন্যে স্টেশন মাস্টার ওয়েটিং-রুমে সুব্যবস্থা কোরে দিলেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে, পর পর তিন কাপ চা খেয়ে দাদু দেখলো হাওড়ার গাড়ি এখনি আসবে, 'আপ-সিগন্যাল' নামানো রয়েচে। তাড়াতাড়ি টিকেট-ঘরের জানালায় এসে বললো—"একখানা হাওড়া, স্যার।"

"তোমার তো হাফ, দাও দু'আনা।"

বেশ মুরুব্বীয়ানার সঙ্গে দু'আনা পয়সা দাদু বার কোরে দিলে।

'ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং'—গাড়ি এসে পড়লো। সামনের একখানা কামরায় দাদু উঠে পড়লো।

'পোঁ—ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্, পোঁ—ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্'—আবার গাড়ি চলতে লাগলো। প্রথমটায় ঝিক্কড়-ঝিক্কড়, তারপর ঝর্ ঝর্ ঝরাৎ-ঝরাৎ, তারপর ফুল মোশনে গাড়ি ছুটে চললো।

কামরা ভরতি প্যাসেঞ্জার। কেউ চুপ কোরে বসে আছে, কেউ হাত-পা নেড়ে আর একজনের সঙ্গে বকাবকি করচে, কেউ বা তার পোঁটলাপুঁটলিগুলো গোছগাছ কোরে নিরাপদ স্থানে রেখে দিতে ব্যস্ত। বাচ্চারা অস্থিরভাবে একবার এখানে একবার ওখানে গিয়ে বসচে, আবার পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াচ্চে। দাদু একধারে বোসে জানালার ফাঁকে দিগ্‌দৌড় মাঠের দিকে দেখতে লাগলো। এবং হঠাৎ একসময়ে দাঁড়িয়ে উঠে গাড়ি থামাবার শেকলটা টেনে ধরলো। সঙ্গে-সঙ্গেই মাঠের মাঝখানে চলন্ত গাড়ি থেমে গেল। গার্ড এসে জিজ্ঞাসা করলো—"চেন টেনেচে কে?"

দাদু বললো—"আমি।"

"বিনা কারণে এই রকম চেন টেনে গাড়ি থামালে পঞ্চাশ টাকা ফাইন হয়।"

"বিনা কারণে চেন টানিনি স্যার।"

"কি কারণে টেনেছিলে?"

"দেখলুম, ফাঁকা মাঠের ওপর একটা ছোট বাছুর উর্ধ্বপুচ্ছ হোয়ে ট্রেনের সঙ্গে-সঙ্গে পাঁই-পাঁই ছুটে আসচে, আর মাঝে-মাঝে গাড়ির দিকে চেয়ে ভ্যা-ভ্যা কোরে ডাকচে। বুঝলুম, কোন-কিছু বিশেষ কাজের জন্যে ও ট্রেনে আসতে চায়। সে অবস্থায় ওকে ট্রেনে তুলে নেওয়া উচিত। তাই আমি চেন টেনে গাড়ি থামিয়েছি।"

"তুমি পাগোল নাকি?"

"আমি পা-গোল নই ; আপনাদের এই গাড়ির পা গুলোই গোল—অর্থাৎ চক্রাকার।"

"তুমি একটি দুষ্টু এবং বোকা ছেলে।"

"আমি বোকাও নই, বখাও নই ; আমি ছায়া দান করি, চলন্ত ট্রেনে বাছুরকে তুলে নেবার চেষ্টা করি।"

"ফের ওরকম চেষ্টা করলে পঞ্চাশ টাকা ফাইন তোমায় দিতেই হবে।"

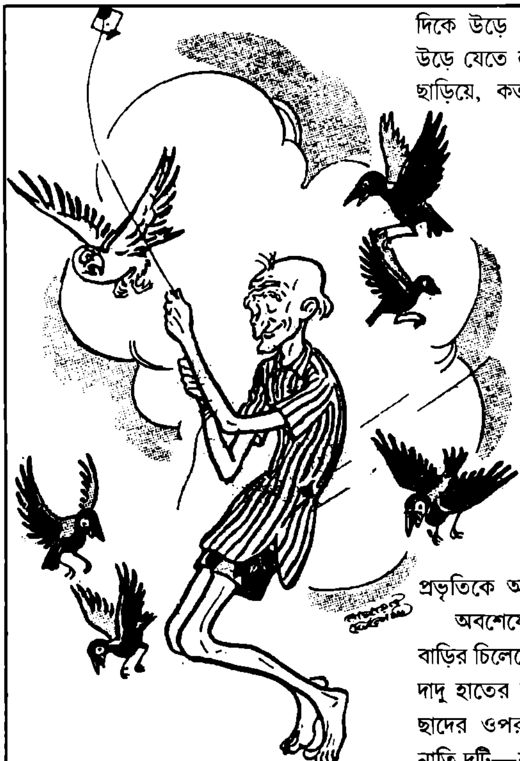

দাদুকে নিয়ে ঘুড়ি আকাশপথে ছুটে চললো

“আমি ফাইন দিই না, ফাইন নি এই দ্যাখো”—বলেই দাদু ছায়াদানের ষোলটা টাকা গার্ড সায়েবকে দেখিয়ে দিল।

পরের স্টেশনে গাড়ি এসে থামলে দাদু কামরা থেকে নেমে পড়লো। ফটকে টিকিটখানা দিয়ে, লাইন পার হোয়ে, কোন্নগরের মাঠে এসে দাঁড়ালো। এপাশে বঁইচির বন, ওপাশে বনযুঁইয়ের ঝোপ—মাঝে মাঠের বুক চিরে পায়ে-চলা পথ, কোথায় তেপান্তরের দিকে গিয়ে এক জায়গায় যেন হারিয়ে গেছে। দাদু সেই আঁকাবাঁকা মেঠো-পথে চলতে লাগলো। খানিক দূর গিয়ে দেখলো যে কাদের একখানা দো-তেঁয়ে ঘুড়ি কেটে গিয়ে, তার খানিকটা সুতো সামনের আঁশফল গাছের ডালে জড়িয়ে গেছে। ঘুড়িটা কিন্তু বাতাসের জোরে অনেক উঁচুতে পতপত কোরে উড়চে। তার এখন মুক্ত অবস্থা অর্থাৎ স্বাধীন। মেজাজে রাগ নেই। তাই ‘গোপ্তা’ না খেয়ে, মাথা উঁচু কোরে আনন্দে আকাশে উড়চে। দাদু একটা মিনিট কি ভাবলো, তারপর তরতর কোরে গাছে উঠে গিয়ে, ডালে-জড়ানো সুতোটা খুলে, নিজের ডানহাতের কবজিটায় বেশ কোরে ক' পাক জড়ালো। সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুড়িখানা বাঁধনমুক্ত হোয়ে, পশ্চিমে-বাতাসে সোঁ সোঁ কোরে পুবের দিকে উড়ে যেতে লাগলো। দাদুকে নিয়েই উড়ে যেতে লাগলো। কত গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে, কত মাঠ-ঘাট পার হোয়ে, কত চালাবাড়ির মটকা নীচে রেখে, কত একতালা দোতালা বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে দাদুকে নিয়ে ঘুড়ি আকাশপথে ছুটে চললো। দেখতে-দেখতে এসে পড়লো গঙ্গার ওপরটায় এবং দেখতে-দেখতে গঙ্গাও পার হোয়ে গেল। কত বউ-ঝি, বুড়ো-বুড়ী, ছেলে-ছোকরা ওপরদিকে চেয়ে হাঁ কোরে এই ব্যাপার দেখতে লাগলো। কত চিল ভয়ে পাশকাটিয়ে পালিয়ে গেল, কাকেরা বিপদের আশঙ্কায় দল বেঁধে ‘কা-কা’, জেঠা, মামা প্রভৃতিকে অনবরত ডাকতে লাগলো।

অবশেষে বাগবাজারের একখানা দোতালা বাড়ির চিলেকোঠার ওপর ঘুড়িখানা আসতেই, দাদু হাতের সুতোটা ছেড়ে দিয়ে টপ্ কোরে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো। দাদুর সেই নাতি দুটি—বাবলু আর কাবলু—এই ব্যাপার দেখে ছুটতে-ছুটতে ছাদের ওপর দাদুর কাছে এসে উপস্থিত। এই অবস্থায় দাদুকে পেয়ে ওদের কি আনন্দ! দু'জনে দাদুর কোমর জড়িয়ে ধোরে বললো—“দাদু!” দাদু দু'জনের মাথা ঠোকাঠুকি কোরে দিয়ে বললো—“ভাই!”

দু'দিন পরে দাদুকে পেয়ে সকলের সে কি আনন্দ! দাদু যেন দিগ্বিজয় কোরে ফিরেছেন—এমনি ভাবেই সবার কাছে তার আদর আর অভ্যর্থনা। তার আহারের জন্য সে রাত্রে খুবই আয়োজন করা হোল। সে ভোজের মেনু (Menu) হোল এই প্রকার ঃ—

ত্রি-ফলার পোলাও
I-Scream-য়ের কালিয়া
বরফের ছক্কা
জল-ছেঁচকি
সেলেট-পেন্সিল ভাজা
গঙ্গামৃত্তিকার কাটলেট
হাওয়ার চাটনি
শ্যাওলার সন্দেশ
উচ্ছেবীচির পায়েস।

এ রকম ভোজ তোমরা কেউ কখনো খেয়েচো?

দেব সাহিত্য কুটীরের অভিধান

Students' Favourite Dictionary
(Eng. to Beng.) 180.00

Students' Favourite Dictionary
(Beng. to Eng.) 140.00

Dev's Concise Dictionary
(Eng. to Beng.) 95.00

Dev's Concise Dictionary
(Beng. to Eng.) 85.00

Pocket Dictionary
(Eng. to Beng.) 75.00

Pocket Dictionary
(Beng. to Eng.) 60.00

Midget Dictionary
(Eng. to Beng.) 22.00

Midget Dictionary
(Beng. to Eng.) 20.00

শব্দবোধ অভিধান ১৫০.০০

সরল অভিধান ৫০.০০

নববিধান ৮৫.০০

সুবল মিত্রের
The Students' Constant Companion 125.00

✫ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন ◆ কলকাতা-৭০০ ০০৯

মজার পাতা

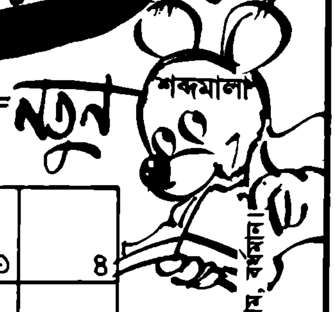

১	২		■	৩	৪
৫		■	৬		
■	■	৭		■	
৮	■	৯		■	■
১০	১১		■	১২	১৩
১৪		■	১৫		

এটি তৈরি করেছেন সুজয় চক্রবর্তী, স্বস্তিপল্লী, জোতরাম, বর্ধমান।

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ

১) ভেবে নিয়ে করবে শেষ,
রবীন্দ্র এক ‘কাব্য’-বিশেষ।

৩) ধ্রুব, প্রত্যুষ, সোম—এরা কারা?
সঠিক ভেবে করবে সারা।

৫) সবার ঠাকুর তিনি,
সূর্য বলেও জানি।

৬) প্রাচীন ডাকাতের ব্যবহৃত,
কৃত্রিম ‘পা’-এ দ্রুত যেত।

৭) ফুলটি পেলে পুজোয় দেবে,
উল্টে দিলে পাখিও পাবে।

৯) সবাই তো চিনি তাকে,
রামচন্দ্রের পুত্রটিকে।

১০) এক কথায় জানি,
কর দেন যিনি।

১২) বহু লিখলেও হবে,
কি পরিমাণ লেখ তবে।

১৪) এই দুই ঘরে ভাই,
গর্জন শুনে যাই।

১৫) হাতি আসছে দেখো,
নিষেধ মানবে নাকো।

উপর-নিচ ঃ

১) সে এক দুষ্ট অসুর ছিল
বুদ্ধের তপস্যা ভাঙতে এল।

২) যোগে পয়গম্বর তিনি,
ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলেও জানি।।

৩) একটু ভেবে লেখ দেখি,
জার্মানির রাজধানী কি?

৪) এটা কি তোমার আছে জানা,
সুবোধ ঘোষের ছদ্মনামখানা।

৬) আগাগোড়া ধ্বনিতে শেষ,
লেখ এক বাজনা বিশেষ।

৭) সামনে তরল রবে,
মেঘের নাম হবে।

৮) এক কথায় লেখ দিকিনি,
যে হাতির দাঁত গজায়নি।

১১) দাঁত দেখাও তবে,
উল্টে দামও পাবে।

১২) খাজনা দিয়ে এসো,
ঘুরে আড্ডায় বসো।

১৩) ‘ন’ যোগে শরীর হবে
ঘুরলে কিন্তু নুয়ে পড়বে।

এ মাসের প্রশ্ন

■ বলতো ব্যাথিস্কোপ যন্ত্র কোন কাজে লাগে?

■ চিনতে পারো এই বিজ্ঞানীকে যাঁর নামে আছে একটি ধূমকেতু!

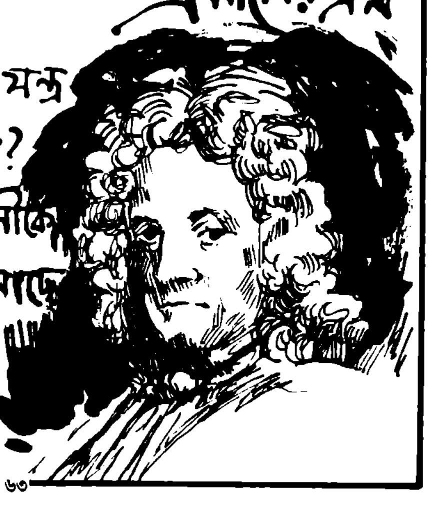

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১. মাথা কেটে দেখ ভাই
সত্য বিনা মিথ্যা নাই,
পা মুছলে তারিফ করি
দেহটা দেখি বহনকারী।

প্রশান্ত ঘোষ
আরামবাগ/হুগলী

২. পা খুলে গায় দাও
তবে তুমি বাইরে যাও।

সুদেষ্ণা, সুপর্ণা ও রত্নাকর
রামবন্ধুতলা/আসানসোল

৩. চর্ব্য অতুল্য
অথবা ও মূল্য।

বিভাংশু দত্ত
আরামবাগ/হুগলী

৪. ভেবেচিন্তে বলো তো ভাই
কোন গ্রামে মানুষ নাই।

প্রবীর কুমার মৈত্র
কলকাতা

আষাঢ় সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর :
১. গোলা ২. আতর ৩. শ্রীলঙ্কা ৪. হার

বিকির মজার অঙ্ক

□ '১০০০'-এই সংখ্যাকে এমন দুটো ভাগে ভাগ কর, যাদের একটি অংশকে '১৯' দিয়ে এবং অন্য অংশকে '৪৭' দিয়ে গুণ করলে গুণফলদুটির সমষ্টি হয় '১০০০'।।

□□ চারটি '১' দিয়ে সর্বাধিক কত বড় সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে? ভেবেচিন্তে কোরো!

	১	৪৩
৩১		

□□□ তোমায় তিনটি মৌলিক সংখ্যা ৩১, ১ এবং ৪৩ দেওয়া হলো। বাকি মৌলিক সংখ্যাগুলি তুমি নির্বাচন করে স্কোয়ারটি অঙ্কের ম্যাজিক স্কোয়ারে পরিণত কর।

ফুটকি থেকে ফুটকি

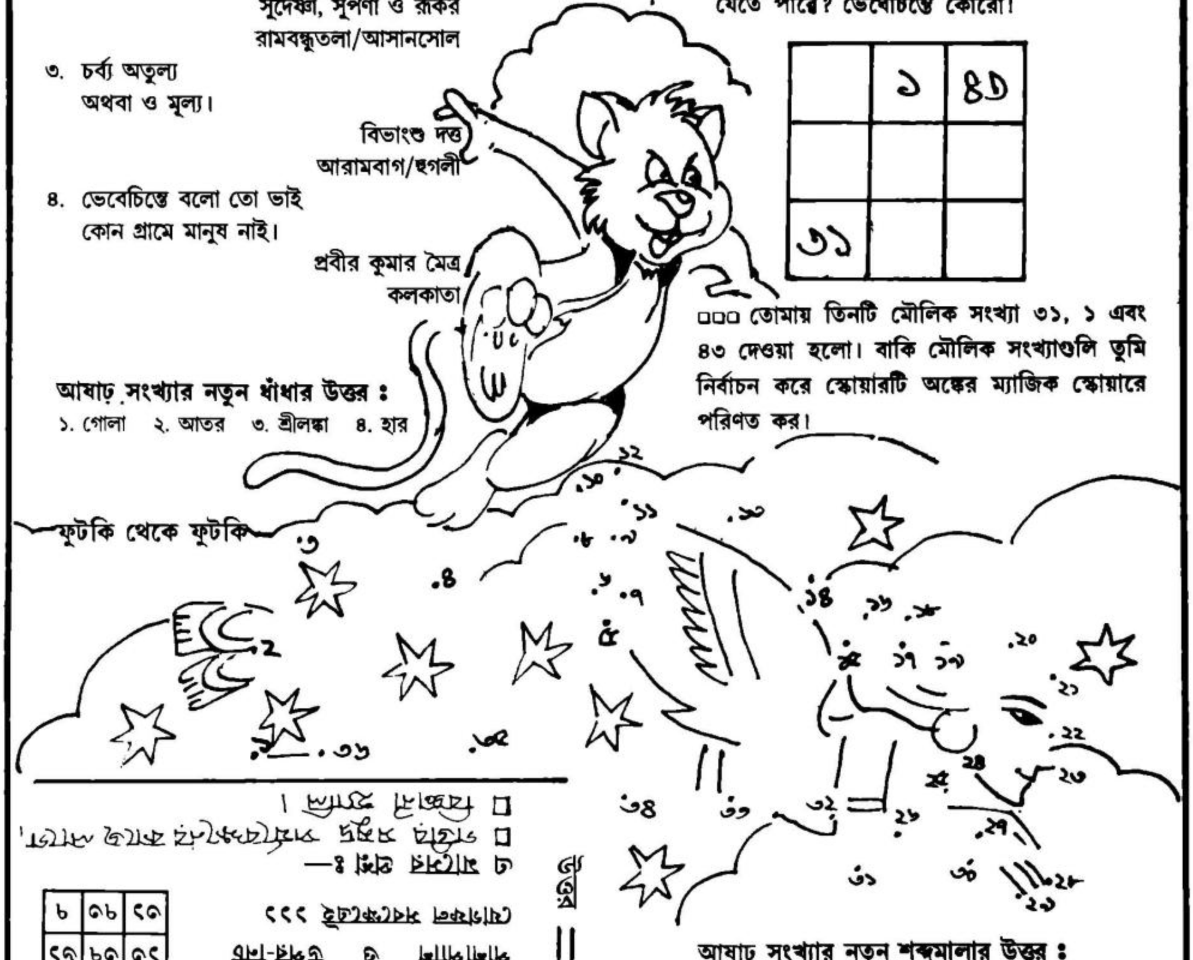

আষাঢ় সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর :

পাশাপাশি : ১. কদমা ৩. নকুল ৬. মই ৮. লক্ষ ৯. শঠতা ১১. থর ১২. বোম ১৪. মরাল ১৭. নুন ১৮. নন্দি ২০. কলহ ২১. গোবর

উপর-নিচ : ১. কমল ২. দই ৪. কুল ৫. লক্ষণ ৭. মাঠ ১০. তাবোল ১৩. ধনুক ১৫. রাম ১৬. মন্দির ১৮. নল ১৯. নব

উত্তর

বিকির মজার অঙ্ক—

□ ১৪×৪৭+১৮×১৯=১০০০

□□ $১১^{১১}$ = ২৮৫৩১১৬৭০৬১১

□□□ মৌলিক সংখ্যাগুলির পাশাপাশি ও উপর-নিচ যোগফল সবক্ষেত্রেই ১১১

৬৭	১	৪৩
১৩	৩৭	৬১
৩১	৭৩	৭

এ মাসের প্রশ্ন :—
□ গভীর সমুদ্র পর্যবেক্ষণের কাজে লাগে।
□ বিজ্ঞানী হ্যালি।

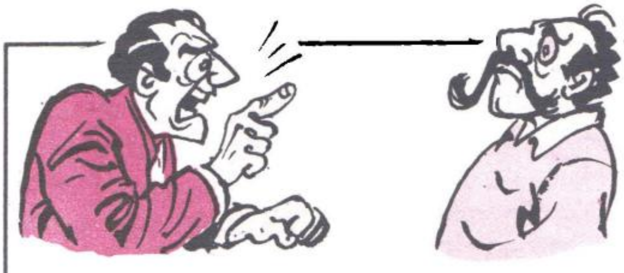

গোঁফবাবুর কীর্তি

চিত্ত পাল

তেল অফিসের বড়বাবু এবং ছোটবাবু
গোঁফ নিয়ে কি টানাটানি কেউ হন না কাবু।
বড়র দাবি, গোঁফ কাটা চাই এক্ষুণি তা আজই!
ছোটর দাবি, কক্ষণো নয়। কিছুতেই নয় রাজী॥

বড়বাবু বাধ্য হয়ে করেই দিলেন শো-কজ
গোঁফবাবুও থানায় হাজির, ডায়েরি করেন লজ!
ভীষণ রেগে বড়বাবু কেস করে দেন ফাইল
গোঁফবাবু কি তবু দমেন? একটুও হন কাহিল!!

জজ সাহেবও গোঁফবাবুকে ধমকে বলেন, চোপ!
যার যা খুশি করবে নাকি রাখবে এমন গোঁফ?
কি ভেবেছেন, এটা অফিস নাকি মামার বাড়ি?
চোদ্দো দিনেই গোঁফ কাটা চাই করছি আদেশ জারি!

গোঁফবাবু কি তবু দমেন? আপীল করেন ফের
এইভাবে কেস চলতে থাকে, শেষ যেন নেই এর!!
প্রত্যেক দিন নিউজপেপার এবং টেলিভিশন
তৎসঙ্গে সিনেমাতেও অজস্র আয় ফি-সন!!

বিজ্ঞাপন ও অভিনয়ের এ আয় কোথা থেকে?
সব হলো ওই তেরো ইঞ্চি গোঁফের বহর দেখে!
সেই গোঁফ কেউ কাটতে পারে, সেই গোঁফ কেউ ছাড়ে?
গোঁফবাবু তাই অসম্মতি জানান বারেবারে।

কেসের সাজা যা হয় হোক তবুও নন ভীত!
তার কারণ এই গোঁফের দ্বারাই তিনি সমাদৃত!!

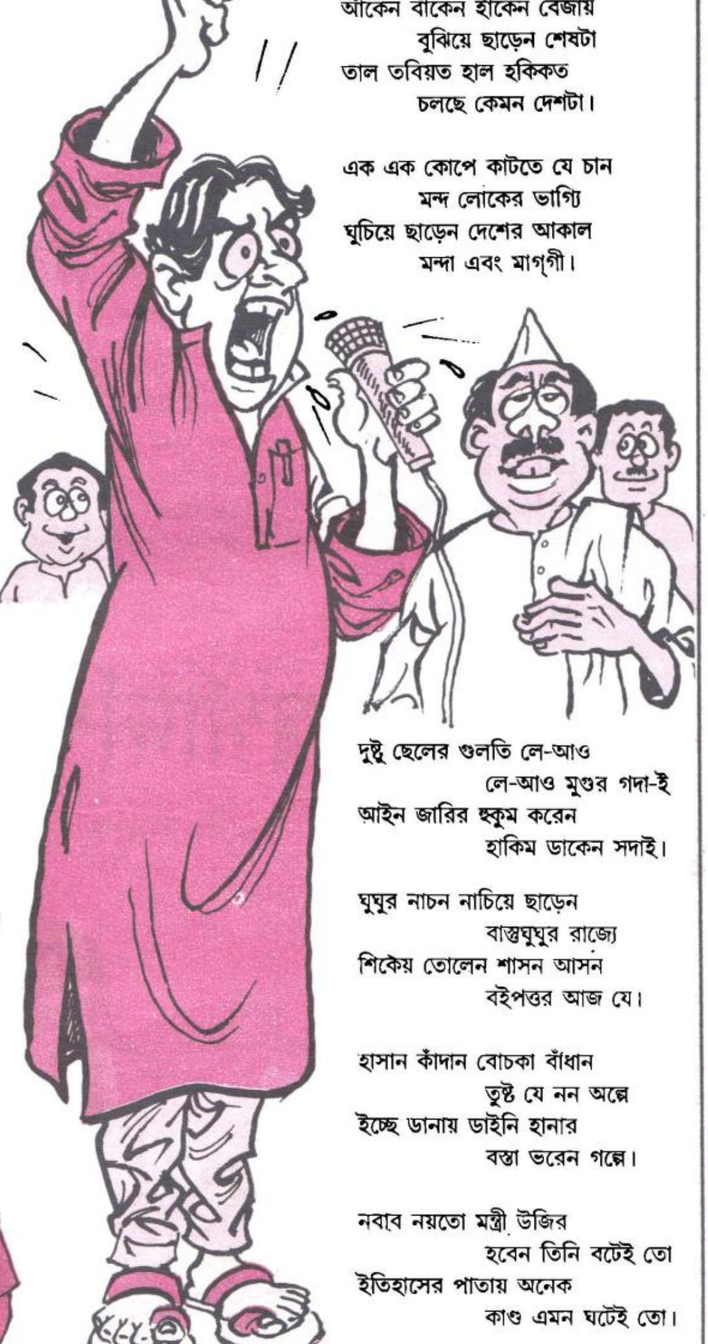

মন্ত্রী-উজির

তপন কুমার দাস

আঁকেন বাঁকেন হাঁকেন বেজায়
বুঝিয়ে ছাড়েন শেষটা
তাল তবিয়ত হাল হকিকত
চলছে কেমন দেশটা।

এক এক কোপে কাটতে যে চান
মন্দ লোকের ভাগ্যি
ঘুচিয়ে ছাড়েন দেশের আকাল
মন্দা এবং মাগ্‌গী।

দুষ্টু ছেলের গুলতি লে-আও
লে-আও মুগুর গদা-ই
আইন জারির হুকুম করেন
হাকিম ডাকেন সদাই।

ঘুঘুর নাচন নাচিয়ে ছাড়েন
বাস্তুঘুঘুর রাজ্যে
শিকেয় তোলেন শাসন আসন
বইপত্তর আজ যে।

হাসান কাঁদান বোচকা বাঁধান
তুষ্ট যে নন অল্পে
ইচ্ছে ডানায় ডাইনি হানার
বস্তা ভরেন গল্পে।

নবাব নয়তো মন্ত্রী উজির
হবেন তিনি বটেই তো
ইতিহাসের পাতায় অনেক
কাণ্ড এমন ঘটেই তো।

ছবিঃ দিলীপ দাস

স্বর্গাদপি

করবী বসাক

ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন সবুজ ঘাসের বিশাল প্রান্তরে ঘেরা একটি রাজ্য। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে টলটলে নদী। নদীর নাম রুমঝুম। ছোট-বড় নুড়ির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে নদী, যেন নূপুর পায়ে চঞ্চল মেয়েটি নেচে চলেছে আপন খুশিতে। তাই তো দেশের লোকে বলে রুমঝুম!

রাজ্যের নাম বৈজয়ন্তগিরি। ধনসম্পদে পরিপূর্ণ খুব সুন্দর এই রাজ্য। প্রকৃতিও অকৃপণ হাতে সাজিয়েছে বৈজয়ন্তগিরিকে। রাজা অমিত্রসূদন মহাপরাক্রমশালী অমিততেজা বীরপুরুষ। তাঁর বীরত্ব ও বাহুবলের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সকলের মুখে একটাই কথা—এবার নিশ্চয় মহারাজ অমিত্রসূদন পৃথিবী জয় করবেন। যা পারেননি আলেকজান্ডার, যা পারেননি তৈমুরলঙ্, যা পারেননি চেঙ্গিজ খাঁ—সেই অসম্ভবকে সম্ভব করবেন বৈজয়ন্তগিরির রাজা অমিত্রসূদন। প্রজারা রাজার বীরত্বগাথায় পঞ্চমুখ, রাজার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস যেন কেঁপে ওঠে সদা-সর্বদা।

এত প্রশংসা এত জয়ধ্বনি এত বীরপূজা—তবুও রাজার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই এতটুকুও। কেন? অভাব তো কিছু নেই রাজ্যে। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষে অপরিমিত ধনরত্ন, সুন্দরী মহিষী, বিনীত পুত্র, রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ—তবুও রাজা অসুখী! এর কারণ কি?

কারণ দিগ্বিজয়ী রাজার মানসিক যন্ত্রণা ও অনুতাপ! রাজার বিশাল রাজত্বটা তৈরি হয়েছিল বহুদেশ জয় করে পরাজিত রাজ্যগুলির সমষ্টি নিয়ে। সেইসব দেশ জয় করার জন্য করতে হয়েছে তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধে কত সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে, মারা পড়েছে কত হাতি-ঘোড়া। যুদ্ধক্ষেত্রে বয়ে গেছে রক্তের নদী, কত মানুষ হয়েছে বিকলাঙ্গ। তাদের পরিবার-পরিজনের করুণ বিলাপ আর কান্নায় আকুল হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস। রাজার মনও অস্থির যুদ্ধের এই ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখে। অনুশোচনায় তিনি দগ্ধ হতে লাগলেন। কৃতকর্মের জন্য তাঁর এত অনুতাপ হলো যে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে আর কখনো যুদ্ধ করবেন না, শুধুমাত্র স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র ধরবেন।

দেশ-বিদেশে দিগ্বিজয়ী বীর হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ায় সকলে ভেবেছিল তিনি শিগগিরই পৃথিবী জয়ে বার হবেন। বৈজয়ন্তগিরির প্রজারা মনে মনে গর্ব অনুভব করত যে তাদের রাজা অচিরেই পৃথিবীশ্বর হবেন। কিন্তু রাজার হঠাৎ মানসিক পরিবর্তনে এবং প্রতিজ্ঞার কথা শুনে প্রজাদের মন ভেঙে গেল হতাশায়।

এদিকে পাশের রাজ্য কাঞ্চীপুরের রাজা অনন্তদেব বৈজয়ন্তগিরির সুখসমৃদ্ধিতে এবং রাজা অমিত্রসূদনের দিক্‌জোড়া খ্যাতিতে যথেষ্ট ঈর্ষান্বিত ছিলেন। কি করে রাজা অমিত্রসূদনকে পরাজিত করা যায়, কি করে বৈজয়ন্তগিরি দখল করা যায়,—এই চিন্তাই ছিল তাঁর দিনরাতের ধ্যান। যখন শুনলেন, রাজা অমিত্রসূদন আর যুদ্ধ করবেন না তখন ভাবলেন, যাক ভালই হলো, বিনা রক্তপাতে এবার তাঁর রাজ্য দখল করা যাবে। কাঞ্চীপুরের রাজার মনে জেগে উঠল দিগ্বিজয়ের বাসনা। কিন্তু ভগবান বোধহয় অলক্ষ্যে হাসলেন। যুদ্ধ আর রক্তপাতই কী শুধু জয় এনে দিতে পারে?

কাঞ্চীপুরের রাজা যুদ্ধযাত্রায় অগ্রসর হলেন। বহুদেশ জয় করলেন বহুজনের প্রাণের বিনিময়ে, অজস্র রক্তপাত আর ধনসম্পদ ধ্বংস করে। অত্যাচারী রাজার অত্যাচারে সমগ্র ভারতবর্ষ যেন ভয়ে, আতঙ্কে তটস্থ! সকলের মনে বারবার জেগে উঠতে লাগল রাজা অমিত্রসূদনের কথা। তিনি যুদ্ধ করতেন, দেশ-বিদেশ জয় করতেন ঠিকই, কিন্তু তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। অনন্তদেবের সৈন্যরা ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল—যুদ্ধ করতে আর মন চায় না, এত রক্তপাত আর ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় নেই, যুদ্ধ করতেই হবে। অনন্তদেব তো কিছুতেই যুদ্ধ বন্ধ করবেন না!

ক্রমে ক্রমে কাঞ্চীপুরের রাজা বৈজয়ন্তগিরির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। রাজা অমিত্রসূদনের কাছে দূত পাঠালেন অনন্তদেব।

রাজা অমিত্রসূদন বসে আছেন রাজসভায়। পাত্র-মিত্র-পরিষদ সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। গুপ্তচরের সংবাদ অনুযায়ী আর মাত্র দু'দিনের পথ বাকি শত্রুসেনার এই রাজ্যে প্রবেশ করতে। এমন সময় কাঞ্চীপুরের দূত এল রাজসভায় অনন্তদেবের বার্তা নিয়ে। তার হাতে একটি

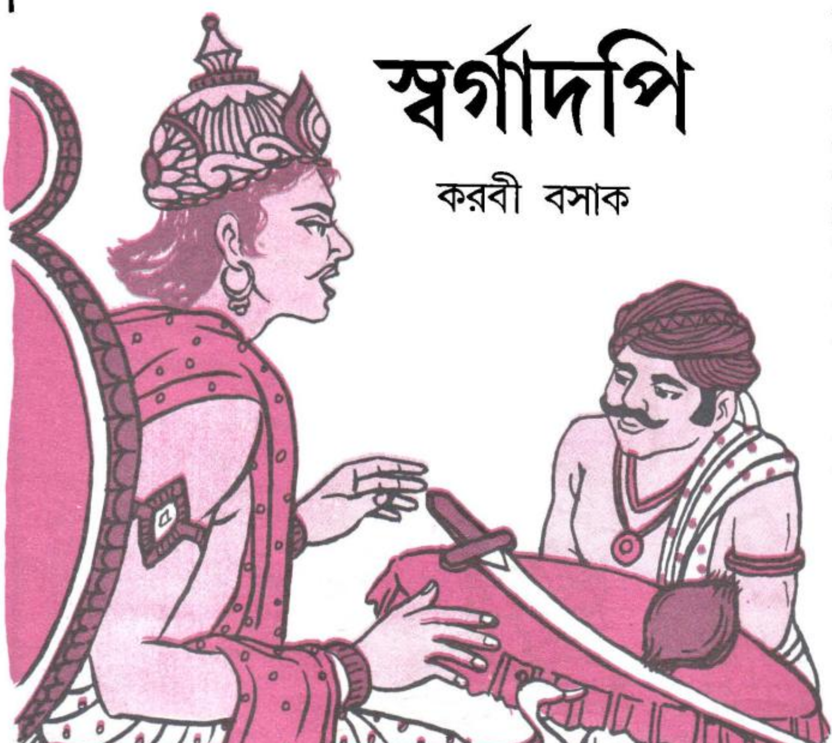

থালা। তাতে নারকেল আর একটি তরবারি। দূত জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন? নারকেল না তরবারি?

রাজা অমিত্রসূদন বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন দূতের দিকে। এরকম একটা পরিস্থিতির কথা ভাবেননি তো তিনি। কী করবেন এখন? তরবারি গ্রহণ করলে যুদ্ধ করতেই হবে। আর যদি নারকেল গ্রহণ করেন তাহলে বিনা যুদ্ধে শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করতে হবে! পরাধীনতা স্বীকার করা—সে যে চরম অপমান! শুধু তাঁর নয়, সমস্ত দেশের, তাঁর প্রিয় প্রজাদেরও! কিন্তু যুদ্ধ? সেও তো লোকক্ষয়ী বিধ্বংসী মারণযজ্ঞ! এই উভয়সঙ্কট নিরসনের কী উপায়?

দূত আবার জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, আপনার অভিমত বলুন—তরবারি না নারকেল, কি নেবেন আপনি? আমাকে তো আপনার উত্তর নিয়ে আমার রাজা শ্রীমন অনন্তদেবের কাছে ফিরে যেতে হবে তাড়াতাড়ি!

অমিত্রসূদন নিজেকে সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে। মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন। বললেন, বেশ, আমার বক্তব্য শুনুন তাহলে। হয় তো আমার নারকেল গ্রহণ করাই উচিত ছিল, তাহলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু হে আমার মন্ত্রিমণ্ডলী, আমার সভাসদ্‌বৃন্দ, আমার প্রিয় প্রজাগণ—আপনাদের সকলকে প্রশ্ন করি—এতদিন যে ব্যক্তি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, যাকে আপনারা ভাবতেন কালে একদিন পৃথিবীশ্বর হবে, সে কিনা বিনাযুদ্ধে পরাধীনতা স্বীকার করবে? স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কে বাঁচতে চায়? কে চায় অপরের আধিপত্য? কে চায় মাতৃভূমির মান-সম্মান ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে বিদেশীর হাতে রাজ্যলক্ষ্মীকে তুলে দিতে? দেশমাতৃকার সন্তান আমরা, জন্মভূমির প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত নয়? আমরা কী দেশজননীকে পরাধীনতার নিগড়ে শৃঙ্খলিত হতে দেখব? আমার এখন কি করা উচিত সে ব্যাপারে আপনারা আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন।

সমস্ত সভা এতক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে রাজার মর্মস্পর্শী কথাগুলি শুনছিল। তাঁর বক্তব্য শেষ হতেই বজ্রনির্ঘোষে যেন সকলে রাজাকে সমর্থন করল, মহারাজ, আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। পরাধীনতার শৃঙ্খলে তাকে বাঁধতে দেব না কিছুতেই! হোক যুদ্ধ, হোক লোকক্ষয়, হোক রক্তপাত, তবু আমাদের মাতৃভূমিকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না কিছুতেই।

রাজার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে থালার ওপর থেকে তরবারি তুলে নিলেন। তারপর কোমল কণ্ঠে নম্রভাবে দূতকে বললেন, আপনার উত্তর পেয়েছেন আশা করি। আপনার রাজাকে বলবেন, দেশজননীর সম্মান রক্ষার জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, রাজ্যশ্রী রক্ষার জন্য সকলের অনুমোদনক্রমে আমি এই তরবারি গ্রহণ করলাম!

দূত বৈজয়ন্তগিরির রাজা এবং সর্বসাধারণের দেশপ্রেমের প্রগাঢ়তা অনুভব করল ভালভাবেই। মনে মনে ভাবতে লাগল দেশজননীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার এই তীব্রতা রাজ্যকে হয় তো সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে। ফিরে গেল দূত অনন্তদেবের রাজসভায়।

তারপর শুরু হলো বিরাট যুদ্ধ। মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। দশদিন ধরে চলল প্রবল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। উভয়পক্ষের কত যে সৈন্য মারা গেল, বিনষ্ট হলো কত যে হাতি আর ঘোড়া তার আর ইয়ত্তা নেই! কিন্তু কোনো পক্ষই জয়ী হতে পারছে না। আবার পশ্চাদপসরণও সম্ভব নয় কারুর পক্ষেই। একজন জয়ের নেশায় যুদ্ধ করছে, আরেকজন দেশজননীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে!

রাজা অমিত্রসূদন বড় বেদনা অনুভব করছেন মনে মনে। এই মৃত্যু এই ধ্বংস এই নারকীয় যুদ্ধলীলা তাঁকে আকুল করে তুলেছে। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে তাঁর। কী উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। অবশেষে ঠিক করলেন, রাত্রিবেলায় শত্রুশিবিরের কাছে গিয়ে তাদের যুদ্ধের সব পরিকল্পনা জেনে আসার চেষ্টা করবেন। তারপর তারই দুর্বল ছিদ্রপথে হানা দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করবেন।

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। সারাদিনের যুদ্ধের পর ক্লান্ত সেনানীরা যে যার শিবিরে বিশ্রামের অবকাশে গভীর নিদ্রায় অচৈতন্যপ্রায়। রাজা অমিত্রসূদন

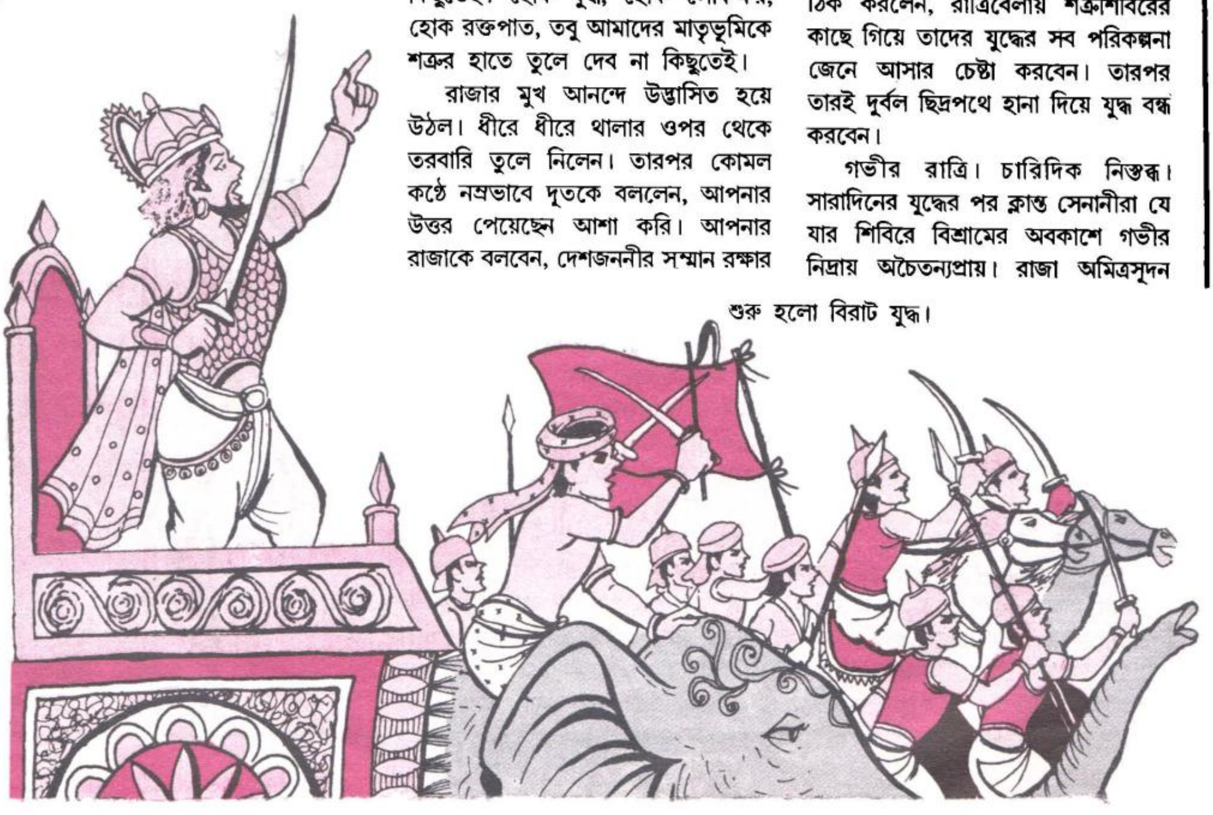

শুরু হলো বিরাট যুদ্ধ।

তাঁর বিশ্বস্ত অমাত্য ও পার্শ্বচর রণজয়কে সঙ্গে নিয়ে রুমঝুম নদী পার হয়ে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে শত্রুশিবিরের অভিমুখে চললেন। পরনে তাঁদের সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশ।

একটা বিরাট তাঁবু দেখে রণজয় বলল, মহারাজ, মনে হচ্ছে, ওটাই কাঞ্চীপুররাজের তাঁবু। চলুন, আমরা ঐ দিকে যাই। রাজা বললেন, কিন্তু রণজয়, খুব সাবধান। শত্রু জানতে পারলে মহাবিপদ হবে। একটা বিষয় আমরা ঠিক করে রাখি এসো, যদি কোনোক্রমে আমরা ধরা পড়ে যাই তাহলে কিন্তু প্রাণ থাকতে নিজেদের পরিচয় দেওয়া চলবে না। আর যদি আমাদের প্রাণের বিনিময়ে দেশরক্ষা হয় তাহলে প্রাণ দিতেও আমরা কুণ্ঠিত হবো না। রণজয় বলল, আপনার আদেশ শিরোধার্য মহারাজ।

দুজনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন কাঞ্চীপুর রাজার তাঁবুর দিকে। ছোট ফুটো খুঁজে বের করে তারমধ্যে চোখ রেখে দুজনে দেখতে লাগলেন ভিতরে কী হচ্ছে।

দেখলেন, একটি সুসজ্জিত সিংহাসনে বসে আছেন রাজা অনন্তদেব। তেজোদৃপ্ত তাঁর মুখমণ্ডল। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আর জয়লাভের বিপুল আগ্রহ তাঁর সমস্ত অবয়বে ফুটে উঠেছে! তাঁকে ঘিরে বসে আছেন মন্ত্রী, অমাত্যরা। সেনাপতি বলে চলেছেন তাঁর আসন্ন যুদ্ধের পরিকল্পনা। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন রাজা অমিত্রসূদন আর রণজয়। তাঁরা এত মনোযোগ দিয়ে শত্রুপক্ষের গোপন পরামর্শ শুনছিলেন যে খেয়ালই ছিল না যে কোনো মুহূর্তে কেউ দেখে ফেলতে পারে!

আর হলোও ঠিক তাই! কখন নিঃশব্দে এক প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে তাঁদের পিছনে, বুঝতেই পারেননি। এই কে তোমরা? কী করছ এখানে? মহারাজের শিবিরের ভেতর দেখছ চুরি করে, সাহস তো কম নয়!

চেঁচামেচি শুরু করে দিল প্রহরীটা। তার চিৎকার শুনে আরও অনেকে ছুটে এল। ধরা পড়ে গেলেন মহারাজ অমিত্রসূদন আর রণজয়!

গুপ্তচর, গুপ্তচর ধরা পড়েছে, বলতে বলতে সকলে মিলে ওঁদের দুজনকে নিয়ে রাজা অনন্তদেবের সামনে হাজির করল। সকলেই চমকে গেছে। এমনভাবে একেবারে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে কেউ গুপ্তচরবৃত্তি করতে আসতে পারে—এ তো সবার ধারণার বাইরে! রাজা অনন্তদেবের মনে হলো, এই গুপ্তচর দুজন শুধু বেতনভোগী রাজকর্মচারী নয়, এরা ভালবাসে দেশকে আর ভালবাসে নিজেদের প্রভুকে। তাই এমন করে বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে এখানে আসতে পেরেছে!

কে তোমরা? কেন এখানে এসেছ? কী তোমাদের পরিচয়? অনন্তদেব গর্জন করে উঠলেন।

রণজয় বিনীতভাবে বলল, মহারাজ, আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। পথে পথে ঘুরি, যেখানে-সেখানে ঘুমাই আর কোথাও যদি ভাল খাবার-দাবার পাই সেখানেই থাকি। আমাদের চাল-চুলো কিছুই নেই, ভবঘুরে আমরা।

রাজা বললেন, তোমরা ভবঘুরে? কিন্তু বাপু, এমনভাবে চুরি করে আমাদের কথা শুনছিলে কেন? তোমরা নিশ্চয়ই বৈজয়ন্তগিরির গুপ্তচর।

রণজয় আবার বললে, না মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমরা গুপ্তচর নই। আমরা শুধুই ভবঘুরে গরীব মানুষ। এতবড় তাঁবু আর লোকজন দেখে কৌতূহল দমন করতে পারিনি তাই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম কি হচ্ছে এখানে!

বটে! রাজা আবার বিরাট গর্জন করে উঠলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে রাজার গোপনসভা দেখার শাস্তি কী জান? প্রাণদণ্ড! প্রহরী, এদের নিয়ে যাও। কাল ভোরে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে ঘাতকের হাতে তুলে দেবে। রাগে কাঁপতে লাগলেন অনন্তদেব।

একজন প্রহরী ছুটে এসে অমিত্রসূদন আর রণজয়কে ধরে নিয়ে গেল। শেকল দিয়ে বাঁধল দুজনকে। তারপর একটা ছোট তাঁবুতে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রণজয় আর রাজা অমিত্রসূদন বিমর্ষ মুখে বসে রইলেন। মুক্তির কী উপায় হতে পারে ভাবতে লাগলেন দুজনে, কিন্তু কোনোদিকেই কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না। ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন দুজনে।

ভোর হলো প্রতিদিনের মতো। বৈজয়ন্তগিরির প্রজাসাধারণ জানেই না তাদের প্রিয় মহারাজের জীবনের আজ শেষ দিন। দেশের ঘোর সর্বনাশ আসন্ন।

আজ গুপ্তচর দুজনের ফাঁসি হবে। কাঞ্চীপুরের সব সৈন্যসামন্ত যে যেখানে ছিল সকলে তাঁবু ছেড়ে জমায়েত হয়েছে বিশাল প্রান্তরে। মধ্যিখানে একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি হয়েছে। একজন জল্লাদ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। গুপ্তচর দুজনকে আনা হলো, কিছুক্ষণ পরে অনন্তদেব এলেন পাত্র-মিত্র সকলকে নিয়ে।

কাঞ্চীপুরের সৈন্যদের উদ্দেশে রাজা অনন্তদেব বললেন, এই দুজন গুপ্তচর সম্ভবত বৈজয়ন্তগিরি থেকে এসেছে। এদের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এরা অপরের আজ্ঞাবাহী কর্মচারী মাত্র, তাই মৃত্যুর পূর্বে এদের যে কোনো একটি প্রার্থনা আমি পূর্ণ করব, অবশ্য মুক্তির প্রার্থনা ছাড়া। এ বিষয়ে আপনাদের নিশ্চয়ই সমর্থন আছে? বলাই বাহুল্য, সকলের সমর্থন রাজা বিপুল

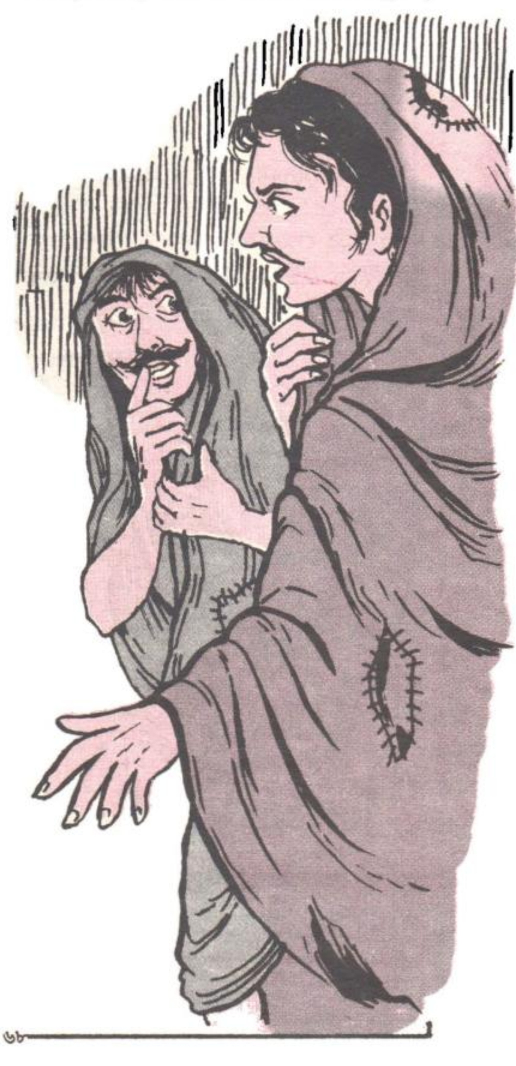

জয়ধ্বনির মধ্যেই পেয়ে গেলেন।

অনন্তদেব তখন জিজ্ঞাসা করলেন, বল তোমরা, কী তোমাদের শেষ ইচ্ছা? রাজা অমিত্রসূদন বললেন, মহারাজ অনন্তদেব, আপনার অসীম দয়া। আপনার মহানুভবতা দেখে আমরা আশ্চর্য হলাম। যাই হোক, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা ইষ্টনাম জপ করি। কিন্তু গানের মধ্য দিয়েই দেবতার পূজা করি আমরা, কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

রাজা অনন্তদেব বিস্মিত হলেন। ঘাতকের সামনে দাঁড়িয়ে এরা ইষ্টনাম জপ করবে গান গেয়ে? অমিত্রসূদনের দিকে যতবার তাকাচ্ছেন অনন্তদেব ততবারই তাঁর মনে হচ্ছে এই ব্যক্তি সাধারণ মানুষ নয়, এর সমস্ত অবয়বে একটা অসাধারণ কিছু রয়েছে, সব কিছুর আড়াল থেকে যেন ফুটে বার হচ্ছে এর অপরিমেয় শক্তি আর বিরাট ব্যক্তিত্ব।

মন্ত্রীর কথায় রাজার চমক ভাঙল। এদের গান করবার অনুমতি দিচ্ছেন তো মহারাজ? মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে রাজা বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। অনুমতি দিলাম তোমাদের, ইষ্টনাম গান কর।

গুপ্তচর দুজন শুরু করলেন গান। কী তাঁদের অপূর্ব কণ্ঠস্বর! কী অপূর্ব সঙ্গীতের সুর আর কী অসাধারণ মনোহরা সে সঙ্গীতের ভাষা!

তাঁরা গাইতে লাগলেন, কী সুন্দর এই ধরিত্রী, কী অপরূপ রূপে সজ্জিতা আমাদের এই বসুন্ধরা। সত্যিই সে অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণা। তারই মহিমায়, গরিমায়, অপরিমেয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আমাদের এই দেশ—এই জন্মভূমি। ধনধান্যে, ফলেফুলে, শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ এই দেশ। সব দেশের সেরা এ দেশ। এ দেশের জল যেন মধু, বাতাস যেন মাতৃহস্তের স্নিগ্ধ পরশ, মাটি যেন শীতল চন্দন-প্রলেপ। দেশমাতৃকার এই স্নেহের দান আমাদের জীবনস্বরূপ। মাতৃভূমির মনোরম নয়নহরণ রূপ দেখে দেখে চোখ আর ফেরে না। মনে হয় এই রূপ না দেখতে পেলে জীবনই ব্যর্থ, নিরর্থক। দেশজননীর মাতৃমূর্তি আমরা বুকের মধ্যে খোদিত করে নিয়েছি। আজ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই মায়ের কোলেই আশ্রয় পাব এই আমাদের পরম আনন্দ। হে দেশজননী, আমাদের ক্ষমা কোরো, আর কোরো আশীর্বাদ। আবার যেন জন্ম নিতে পারি তোমার কোলে তোমারই সেবা করব বলে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

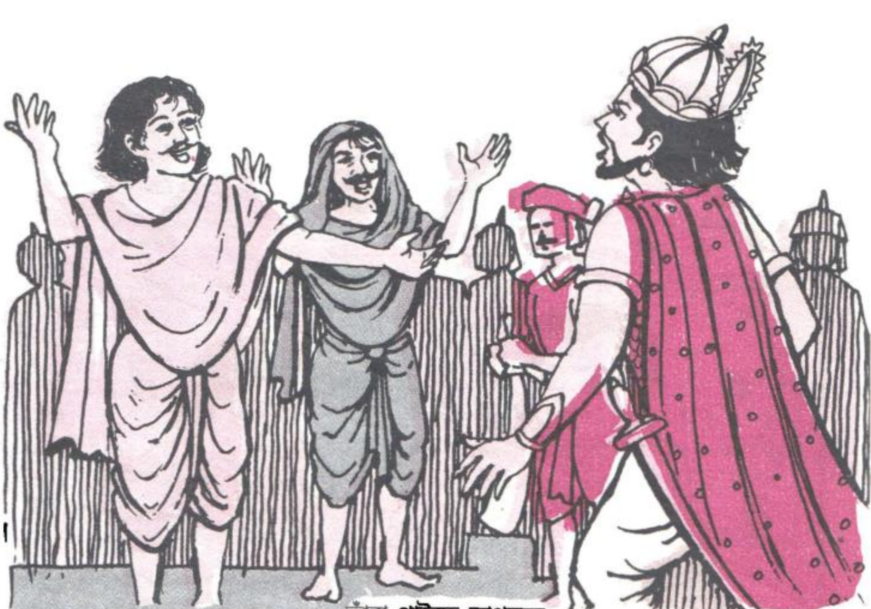
তাঁরা গাইতে লাগলেন,

অনেকক্ষণ পরে চমক ভাঙল। রাজা অনন্তদেব যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। মোহাবিষ্ট রাজা আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, হে গুপ্তচরদ্বয়, তোমাদের অসাধারণ সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমাদের মুক্তি দিলাম আমি। যাও, তোমরা দেশে ফিরে যাও। তোমাদের ইষ্টদেবী যে দেশজননী তা জেনে মুগ্ধ হলাম, বিস্মিতও হলাম। এমন দেশপ্রেম আমি আর দেখিনি। এইরকম অপার্থিব সঙ্গীত, এইরকম হৃদয়হরণ কণ্ঠস্বরও আমি আর শুনিনি। এ তো ঈশ্বরের দান—একে নষ্ট করার, ধ্বংস করার অধিকার তো আমার নেই। যাও তোমরা, স্বদেশে ফিরে যাও, সেবা কর দেশমাতৃকার। কিন্তু একটা কথা, যাবার আগে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় জানালে আমি অত্যন্ত সুখী হব। তোমরা যে সাধারণ ভবঘুরে নও, আমি নিঃসন্দেহ সে বিষয়ে!

সমস্ত সৈন্যসামন্ত, অনন্তদেবের সভাসদরা আর গুপ্তচর দুজনও তাঁর কথায় বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তখন একজন গুপ্তচর বললেন, মহারাজ, আপনার মহত্ত্ব ও উদারতা তুলনাহীন। আমাদের মুক্তি দিলেন সেজন্য আপনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। আমাদের প্রকৃত পরিচয় যখন জানতে চাইছেন বলি তাহলে। ইনি, আমার সঙ্গী বৈজয়ন্তগিরির পরম পরাক্রমশালী মহারাজ অমিত্রসূদন। আমি অমাত্য রণজয়।

কাঞ্চীপুরের রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে আলিঙ্গন করলেন বৈজয়ন্তগিরির রাজা অমিত্রসূদনকে। আকাশ-বাতাসে যে শঙ্কা আর বিপদের ছায়া দেখা দিয়েছিল সে মেঘ কেটে গেল। সমস্ত জগৎ যেন প্রাণ ফিরে পেল।

কাঞ্চীপুরের প্রজারা ভেবেছিল হাতের কাছে পেয়ে শত্রুকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না তাদের রাজা! কিন্তু না, ভুল তাদের ভাবনা। অনন্তদেবের অহঙ্কার আর মনের গ্লানি যে সব ধুয়ে মুছে গেছে তাঁদের গানের সম্মোহিনী শক্তিতে। সকলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল—জয় রাজা অনন্তদেবের জয়। জয় রাজা অমিত্রসূদনের জয়!

ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে রাজা অনন্তদেব দিগ্বিজয়ের নির্মম বাসনা ত্যাগ করে। রাজা অমিত্রসূদনের দেশপ্রেমের বাণী তাঁর মনকে এমন নাড়া দিল যে আমূল পরিবর্তন হলো তাঁর হৃদয়ের, তাঁর ভাবনা-চিন্তা আর আশা-আকাঙ্ক্ষার।

যাঁর ভয়ে একদা সকলে শঙ্কিত তটস্থ হয়েছিল, এখন তাঁর মহত্ত্বে আর উদারতায় সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। জয়ধ্বনি উঠল আকাশে-বাতাসে, নগরে-প্রান্তরে, দেশে-বিদেশে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর শান্তি দেশের মানুষকে ফিরিয়ে দিল নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন।

ছবিঃ সুবল সরকার

মিতে

বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য

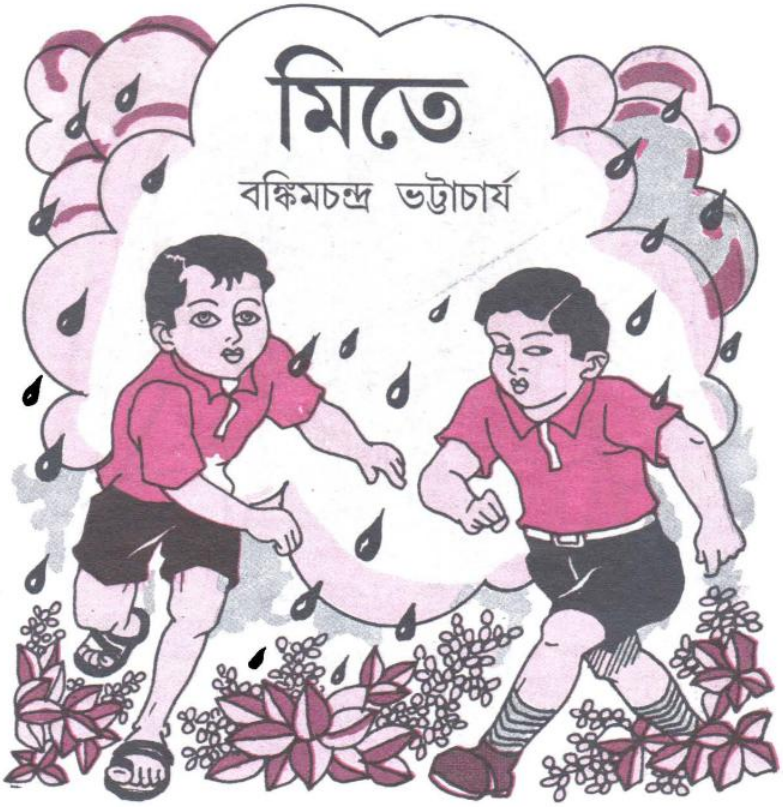

অজিত ও সুজিত দুই বন্ধু। দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। পড়ে একই স্কুলে, একই ক্লাসে। বয়সও ওদের একই হবে। স্কুলটি অজিতের বাড়ির কাছে কিন্তু সুজিতের বাড়ি থেকে একটু দূরে। সুজিতের বাবা গ্রামের জমিদার আর অজিত গরিব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

সুজিতকে প্রতিদিন তাদের বাড়ির কাজের লোক স্কুলে পৌঁছে দিতে আসে। ছুটির সময়ে আবার এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। সুজিত রোজ টিফিনের সময় অজিতের সঙ্গে অজিতের বাড়ি আসে, তার মায়ের দেওয়া দুধভাত খায়। সুজিতকে অজিতের মা নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করেন। অনেকদিন এমনও হয়েছে যে অজিত স্কুলে যেতে পারেনি, কিন্তু সুজিত ঠিক তাদের বাড়ি টিফিনে এসে হাজির হয়েছে। অজিতের মা-ও সুজিতের জন্য অপেক্ষা করেন। সুজিতও অজিতের বাড়ি না এসে থাকতে পারে না, এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনেরই একে অপরকে না দেখলে চলে না।

সেদিন স্কুল ছুটির আগেই বৃষ্টি নামল। সে কী ভীষণ বৃষ্টি! নীল আকাশকে ঢেকে দিয়েছে কালো মেঘ। সন্ধে না হলেও সন্ধের মতোই অন্ধকার মনে হচ্ছে। কড় কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ছে। ঝমঝম বৃষ্টি পড়েই চলেছে, থামবার নামটি নেই।

স্কুলের পণ্ডিতমশাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বৃষ্টি থামার কোনো সম্ভাবনা না দেখে ছুটি দিয়ে দিলেন। ছেলেরা অনেকেই ছাতা, শ্লেট, জামা মাথায় দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। কেউ কেউ বৃষ্টি থামার জন্য রয়ে গেল।

বৃষ্টি একটু কমতেই সুজিতকে নিয়ে অজিত বাড়ি চলে এলো। অজিতের মা এতক্ষণ দুশ্চিন্তা করছিলেন। ওদের দেখে তিনি ছুটে গিয়ে ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে মাথা মুছিয়ে যত্ন করে বসালেন। তারপর দুধমুড়ি খেতে দিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। তিনি সে রাত্রে ওদের খিচুড়ি খাইয়ে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিলেন। কাল সকালে তিনি সুজিতকে নিজে পৌঁছে দিয়ে আসবেন বলে ঠিক করলেন।

দুই বন্ধু নানান গল্প করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ মাঝরাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজায় ধাক্কা এবং অনেক লোকের কোলাহলে অজিতের মা-র ঘুম ভেঙে যায়। তিনি উঠে বসেন বিছানায়। এরপর তিনি দরজা খুলে দিতেই দেখেন লোকজন নিয়ে জমিদারমশাই দাঁড়িয়ে।

তাঁকে দেখেই জমিদার তীব্র গলায় জিগ্যেস করলেন, সুজিত আছে?

তিনি সলজ্জ গলায় বললেন, হ্যাঁ। ভিতরে আসুন।

জমিদার ধমকে উঠে বললেন, আমার ছেলেকে ধরে রাখা হয়েছে কেন? কী মতলব? সেই সন্ধে থেকে আমরা ওকে কতো খোঁজাখুঁজি করছি!

এরপর তিনি সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ভিতরের ঘরে গিয়ে দেখলেন অজিতের পাশে সুজিত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। প্রচণ্ড রাগে তিনি সুজিতের একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে তুললেন। ঘুম-ভাঙা-চোখে বাবার মূর্তি দেখে সুজিত ভয়ে কাঁপতে থাকে। অজিতেরও ঘুম ভেঙে যায়। সে এসব কাণ্ড দেখে মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে।

সুজিতের দিকে তাকিয়ে জমিদার বললেন, কে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সুজিত বলে, আমি—এর বেশি সে আর কিছু বলতে পারে না।

জমিদার বলেন, তোমাকে যদি আর কোনোদিন এখানে দেখি, পা ভেঙে দেব। ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলেন, গরিবদের সঙ্গে মিশে মিশে আস্পর্ধা বেড়ে গেছে। এদের সঙ্গ ছাড়াতেই হবে।

অজিত আর তার মা হতবাক। অজিত তার মাকে আরো জড়িয়ে ধরে। মা যেন পাথরপ্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখেন। কিছু বলতে পারেন না। চোখে-মুখে অপরাধ করে ফেলার ছাপ।

সুজিত ওদের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে বাবার সঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হলো।

মা সব সহ্য করলেন। অজিতকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

অজিত কি বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ পরে সে মাকে জিগ্যেস করে, মা,

গরিবদের সঙ্গে সুজিতকে মিশতে দেবে না বলল। আমরা কি গরিব?

মা চোখ মুছে বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমরা বড় গরিব। ওরা জমিদার, কতো বড়লোক।

সুজিত কি আমার সঙ্গে খেলবে না? মাকে জিগ্যেস করে অজিত।

মা বলেন, খেলতে না দিলে আর খেলবে কি করে?

অজিতের মুখে হঠাৎ হাসি দেখা দিল। সে বলে উঠল, সুজিতকে চুপিচুপি ডেকে আনবো। কেউ জানতেই পারবে না। কি বলো মা?

ছেলের ছেলেমানুষী দেখে মা নিরুত্তর রইলেন। অজিত আবার বলল, ও না আসে, আমি চুপিচুপি ওকে দেখে আসবো। ওর মা তো আমাকে খুব ভালবাসেন। গেলে কিছু বলবেন না, দেখো।

অবুঝ ছেলের কথা শুনে কোনোরকমে অশ্রু সংবরণ করে মা সস্নেহে তাকে বললেন, না বাবা, লক্ষ্মী মানিক, তুমি কোনোদিন ওদের বাড়ি যেও না। ওরা বড়লোক। যদি অপমান করে। তুমি যেও না।

মার মুখের দিকে তাকিয়ে অজিত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

কিন্তু সুজিত যথারীতি টিফিনের সময় অজিতের বাড়ি আসে, মা-র হাতে দুধভাত খেয়ে স্কুলে ফিরে যায়।

একদিন অজিতের মা অসুস্থ হলেন। অজিত সেদিন স্কুলে গেল না। মায়ের কাছে থেকে সে মায়ের সেবা করতে লাগল। এদিকে সুজিত স্কুলে গিয়ে তার মিতেকে না দেখে সোজা তাদের বাড়ি চলে এল। অজিতের মায়ের অসুস্থতা দেখে সেও তার মায়ের সেবা করতে থাকল। তারপর বিকেলবেলা সে বাড়ি ফিরে গেল। পথে তাকে নিতে আসা কাজের লোক বিশুদার সঙ্গে দেখা। বিশুদা তাকে এত আগে দেখে কারণ জিগ্যেস করায় সে বলল, আজ সকাল সকাল স্কুল ছুটি হয়ে গেছে।

সেদিন শনিবার। সকাল থেকেই মেঘ জমেছিল আকাশে। চারদিক থমথম করছে। স্কুল ছুটির আগেই বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির বেগ বাড়ার আশঙ্কায় স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো। অজিত মিতেকে নিয়ে তাদের বাড়ি চলে আসে। মা ওদের খেতে দিলেন। তারপর দুই বন্ধুতে কতো গল্প!

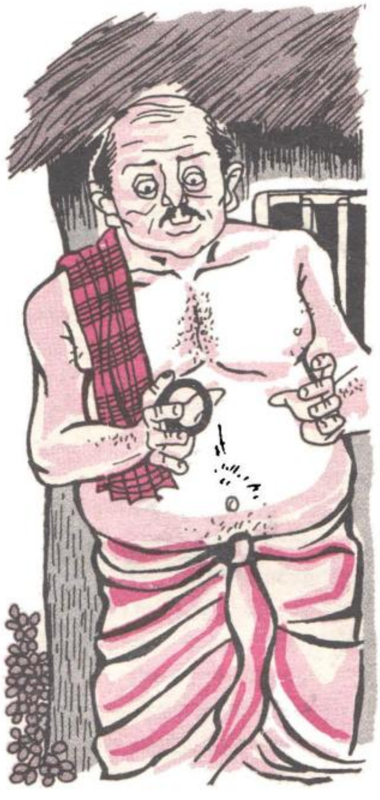

সন্ধের আগেই বৃষ্টি কমে এল। টিপটিপ করে পড়ছে। অজিতের মা সুজিত ও অজিতের মাথায় দুটো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নিজে একটা গামছা মাথায় দিয়ে সুজিতদের বাড়ির দিকে সবাই মিলে রওনা হলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল সুজিতকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবেন। কিন্তু সুজিত জোর করে তাঁদের ওর মায়ের কাছে নিয়ে গেল।

সুজিতের মা ওঁদের অবস্থা দেখে এগিয়ে আসেন। সুজিতের বলার আগেই অজিতের মাকে চিনতে পারেন। বলেন, তুমি কেন ভাই ভিজে এলে! আর একটু পরে এলেই পারতে। অজিতের দিকে চেয়ে বললেন, দেখ দেখি, বাছা কেমন ভিজে গেছে, কাঁপছে।

এরপর জমিদারগিন্নি এক বাটি গরম দুধ এনে অজিতকে খাইয়ে দিলেন। মাকে বললেন, যাও ভাই, ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। আহা, বাছার আবার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তোমার কাপড়ও তো ভিজে গেছে।

সেদিন রাত্রে কথাচ্ছলে গিন্নির মুখ থেকে অজিতের মার সব কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন জমিদারমশাই। হুকুম জারি হয়ে গেল—বাড়ির কাজের লোক সুজিতকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ছুটি না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবে। ছুটির পর সে তাকে নিয়ে বাড়ি আসবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সে যাতে আর কোথাও যেতে না পারে।

এর ফল হলো সুজিতের পক্ষে অসহ্য। ক্লাসে ছাড়া আর অজিতের সঙ্গে দেখা বা কথা বলার সুযোগ পায় না সে। টিফিনে দুধভাতের জন্য মন ছটফট করে। অজিতও মনমরা হয়ে বাড়ি ফেরে। সুজিত আর সহ্য করতে পারে না। তার জ্বর হলো। ক্রমশ বাড়ে।

সাত-আট দিন পরে ডাক্তারবাবু জানালেন সুজিতের হয়েছে টাইফয়েড। অসুখ তার বেড়েই চলে। জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকে। অজিতকে ডাকে। দুধভাত খেতে চায়। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে।

স্কুল থেকে প্রতিদিন অজিত মুখ ভার করে বাড়ি ফিরে আসে। একদিন সে মাকে বলে, সুজিতের খুব অসুখ করেছে। ক্রমশ বাড়ছে। মাস্টারমশাই বললেন ডাক্তার তার বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। সুজিত আর বাঁচবে না। বলে সে কেঁদে ফেলে।

শুনে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে। অনেক ভাবলেন। মান-অপমানের কথাও চিন্তা করলেন। শেষে আর স্থির থাকতে পারলেন না। অজিতকে নিয়ে দেখতে এলেন। এসে দেখলেন সুজিত ভুল বকছে—আমি যাচ্ছি, অজিত দাঁড়া...আমি মায়ের হাতে দুধভাত খাবো। দাঁড়া, দাঁড়া...ঐ দেখ অজিত আসতে পারছে না। দরজা খুলে দাও, খুলে দাও বলছি...আয়, অজিত আয়। দেখ, বাবা কতো খেলনা কিনে দিয়েছে, কাউকে দেব না। তুই আর আমি খেলবো। আয়, আয়।

সুজিতের মা মাথার কাছে বসে বাতাস করছেন। অজিতকে নিয়ে তার মা পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছেন। চোখ দিয়ে তাঁর টপটপ করে জল ঝরছে।

আর থাকতে না পেরে অজিতের মা এগিয়ে এসে বলেন, দিদি, আমাকে এতদিন খবর দেননি কেন? এরপর তিনি সুজিতের মাথা কোলে তুলে নিলেন। অজিত পাশে বসে মিতের গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

সুজিতের মার মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে

অজিতের মা বললেন, দিদি, সুজিতের সেবা করার ভার আমাকে দিন। আপত্তি করবেন না।

কর্তাকে বুঝিয়ে সুজিতের মা রাজী করালেন। অজিত ও তার মা দু'জনে সুজিতের সেবার কাজে লেগে পড়লেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন অজিতের মা। আহার-নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করলেন বলা চলে। জোর করে সুজিতের মা তাঁকে মাঝে মাঝে কিছু খাইয়ে দেন। অজিতও তার মিতের সেবা করে চলেছে।

আস্তে আস্তে সুজিত ভাল হয়ে উঠতে লাগল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর অজিতের মা অজিতকে নিয়ে বাড়ি চলে আসার সময় সুজিত কেঁদে উঠল। অজিতের মা বললেন, আমি আবার আসবো। তুমি কেঁদো না। এরপর অজিতের হাত ধরে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

মাসখানেকের বেশি অনিয়ম ও পরিশ্রমে অজিত ও তার মা দু'জনেই যথেষ্ট ক্লান্ত। দু'জনেরই শরীর ভাল নেই। একদিন অজিতের খুব জ্বর হলো। মা পড়লেন ভাবনায়। দিন দিন জ্বর বেড়েই চলল। অসাড় হয়ে সে পড়ে আছে বিছানায়। 'মা' বলে আর ডাকেও না। ঠাকুরের চরণামৃত এনে মা তার মুখে দেন। পাশের গ্রাম থেকে এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডেকে আনেন।

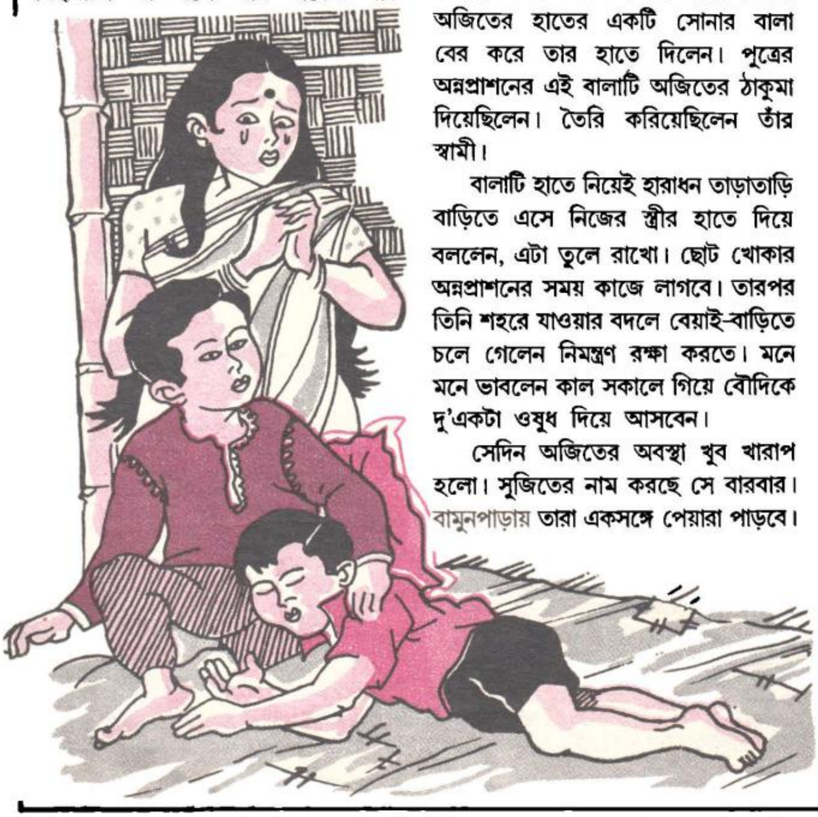

ডাক্তার রোগীকে দেখেই বললেন, এতদিন পরে ডাকলেন! অনেক আগে ডাকা উচিত ছিল।

অজিতের মা ডাক্তারের হাতে দুটি টাকা দিলেন। ডাক্তার চার পুরিয়া ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন।

সপ্তাহ কেটে গেল। জ্বর ক্রমশই বাড়ছে। পাড়ার লোক নানান পরামর্শ দেয়। টোটকা ওষুধের কথা বলে। ডাক্তারটিও মাঝে মাঝে আসেন। অজিতের মা তাঁর শেষ সম্বল ডাক্তারের হাতে তুলে দেন। ডাক্তার শহর থেকে বড় ডাক্তার আনার কথা বলেন।

কিন্তু টাকা কোথায়? পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অজিতের কাকা হারাধন। অজিতের বাবা একসময় ওদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। অজিতের মা তাঁর কাছে শহর থেকে ডাক্তার আনার আবেদন জানালেন। ঘরে খুঁজে পেতে দু'চার টাকা যা পেলেন হারাধনের হাতে তুলে দিলেন। সেগুলি হাতে নিয়ে হারাধন আরও টাকা চাইলেন। মা তখন বহু যত্নে আগলে রাখা অজিতের হাতের একটি সোনার বালা বের করে তার হাতে দিলেন। পুত্রের অন্নপ্রাশনের এই বালাটি অজিতের ঠাকুমা দিয়েছিলেন। তৈরি করিয়েছিলেন তাঁর স্বামী।

বালাটি হাতে নিয়েই হারাধন তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে নিজের স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, এটা তুলে রাখো। ছোট খোকার অন্নপ্রাশনের সময় কাজে লাগবে। তারপর তিনি শহরে যাওয়ার বদলে বেয়াই-বাড়িতে চলে গেলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। মনে মনে ভাবলেন কাল সকালে গিয়ে বৌদিকে দু'একটা ওষুধ দিয়ে আসবেন।

সেদিন অজিতের অবস্থা খুব খারাপ হলো। সুজিতের নাম করছে সে বারবার। বামুনপাড়ায় তারা একসঙ্গে পেয়ারা পাড়বে। তার সঙ্গে দুধভাত খাবে। মণ্ডলবাড়িতে গাছে অনেক কাঁঠাল ধরেছে। মার জন্য চেয়ে নিয়ে আসবে। কখনো বলে—আমার সব বই নিয়ে এসো। সুজিতকে দিয়ে যাবো। তা না হলে যে সব পোকায় খাবে।

অজিতের মা ছেলের পাশে বসে। তিনি স্থিরভাবে সব কিছু শুনছেন। চোখ দিয়ে জল ঝরছে। আজ তিনি নিঃস্ব। আর কোনো সম্বল নেই তাঁর। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল সুজিতের কথা। অজিতের প্রাণের বন্ধু। তাঁর সই পাতানো দেখে সে মিতে পাতিয়েছে। অজিত কতবার সুজিতের নাম করছে। যাই, তাকে একবার খবর দিই।

তীব্র দুপুর। মা ছুটলেন সুজিতদের বাড়ি।

এদিকে সুজিত কারও মুখে অজিতের ভয়ানক অসুখের কথা শুনেছে। কিন্তু সে আসতে পারেনি। আজ সুযোগ পেয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে অজিতের কাছে আসবার জন্য।

সুজিতদের বাড়ি পৌঁছে সুজিতের দেখা না পেয়ে অজিতের মা সুজিতের মাকে সব কথা বলে সুজিতকে পাঠানোর জন্য বারবার অনুরোধ করলেন। সুজিতের মা বললেন ঐরকম রোগীর কাছে সুজিতকে পাঠানো সম্ভব নয়।

স্তম্ভিত হয়ে অজিতের মা ছুটে ফিরে এলেন বাড়িতে। এসে দেখেন অজিতের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসে আছে সুজিত। তাঁকে দেখে সুজিত বলে, আমাকে দেখেই অজিত বলল—তুই চলে এসেছিস! আজ আর দুধভাত খাওয়া হলো না। মা-কে ডাক। এই বলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মা এগিয়ে গিয়ে অজিতের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, দেখ সুজিত এসেছে। চোখ মেলে দেখ। গায়ে হাত ঠেকাতেই তিনি চমকে ওঠেন—অজিতের সমস্ত শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। তিনি বুঝতে পারেন আর সে চোখ মেলবে না, কথাও বলবে না।

সুজিত কোনো কিছু না বুঝেই তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে আর বারবার বলে চলেছে, অজিত, দেখ, কথা বল, আমি যে তোর মিতে।

ছবি : সুদীপ্ত মণ্ডল

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

ভারতবর্ষে সবাধিক বিক্রীত কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকস

আগামী মাসে পড়ুন

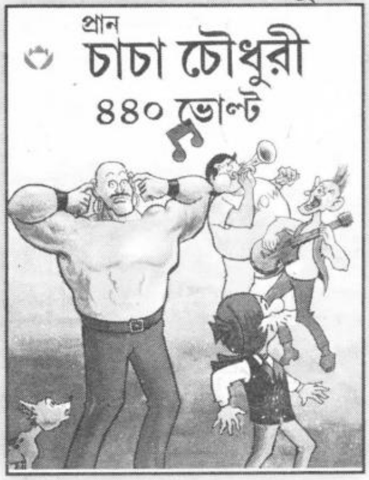
প্রান
চাচা চৌধুরী
৪৪০ ভোল্ট
WOW

প্রান
বিল্লু আর ই-মেল

প্রান
পিঙ্কীর চকলেট

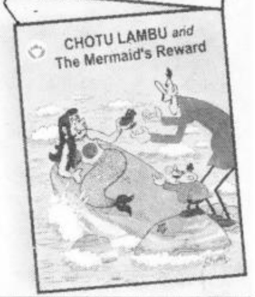
CHOTU LAMBU and
The Mermaid's Reward

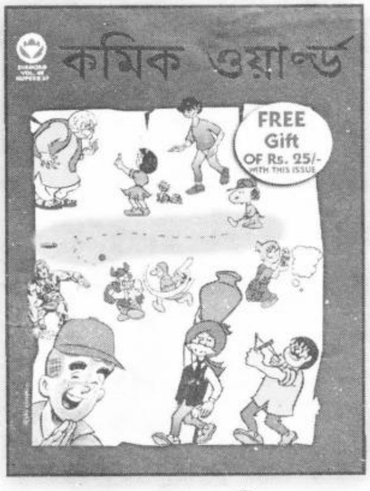
কমিক ওয়ার্ল্ড
FREE
Gift
OF Rs. 25/-
WITH THIS ISSUE

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব-এর সদস্য হোন এবং বাড়ী বসে ৫০ টাকার কমিকস ৪৫ টাকায় নিন। ডাক ব্যয় ৬ টাকাও আর আলাদা করে দিতে হবে না। এই ভাবে প্রতি মাসে ডায়মণ্ড কমিকসের ৫ টি কমিকসের সেট আপনি বাড়ী বসেই পেতে পারেন। এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বা ভারতের বাহিরে আর কোন দেশে প্রযোজ্য হবে না। সদস্যতা কুপন ভরে পাঠাবার সময়েই সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা আপনি ডাক টিকিটের মাধ্যমে পাঠান। নিজের নাম এবং ঠিকানা ইংরাজীতে স্পষ্ট করে লিখুন। সময়ে-সময়ে আপনাকে অন্যান্য উপহারও পাঠানো হবে। লাগাতার ১২-টি ভি.পি. ছাড়ালে ১৩ নম্বর ভি.পি. ফ্রী। ডায়মণ্ড পরিবারের সদস্য হোন এবং মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

এক বছরে মাস	কনশেসন (টাকা)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
১২	৫.০০ (কনশেসান)	৬০.০০
১২	৬.০০ (ডাক খরচ)	৭২.০০
১	৫০.০০ (১৩ নং ভি.পি. ফ্রী)	৫০.০০
সদস্যতা প্রমাণপত্র এবং অন্য আকর্ষক উপহার, স্টিকার এবং ডায়মণ্ড পুস্তক সমাচার ফ্রী		২০.০০
		২০২.০০

সদস্য হওয়ার জন্য আপনি কেবল নীচের কুপনটি ভরে পাঠান এবং সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট অথবা মানি অর্ডারের রূপে অবশ্যই পাঠান। এই স্কীমের অন্তর্গত প্রতি মাসে ২০ তারিখে আপনাকে ভি.পি. পাঠানো হবে, যাতে ৬-টি কমিকস থাকবে।

হ্যাঁ! আমি '**ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব**'-এর সদস্য হতে চাই এবং আপনাদের দ্বারা দেওয়া সুবিধাগুলো পেতে চাই। আমি নিয়মগুলো ভাল করে পড়ে নিয়েছি। আমি কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে ভি. পি. ছাড়িয়ে নেব।

নাম : ____________________

ঠিকানা : ____________________

পোস্ট : ____________ জেলা : ____________

পিন কোড : ____________________

সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট / মানি অর্ডারের রূপে পাঠাচ্ছি।

আমার জন্মদিন : ____________________

নোট : সদস্যতা শুল্ক পাওয়ার পরই সদস্যতা দেওয়া হবে।

এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ডায়মণ্ড কমিকস প্রা. লি. *257, দরিবা কলান, দিল্লী-110 006*

Visit us at www.diamondcomic.com

Registration No. Tech/W.B./RNP-93/ 2002 July "Suktara".

JLL's MAYA Rose 20 STICKS
রোজ্
JLL's MAYA Sarvasugandhi 20 STICKS
সর্বসুগন্ধী
JLL's MAYA Sandal 20 STICKS
স্যান্ডাল
JLL's MAYA Jasmine 20 STICKS
জ্যাসমিন
UJALA

মোহময় সুগন্ধে ভরে ওঠে মন,
সতেজতা তার যেন ভোরের কিরণ,
সুগন্ধে প্রাণ জুড়ে জাগে শিহরন।

JLL's MAYA™
প্রকৃতির সুবাস

A product of Jyothy Laboratories Ltd.

Situations/JLL-MAYA/16/2002 BEN